বাংলার কীর্তন গান

ডঃ মৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্তী

সা হি ত্য লো ক
৩২/৭ বিডন স্ট্রীট। কলিকাতা ৬

Banglar Kirtan Gan
by Dr. Mrigankasekhar Chakraborty

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারী ১৯৯৫
পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ—মার্চ ১৯৯৮। দোলপূর্ণিমা ১৪০৪

প্রকাশক : নেপালচন্দ্র ঘোষ
সাহিত্যলোক। ৩২/৭ বিডন স্ট্রীট। কলিকাতা_৬

মুদ্রাকর : নেপালচন্দ্র ঘোষ
বঙ্গবাণী প্রিন্টার্স। ৫৭-এ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন। কলিকাতা_৬

মৃদঙ্গাচার্য ওস্তাদ সনাতন সাহা ও কীর্তনাচার্য
রাধারমণ কর্মকার মদীয় এই সঙ্গীতগুরুদ্বয়ের
শ্রীচরণে সমর্পিত।

প্রাক্-কথন

'কীর্তির্যস্য স জীবতি'। মর্ত্যলোকে আমরা কীর্তির মাধ্যমে জীবিত থাকি। কথায়-কর্মে-গাথায়-কবিতায়-গুণকীর্তনে-সূচকে কীর্তি নশ্বর জগতে অবিনশ্বর অক্ষয়—যুগ যুগান্তরে সঞ্চারিত। কীর্তি কাহিনীর মধ্য দিয়াও স্মরণের অন্তর্ভুক্ত। প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত ভেদে কীর্তি চিহ্নিত।

বেদে অনাহত নাদধ্বনি বৈচিত্র্যে স্বরসৌকর্ষে বিশ্বচরাচরে পরিব্যাপ্ত। এই নাদধ্বনি বংশীগানামৃতে অমিয় বর্ষণ করে। সাধনার অংগ এই কীর্তন। তাই কীর্তনের আশ্রয় হইল অপ্রাকৃত চিন্ময়ভূমি শ্রীবৃন্দাবন। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের ভাষায়—"বচনের অগোচর, বৃন্দাবন হেন স্থল, স্বপ্রকাশ প্রেমানন্দঘন। যাহাতে প্রকট সুখ, নাহি জরা-মৃত্যু-দুঃখ, কৃষ্ণলীলা রস অণুক্ষণ।"

বাৎসল্যরসময়ী গোষ্ঠেশ্বরী মা যশোমতীর দধিমন্থনকালে শ্রীকৃষ্ণের বাল্য-লীলা কীর্তনস্মরণানন্দের ভাবতন্ময়তায় কীর্তনমুখরতা আর রাসস্থলীতে বিরহবিধুরা গোপীগণের "রুরুদুঃ সুস্বরং"—এই কথার ব্যাখ্যায় শ্রীজীব-গোস্বামীচরণ শ্রীমদ্ভাগবতের টীকায় (ভাঃ ১০ / ৩২ / ১) বলিয়াছেন, যুগপৎ তান-লয়াদিতে গোপীরা গাইতে গাইতে এবং প্রলাপ করিতে করিতে করুণ দীর্ঘস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। রাসের গানে কীর্তনের আবির্ভাব—রাগ-রাগিণীর প্রকাশ মাধুরী।

কীর্তনরসের অনুভব অপ্রাকৃত রসানুভব। শ্রীরাধারাণী নিত্যাহ্লাদিনী স্বরূপিণী—সখীরাও নিত্যা অপ্রাকৃত রসসমৃদ্ধা। তাঁদের লীলাবিলাসের কেন্দ্রস্থ পুরুষ হইলেন রসিকশেখর আনন্দমূরতি নবীনকিশোর শ্রীকৃষ্ণ গোপীজনবল্লভ। তাঁদের "লীলারস সদা গান" মহাজন পদাকর্তাগণের ভজনস্মরণসম্পদ্। ভাব-রসের দিব্যচিত্রশালা কীর্তন। শ্রবণকারী জনকে করে শ্রদ্ধান্বিত ও প্রেমরসে আপ্লুত।

স্বনামখ্যাত মৃদঙ্গ বিশারদ প্রবীণ শিক্ষাব্রতী কীর্তনরসবেত্তা রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক ডক্টর শ্রীমৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্তী মহোদয়ের 'বাংলার কীর্তন গান' গ্রন্থে তাঁর কীর্তনকীর্তি অন্বেষণের তপস্যা ও মেধা, নিষ্ঠা ও সংগ্রহনৈপুণ্য ঐতিহাসিক সচেতনতা মনন উৎকর্ষের পরিচয় লাভ করি। কীর্তন সাম্রাজ্য পরিক্রমায় তীর্থপর্যটকের শ্রদ্ধা ও ঐতিহাসিকের সতর্কতার দৃষ্টি লইয়াই তিনি জ্ঞান, মনীষা ও সংগ্রহবৃত্তির সদ্ব্যবহার করিয়াছেন।

বাংলার সংগীতজগতে কীর্তনের সামাজিক-ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনস্বীকার্য। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ভজনকীর্তন সুপ্রচলিত। সমগ্র ভারতের আধ্যাত্মিক

ঐশ্বর্য কীর্তনকৌমুদীচ্ছটায় বিচ্ছুরিত। ভারত আত্মার জ্যোতির্ময় প্রকাশ কীর্তন। বিশ্বপ্রেমমূর্তি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও পরমদয়াল শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সর্বজীবের কল্যাণ কামনায় মিলন ক্ষেত্র রচনায় নামকীর্তনের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক গণতন্ত্রের সংহতির বাতাবরণ সৃষ্টি করিয়াছেন। বাংলার প্রাণের পেলব স্নিগ্ধ রূপায়ণ জাতীয় জীবনে পবিত্র সুরধুনী ধারার ন্যায় কীর্তন প্রতি মানবের চিত্ত-প্রাঙ্গণে বঙ্গসংস্কৃতির চিন্তনচেতনার ঘনীভূত সুরপ্রতিমা ভগবদ্‌মুখীনতার মন্ত্রোচ্চারণে প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। কীর্তন কনকবলয়ে কাঞ্চনকৃষ্ণ শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর ভাবাশ্রিত অগণিত পদকর্তাগণের রসকীর্তন পদাবলী বিশ্বের বিস্ময়। বাংলার লোকশিক্ষার বাহন কীর্তন।* পরমপ্রিয়বান্ধববর সুবিজ্ঞ গ্রন্থকার তাঁর রচিত গ্রন্থ অবয়বের সুসজ্জায় বঙ্গের কীর্তনধারায় কীর্তনের ইতিহাস, শ্রেণী-বিন্যাস, সাহিত্য, আধ্যাত্মিকতা, তালসুরবৈচিত্র্য, কথারসসৌন্দর্য, বাদ্যযন্ত্র এবং কীর্তনীয়াগণের পরিচয় প্রদানে নিরপেক্ষ শিল্পরুচির নিষ্ঠাশ্রদ্ধাপূত হৃদয়ের সাত্ত্বিক প্রকাশ ঘটাইয়াছেন। বিশ্ববরেণ্য কবিসার্বভৌম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাল্যকালে শিবু কীর্তনীয়া, গৌরদাস, সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সঞ্জীবচন্দ্রের পুত্র জ্যোতিশ্চন্দ্র সেকালে কীর্তনজগতে ভাবতন্ময়তায় রসসৃষ্টিতে সুরতালের অপরূপ কারুকার্যে শ্রোতৃবর্গের মনপ্রাণ কাড়িয়া লইতেন। ভক্তিরসে সকলে অশ্রুজলে নিবিষ্ট অন্তরে ভাবগঙ্গার ধারায় অভিস্নাত হইতেন। প্রভু অতুলকৃষ্ণের সমসাময়িক রামদাস বাবাজী মহারাজ, রাখালদাস চক্রবর্তী, রসময় মিত্র, সুন্দরীমোহন দাস, নিকুঞ্জবিহারী মিত্রঠাকুর, প্রেমানন্দ বাবাজী প্রমুখের নাম স্মরণীয়।

প্রাতঃস্মরণীয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, তদীয় পুত্র শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, দীনেশচন্দ্র সেন, রায়বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র, প্রভু অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী, মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ, নবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসী, অপর্ণাদেবী প্রমুখের কীর্তন গানকে শুধু সর্বসাধারণের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রাখিয়া শিক্ষিত মহলে বিশেষভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গনে প্রবেশাধিকার ও পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য প্রচেষ্টা ও উদ্যোগ স্মরণীয়। কীর্তন ভাবনার ও বিস্তারের ইতিহাস আমাদের নিকট বর্তমানযুগে ধূসর হইয়া পড়িতেছে। তাই এই গ্রন্থটি সেই অভাবমোচন করিবে এবং কীর্তনের ইতিহাসরসবিজ্ঞান সম্বন্ধে আগ্রহসঞ্চার করিবে এই বিষয়ে সন্দেহ নাই।

---

* কবি সত্যেন্দ্রনাথের ভাষায়—

কীর্তনে আর বাউলের গানে আমরা দিয়েছি খুলি,
মনের গোপনে নিভৃত ভুবনে দ্বার ছিল যতগুলি।

প্রাক্-কথন

মদীয় পিতৃদেব বৈষ্ণবাচার্য মনীষীপ্রবর প্রভুপাদ প্রাণকিশোর গোস্বামী মহোদয়ের ইংরাজী ১৯৬৪ সালের (১৩৭০ বাংলা ৪ই চৈত্র) ২৮শে মার্চ শনিবার দোলপূর্ণিমায় শিক্ষাচার্য ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক) মহাশয়ের সহিত (ডায়েরীর পৃষ্ঠায়) কথোপকথনের লিপিটি গুরুত্বপূর্ণ। উহা তুলিয়া দিতেছি। "শ্রীকুমার-বাবু বলেন, কীর্ত্তন পদাবলীর একটি এমন বইএর অভাব যাহাতে বিভিন্ন বিষয়ে ক্রমবিবর্তন, পরিবর্তন নূতন সংযোগের পূর্ণাঙ্গ বিচার থাকে B. Music পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর বিষয়ে আমাদের বড়ই অসুবিধা হয় এ সম্বন্ধে কি করা যায়। আমি বলি, প্রাচীন কীর্তনীয়া নন্দকিশোর দাস, যামিনী মুখার্জী প্রভৃতি যাহারা আছেন তাহাদের সঙ্গে আলাপ করিয়া কিছু Material সংগ্রহ করা যায় তবে সেগুলি বিন্যস্ত করিবার রীতি নিজেদের করিয়া লইতে হইবে।" "আমি" বলিতে প্রভুপাদ প্রাণকিশোর গোস্বামী বলিয়াছিলেন।

বাংলার বৃহৎ জনগোষ্ঠীর প্রাণশক্তি বর্ধনের উপাদানরূপে কীর্তনের দান শুধু উল্লেখযোগ্য নয় উহা বাঙ্গালীর অন্তর্নিহিত স্বভাবে ঔদার্য, মসৃণতা, ভক্তিভাব ও প্রসন্নতা সৃষ্টি করিয়াছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আগ্রহী কীর্তনরসাস্বাদনলুব্ধ রসিকসমাজে কীর্তনের গৌরব জাতির প্রাণবৈভব বর্ধিত করিয়াছে।

আশা করি কীর্তন মহিমা বিষয়ক এই গ্রন্থটি শিক্ষার্থী, গবেষক, কীর্তন-ইতিহাস জিজ্ঞাসু আমাদের দেশের ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করিয়া বিশ্বের সর্বত্র সুধী সামাজিক কীর্তনরসিক বুধমণ্ডলীতে সমাদৃত হইবে।

শ্রীবিনোদকিশোর গোস্বামী
ভাগবতাচার্য

ভূমিকা

বাল্য বয়সের পরিবেশ এ বয়সেও এমন প্রভাবিত করবে তা' তখন ধারণাও করতে পারি নাই। গ্রামের বাড়ি, সনের ঘরের দাওয়াতে চওড়া পাটি পেতে বসত গান শিক্ষার আসর। ঢাকার যতীন কোম্পানীর হারমনিয়ম আর মাস্টার ছিলেন সে যুগের খ্যাতনামা আঞ্চলিক গায়ক—বিরাজদাস, পবিত্র বসু প্রমুখ। জ্যেষ্ঠা ভগ্নী শিক্ষার্থিনী, আমি তাদের জোগাড়ে মাত্র। ফাঁক পেলে যন্ত্রটি ধরে একটু সা রে গা মা বাজাতাম, আর যদি মাস্টারমশাই বলতেন—'একটু গলা ছেড়ে কর না', তবে আমাকে আর পায় কে। শিক্ষা তেমন কিছু হ'ল না, শিক্ষার বাসনাটি রয়ে গেল সুযোগের অপেক্ষায়। দৈবকারণে পূর্ববঙ্গের রাজধানী শহর ঢাকায় এমন একটি পল্লীতে হ'ল বাসস্থান যেখানে গান বাজনার কোন দিন রাত্রি নাই। লাগোয়া পিছনের বাড়ি ভাটিয়ালরাজ গিরীন চক্রবর্তীর। তিনি তখন ছিলেন ঢাকা রেডিওর দিক্‌পাল। তাঁর অপর চারটি ভাইয়ের মধ্যে গণেনদা খেয়াল গায়ক, কেচুদা এবং সন্তুদা ছিলেন আধুনিক গায়ক, কনিষ্ঠ ভ্রাতা পুটু ছিল তবলাবাদক। কারোরই ভালো নাম জানা নেই তাই উল্লেখ করা গেল না। ভোর হ'ত ভৈরব বা ললিত দিয়ে আর রাত্রি হ'ত তবলা বাদ্য দিয়ে। তারপর বেশী রাত্রে সুপুরুষ গিরীনদা ছাদের বাতিটি জ্বালিয়ে উন্মুক্ত আকাশের তলে উদাত্ত কণ্ঠে গাইতে শুরু করতেন কত কি গান। পাড়ার সব লোক যেন জেগে বসে থাকত সে গানের সুর শোনবার জন্য। পিতৃদেবের সঙ্গে গিরীনদার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল আর সেই সুবাদে তিনি যখন তখন এসে বসতেন, 'গল্পই হ'ত বেশী। মাঝে মাঝে খানিকটা গান দিদিকে আর খানিকটা আমাকে শিখিয়ে দিয়ে চলে যেতেন। আহা! সে কি মন মাতানো সুর, উচ্ছ্বাসে ভরা। ইচ্ছে করলেও সে সুর ভোলা যায় না। আমাদের আর এক পাশের বাড়িটি ছিল রায়বাহাদুর কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের। খেতাবটি উল্লেখ করার কারণ হ'ল শহরে সবাই তাঁকে 'রায়-বাহাদুর' বলেই ডাকতেন, নামের কোন প্রয়োজন ছিল না। অভিজাত তবলা বাজনায় এমন বিদগ্ধ পুরুষ অঞ্চলে আর ছিল না বললেই চলে। পূর্ববঙ্গে তবলা বাদ্য বিশেষভাবে প্রচলনের জন্য মুক্তাগাছার হরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী নিজ বাড়িতে নিয়ে রাখলেন সমকালীন পূরব (লখনৌ) ঘরানার অন্যতম বাদক আবেদ হুসেন খলিফাকে আর কেশববাবু নিয়ে এলেন তদানীন্তন দিল্লী ঘরানার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাদক ওস্তাদ নাথু খাঁকে। কেশববাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র নির্মলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন অপূর্ব তবলাবাদক। তাঁদের তবলার কিনার আর বাঁয়ার দাপট সমগ্র পাড়াকে মুগ্ধ করে রাখত। 'রায়বাহাদুর' ছিলেন পিতৃদেবের অন্যতম বন্ধু। তাই পিতৃদেবের সঙ্গে তাঁর বাড়ি যেতাম। আমার আগ্রহ দেখে তিনি মাঝে মাঝে

তবলা হাতে দিয়ে বাদনপদ্ধতি দেখিয়ে দিতেন। কেশবচন্দ্রের বাড়ি ছিল মুড়াপাড়া, ঢাকা জেলার অন্যতম সুন্দর গ্রাম। ন্যূনপক্ষে দেড় মাইল পাড়বাঁধানো শীতলক্ষা, সামনে সারি দেওয়া পাম গাছ, বড় বড় জমিদারদের সুবিশাল বাড়ি, প্রত্যেকের বাড়ির সম্মুখে নিজস্ব একটি করে নদীর ঘাট। কেশববাবুর বাড়িতে ছিল হাতি। এমন বিত্ত জমিদার কি রসে আকৃষ্ট হয়ে তবলা বাজনা ধরেছিলেন তা জানি না, তবে তাঁর অতি বৃদ্ধ বয়সেও তাঁকে দেখেছি হলের বাইরে এমনকি বৃষ্টির মধ্যেও সারারাত জেগে তিনি সংগীত সম্মেলনের অনুষ্ঠান শুনছেন। তাই বলা যায় সংগীতের সংগে কোন ব্যক্তির যোগ হ'লে বিয়োগ অসম্ভব। "যদি হয় তার যোগ, কভু না হয় বিয়োগ, বিয়োগ হলে কভু না জীয়য়।" এমন মহান ব্যক্তির কাছ থেকে প্রথম অবস্থায় তবলা হাতে নিয়েছিলাম—এতেই আমি ধন্য। পরিবেশের আনুকূল্যই আমাকে কেমন করে যেন সংগীতের ভিখারী করে দিল তা আমি বলতে পারব না।

কেবলমাত্র বেঁচে থাকার উপযুক্ত স্থান বিচার করে রাজনৈতিক কারণে আসতে হ'ল কলকাতায়। সে অবস্থায় অন্য অনেকের মতো দীর্ঘদিন প্রতিভা থেকে গেল সুপ্ত। পারিবারিক সংস্কার ছিল বৈষ্ণবীয়, তাই এরই মধ্যে মাঝে মাঝে বাড়িতে কীর্তনের অনুষ্ঠান হ'ত। আমায় বিশেষভাবে লুব্ধ করল শ্রীতারকনাথ পাল মহাশয়ের খোল বাজনা। এতই ভালো লাগলো যে কিনে ফেললাম একটা খোল, বাজনা শেখা শুরু করলাম তাঁরই কাছে। পরে কীর্তন দলে অপেশাদার শিল্পী হিসাবে যুক্ত হতে পারায় সান্নিধ্য পেলাম সমকালীন অদ্বিতীয় ওস্তাদ সনাতন সাহার। তাঁর নিকট শুরু হলো বাদ্যশিক্ষা। প্রায় সাত বৎসর একসংগে থেকে বাদ্যশিক্ষা, চর্চা এবং প্রয়োগ শিখলাম। তাঁরই নির্দেশে উভয় বংগের সমকালীন শ্রেষ্ঠ বাদকদের নিকট থেকে বোল আহরণ করে তৃপ্তি পেয়েছি। ওস্তাদজী বলতেন শুধু বাজনা শিখলে কীর্তনের বাদক হওয়া যায় না, গানও জানতে হয়। তাই স্পৃহা জাগলো কীর্তন গান শেখার। এগুলি সাধনপ্রীতি নয়, এ হ'ল সংগীতপ্রীতি, কারণ সে বয়সে সাধনভজনের চিন্তা মোটেই ছিল না। অল্প সময়েই নামকীর্তন, ছুট কীর্তন ও সাধারণ কীর্তন বাজাতে পারদর্শী হয়ে উঠলাম কিন্তু জাতগান, দাগীগান ইত্যাদি রাঢ়দেশীয় কীর্তন বাজাবার অভ্যাস তখনও হয়নি। উত্তর কলকাতায় সহজলভ্য এমন প্রবীণ গায়ক ছিলেন কানাইলাল গুহ। তিনি গান শিক্ষা করেছিলেন ময়নাডালের স্বনামধন্য গায়ক রাসবিহারী মিত্রঠাকুরের নিকট। তাঁরই দলে থেকে জাতগানের সংগত শিক্ষা এবং ধরে ধরে কিছু বড় গান শিক্ষা শুরু করলাম। পাইকপাড়ার রাজা বিমল সিংহের এস্টেটের ম্যানেজারের বাড়িতে প্রতি রবিবার সন্ধ্যাবেলা কীর্তনগানের আসর হ'ত, গান গাইতেন কানাইবাবু, সংগে থাকতেন নিতাইদাস অধিকারী, ঊষারঞ্জন সমাদ্দার প্রমুখ গায়কবৃন্দ। বেশীরভাগ দিনই

প্রধান বাদক থাকতেন মন্মথ দাস, তাঁরই সংগে থেকে আমাকে বাজাতে হ'ত।

কিছুদিন পরে সান্নিধ্য পেলাম সমকালীন কীর্তনীয়াদের মধ্যে অন্যতম প্রধান ৺রাধারমণ কর্মকার মহাশয়ের। বাড়ি ছিল পূর্ববংগের ঢাকা জেলার সিরাজাবাদ গ্রামে। বেশীরভাগ গান শিক্ষা করেছেন রাঢ়বাংলার প্রধানতম গায়ক ও বাদক যতীন্দ্রনাথ দাস বৈরাগ্যের নিকট। নানা সূত্র থেকে অপ্রচলিত গান সংগ্রহ করা ছিল তাঁর নেশা। কি কারণে তাঁর শুভদৃষ্টি আমার উপর নিপাতিত হ'ল তা জানি না তবে আমি কৃতার্থ হলাম তাঁর দলে সংগতের সুযোগ পেয়ে। তিনি অতিরিক্ত স্নেহ করে শেখালেন কিছু গান, তাঁর নিকট ডোর বেঁধে হলাম গানের ছাত্র। জীবনের উপর দিয়ে বয়ে চলল কীর্তনের একটা প্রবাহ, একাধারে বাজিয়ে আবার গাইয়ে হওয়ায় কীর্তনজগতে একটু সম্ভ্রমও বৃদ্ধি হলো। খোল কাঁধে সারা বাংলা, ওড়িষ্যা, আসাম ছাড়াও ভারতের বিভিন্ন স্থানে গৌরবের সংগে ঘুরে বেড়াতাম আর ভাবতাম—"কীর্তন কি রতন?" গ্রামগঞ্জ থেকে শুরু করে শহরের মানুষগুলোকেও মুগ্ধ করে রেখেছে বাংলার স্বকীয় এই সাংগীতিক সম্পদ। তখন নবদ্বীপের গায়ক রাধারমণদার সংগে তাল মিলিয়ে সব অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া সম্ভব হ'ত না, তাতে অনেকটা হতাশ হয়ে গেলাম। চলন্ত মেঘকে যেমন পাহাড়ের উচ্চতম চূড়াটিও আটকে রাখতে পারে না, পথ সে করেই নেবে তেমনি গতিশীল শশব্যস্ত মানুষও আপনা থেকেই তাঁর পথ খুঁজে পায়। আমিও পেলাম সমকালীন কলকাতার অন্যতম কীর্তন গায়ক হরিদাস কর মহাশয়কে। তিনিই প্রথম পদাবলী কীর্তনের একটি পরিচ্ছন্নরূপ তুলে ধরতে সমর্থ হয়েছিলেন কারণ ঔপপত্তিক এবং ক্রিয়াশীল কীর্তনের উভয় দিকেই তিনি ছিলেন বিদগ্ধ। তাঁরই সঙ্গে দীর্ঘদিন ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বহু অনুষ্ঠান করেছি এবং বহু সুনামও পেয়েছি, আকাশবাণীর সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছি তাঁরই সূত্র ধরে। আশ্চর্য বিষয় কীর্তনের সংগে এমন ওতপ্রোতভাবে দীর্ঘদিন জড়িত থেকেও অপেশাদার রয়ে গেছি কারণ তখন গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় ছিল সংগীতাশ্রয় ভিন্ন অন্যপথ। শ্রীপাট শ্রীখণ্ডের শ্রদ্ধেয় গৌরগুণানন্দ ঠাকুর মহাশয় উপদেশ দিয়েছিলেন—'বাবা চেষ্টা করবে যেন পেশাদার না হ'তে হয়'। সগর্বে উত্তর দিয়েছিলাম—'লেখাপড়া শিখেছি আর সরকারী একটা চাকরিও করি, মনে হয় পেশাদারীর প্রয়োজন হবে না।' কিন্তু হায় অদৃষ্ট, বিধাতা পুরুষ তখন আমার ভবিতব্যের লেখাটি একটু দেখে নিয়ে স্মিত হাসি হাসলেন।

সমসাময়িক কালের কীর্তনজগতের সুশিক্ষিত অন্যতম আর এক পুরুষ ছিলেন অধ্যাপক পরেশচন্দ্র মজুমদার। বাদ্যেও যেমন গানেও তেমন। গড়াণ-হাটি গান-বাজনার অন্যতম প্রতিভূ নবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসীর নিকট খোলবাদ্য শিখে ময়মনসিংহের এই উৎসাহী শিল্পী প্রতিষ্ঠালাভ করেছিলেন শহর কলকাতার বিদ্বৎসমাজে। গানও শিখেছিলেন বহু, তাত্ত্বিক জ্ঞানে তিনি ছিলেন

অদ্বিতীয়। এই বিষয়েরই অধ্যাপনা করতেন তিনি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্মলগ্ন থেকে। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীতের পাঠক্রম প্রস্তুত ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অন্যতম প্রাজ্ঞ ব্যক্তিত্ব। তাঁর আনুগত্যে দীর্ঘদিন গান বাদ্য শিখেছি, তাঁর স্নেহধন্য হয়েছি এবং তাঁর আগ্রহে পরবর্তীকালে আমি রবীন্দ্র-ভারতীতে তাঁরই স্থলাভিষিক্ত হয়ে অধ্যাপনার সুযোগ পেয়েছি। সুযোগের শেষ পর্যায়ে দুর্যোগের ঘনঘটা নেমে এসেছিল। কিন্তু নেশা ও পেশা এক হয়ে যাওয়ায় চাকুরী কালের কিছুদিন বিশেষ উৎসাহিত বোধ করেছি। একই সময়ে গ্রামোফোন কোম্পানীর সঙ্গে যুক্ত থেকে কীর্তনের বহু রেকর্ড করিয়েছি, অনুষ্ঠান করেছি টিভি, রেডিওতে।

কীর্তন আমি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিনি, কীর্তনই আমাকে অহৈতুকীভাবে টেনে নিয়েছে এর স্বভাবসিদ্ধ গুণে। শুধু আমি কেন, এমনি করে বাংলার জনজীবনের বিশেষ করে গ্রামীণ জনসমাজের একটি সুবৃহৎ অংশকে অদ্যাবধি আঁকড়ে রেখেছে। সংগীত যে তত্ত্বসিদ্ধ তার ইঙ্গিত পেয়েছি গুরুবর্গের আলাপ-আলোচনায়। তাই ক্রিয়ালব্ধ বস্তুগুলির তাত্ত্বিক সমৃদ্ধি অন্বেষণের একটা স্পৃহা অন্তরে জেগে উঠল। গুরুবর্গ প্রদত্ত জ্ঞানাঞ্জন শলাকার ক্ষুদ্রবর্তিকাটি প্রজ্বলিত করে তাই অবতীর্ণ হলাম সংগীতের অফুরন্ত তত্ত্বগর্ভে। আহা! কি সুখের পরিবার, আনন্দে আহ্লাদে ভরা একটি বিরাট ভূমধ্যসাগর প্রশান্ত ও নিস্তরঙ্গ হয়ে অপেক্ষা করছে। তত্ত্বের অঙ্গগুলি পিপাসু সম্মুখে পেয়ে বলে ওঠে— 'আমাদের নিয়ে চল তোমাদের সমাজে, প্রকাশ কর, তুলে ধর। শুধু রূপের আবরণটাকে নিয়ে মানুষ মেতে থেকে কত সুখ পায়, খোলসের ভিতরটাকে যদি আস্বাদন করতে পেত তবেই বেদ ও পুরাণ প্রতিশ্রুত সংগীতের ফল তারা অনায়াসে পেত।' বিষয়গত অভিজ্ঞতার অভাবের দরুনই শিল্পীকে করতে হয় অসাধারণ পরিশ্রম আর শ্রোতা তার এক কানে গানটি শুনে আর এক কান দিয়ে বের করে দেন। রূপটি হ'ল গানের অবয়ব আর তত্ত্ব হ'ল গানের মর্যাদা। ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, শিক্ষাতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয় অধ্যয়ন করেছি, বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত এসব বিষয়ে ডিগ্রীও পেয়েছি কিন্তু অধ্যয়নের সূত্রে যে উন্নত উজ্জ্বল আনন্দ রস উপভোগ করেছি, তা একমাত্র সঙ্গীততত্ত্ব ও কীর্তনের তত্ত্বসন্দর্ভ পাঠের সূত্রেই। কেহ কটাক্ষ করে বলেন— 'আপনাদের আর কি? কয়েকটি বই পড়ে কিছু পড়িয়ে দিলেই হয়।' আহা! কি হতভাগ্য! সংগীতস্মৃতির দুটি তত্ত্বের রহস্য উদ্ঘাটনে যে জ্ঞানসম্ভার আহৃত হয় উপরোক্ত উক্তিকারের জ্ঞানপরিধি তার এক-চতুর্থাংশেরও সমান হবে না। আমার পড়বার সুযোগ হয়েছে বলেই সদর্পে এমন উক্তি করতে সাহস করছি।

তাত্ত্বিক দিক থেকে কীর্তন বাংলার বুকে প্রবাহিত হয়েছে তিনটি ধারায়— সাঙ্গীতিক, সাহিত্যিক এবং পারমার্থিক। এর মধ্যে সাঙ্গীতিক ধারাই হ'ল মূল।

কীর্তন মূলত সংগীত, পারমার্থিক ধারাটি সংগীতের ফলশ্রুতি মাত্র। কৃষ্ণভজনে প্রথমে আকৃষ্ট হয়ে পরে কীর্তন করার কথা কোন শাস্ত্রে নেই, যা আছে—তা হ'ল প্রথম শ্রবণ কীর্তন করলে ক্রমশ ভক্তিরাজ্যে প্রবেশ করে কৃষ্ণভজনে অনুরাগ হতে পারে। তাই কীর্তনের মূল সত্তা হ'ল বাংলায় প্রচলিত প্রাচীনতম এক ধরণের গান। বাংলা সাহিত্য এই গানকে আশ্রয় করে সমৃদ্ধ হয়েছিল বলেই এর নান্দনিক উৎকর্ষ বৃদ্ধি হয়েছে। পদাবলী দিয়ে গানের পরিধি বৃদ্ধি হয়েছে কিন্তু এর সাংগীতিক আভিজাত্য নিতান্তই স্বকীয়। এই তিনটি ধারার বিস্তৃত আলোচনা না করলে, বিষয়টি সুস্পষ্ট হয় না। তা ছাড়া কীর্তনের পরিচয়, বৈশিষ্ট্য, পরিভাষা, তালপ্রকরণ ইত্যাদি জনসমক্ষে তুলে ধরা প্রয়োজন। বাংলার অতুল ঐশ্বর্য সমন্বিত এই সংগীতধারা নব্য সংস্কৃতির জোয়ারে ভেসেই গেছে, এখন নিঃশেষিতপ্রায়। এমন সময়ে এ তত্ত্বগুলিকে তুলে ধরার আগ্রহ মনকে আলোড়িত করেছে। তাই গ্রন্থটি লেখা হল।

গ্রন্থটিতে বাংলার কীর্তন সম্পর্কিত প্রাচীন ও আধুনিক প্রায় সর্ববিধ তথ্যের সন্ধান সংকলন করতে চেষ্টা করেছি। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে বহু প্রবীণ ব্যক্তিদের সূত্রে যা কিছু জানতে পেরেছি তাই এ গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট আছে। বিশেষত সূচক কীর্তন, গেয় পদাবলীর উল্লেখ, তালবিশেষে গানের তালিকা, কীর্তন গানের বিভিন্ন প্রকরণের নাম, দাগীগান, জাতগান ইত্যাদির পরিচয়, কীর্তনে ব্যবহৃত গ্রামীণ পরিভাষা সমূহ এবং উদাহরণসহ ঐগুলির সংজ্ঞা ইত্যাদি। তাললিপি করার ক্ষেত্রে প্রাচীন ওস্তাদদের ব্যবহৃত কীর্তন গানের তাললিপি পদ্ধতিই অবলম্বন করেছি। গড়াণহাটি শব্দটির এই বানান ব্যবহার করেছি কারণ আমার বিশ্বাস এ গান 'গৌড়' বঙ্গের 'ওহাটি' গান। রবীন্দ্রনাথ বা তৎপরবর্তী প্রায় সকলেই 'গরানহাটি'—এই বানান ব্যবহার করেছেন। মনে হয় উচ্চারণের সূত্র ধরে। কিন্তু ব্যুৎপত্তিগত সূত্র বিচার করেই আমি পরিবর্তিত বানান ব্যবহার করেছি। যা হোক, নামের বানানে কি আসে যায়। কীর্তনের নান্দনিকতার মধ্যে একদিকে যেমন আধ্যাত্মিক ভাবপ্রবণতা থাকে অন্যদিকে থাকে বাস্তবতার সুদৃঢ় প্রভাব। কীর্তন গান একটি সার্বিক সমন্বয় সাধনের কার্যকর হাতিয়ার। এসব বিষয়গুলি নিজের চিন্তা এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের চিন্তাসমূহের সঙ্গে মিলিয়ে গ্রন্থটিতে সংকলন করেছি। পদাবলী সাহিত্যলোভী পাঠক, তত্ত্ব ও তথ্যানুসন্ধানী গায়ক গায়িকা, শ্রীখোলের বাদক এবং বৈষ্ণব সাধক সকলেরই যাতে বিশেষ প্রয়োজনে আসে সে ভাবেই গ্রন্থের বিষয়গুলি সংকলন করা হয়েছে।

পাঠকদের প্রয়োজন মেটাতে প্রথম সংস্করণ অপেক্ষা দ্বিতীয় সংস্করণটিকে বিশেষ সমৃদ্ধ করতে চেয়েছি। তাই প্রসিদ্ধ জাতগানের স্বরলিপির অভাববোধে অনেকেই ব্যক্তিগতভাবে আমাকে কিছু অনুরোধ করেছিলেন সেই অনুরোধ

রক্ষার্থে এই দ্বিতীয় সংস্করণটিতে কতিপয় জাতগানের স্বরলিপি সংকলন করে পাঠকদের সন্তুষ্ট করতে চেয়েছি। তা'ছাড়া গবেষকদের সহায়তার জন্য যতটা সম্ভব পূর্ণাকারে একটি গ্রন্থপঞ্জীও যুক্ত করেছি। প্রথম প্রকাশের ভুলত্রুটিও যথাসম্ভব দ্বিতীয় সংস্করণে শুদ্ধ করাত চেষ্টা করেছি।

আমার একান্ত স্নেহাস্পদ শ্রীনীতিশ বিশ্বাস এবং বন্ধুবর শ্রীসনৎকুমার চট্টোপাধ্যায়ের উৎসাহ ও সাহচর্যে গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ সম্পাদিত হয়েছে। সেইক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আংশিক অনুদানে গ্রন্থটি প্রকাশ সম্ভব হয়েছিল। এজন্য তাঁদের উভয়ের প্রতি তথা পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান সরকারের প্রতি আমার অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। এই গ্রন্থ মুদ্রণ এবং প্রকাশনক্ষেত্রে বিশেষভাবে সহায়তা করেছেন সাহিত্যলোক প্রকাশনের অধিকারী বন্ধুবর শ্রীনেপালচন্দ্র ঘোষ এবং তারই সহায়তায় দ্বিতীয় সংস্করণটি প্রকাশ সম্ভব হ'ল। তাঁর প্রতি জানাই আমার কৃতজ্ঞতা। গ্রন্থটি রচনার মূল উৎসাহদাতা ছিলেন প্রয়াত সাহিত্যিক নারায়ণ চৌধুরী। তাঁর অমর আত্মার প্রতি জানাই অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা। পুত্র শ্রীমান প্রসেনজিৎ, কন্যাদ্বয় শ্রীমতী শর্মিষ্ঠা ও শ্রীমতী সুদেষ্ণা আমার কর্ম-কাণ্ডের অংশীদার, তাদের মঙ্গল কামনা করি। একান্তভাবে সহায়তা করেছেন আমার স্ত্রী শ্রীমতী কল্পনা, তাঁর প্রতি যথাযোগ্য কৃতজ্ঞতা জানাই।

গুরুদেব বিষ্ণুপাদ শ্রীঅচ্যুতানন্দ গোস্বামীর কৃপাসমুদ্রে একদিন স্নাত হয়েছিলাম বলেই এই দুরূহ কর্মে প্রবৃত্ত হতে পেরেছি, তাই তাঁর রাতুল চরণে জানাই অনন্ত কোটি সশ্রদ্ধ দণ্ডবৎ প্রণাম। সঙ্গীতগুরুদ্বয়, সনাতন সাহা এবং রাধারমণ কর্মকার মহাশয়দের শ্রীচরণে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই। মহদোপদেষ্টা বৈষ্ণবকুলচূড়ামণি নিত্যানন্দকুলসমোদ্ভব শ্রীবিনোদকিশোর গোস্বামী মহোদয়ের অনন্ত উৎসাহ এবং উপাদানের জোগান গ্রন্থ সম্পাদনে বিশেষ সহায়ক হয়েছে। তাঁর অমূল্য সময় ব্যবহার করে গ্রন্থটির একটি প্রাক্-কথন তিনি লিখে দিয়ে আশীর্বাদ করেছেন। তাঁর শ্রীচরণে জানাই শ্রদ্ধাবনত কৃতজ্ঞতা। গ্রন্থটির প্রুফ সংশোধনে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন হিতাকাঙ্ক্ষী শ্রীঅশোক উপাধ্যায়, তাঁর প্রতি জানাই আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা।

গ্রন্থ সম্পাদিত হ'ল কিন্তু এর সার্থকতা নির্ভর করবে পাঠকবর্গের তৃপ্তি ও সহমর্মিতার উপর। তাঁরা যদি তাঁদের অন্বেষিত বস্তুর সন্ধান এই গ্রন্থে পান তবেই গ্রন্থকার হিসাবে আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে।

মৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্তী

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

বঙ্গের কীর্তন

"বাংলার মাটি বাংলার জল, বাংলার বায়ু বাংলার ফল"—প্রবচনটি পাঠ করতে বঙ্গজাত সকলেরই হৃদয় যেন আনন্দিত হয়ে ওঠে। নীরবাহী কুম্ভ কক্ষে ধারণ করে গৃহপ্রত্যাগত বঙ্গবধূর অবগুণ্ঠনের অন্তরাল থেকে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে যে নান্দনিক আভা তা বিশ্বনন্দিত। পতিতপাবনী, কলুষহারিণী জাহ্নবী-বিধৌত তৎপলি অধ্যুষিত সুজলা-সুফলা গৌড়বঙ্গের মৃন্ময়ী রূপের চিন্ময় সত্তা বিশ্বজন অনুভূত; যুগধর্ম-প্রচারক মহানায়ক শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের জন্ম ও লীলাভূমি পবিত্র বঙ্গদেশ বিশ্ববন্দিত; প্রতিভার অবতার শিল্পাচারী বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের জন্মভূমি ব'লে বিশ্বপ্রণম্য এ বঙ্গভূমি। ভারতচিন্তা তথা বিশ্ব-চেতনায় এই পূর্বখণ্ডটি যেমন দুর্বার তেমন সাংস্কৃতিক সংকল্পেও এর উর্বরা-শক্তি বিশ্ববিশ্রুত। এই অফুরন্ত সাংস্কৃতিক সম্পদে ভরা মোহময়ী রূপ এককালে বিশ্বকে আহ্বান করেছে বলেই—'বেঙ্গল ফর অল'। বঙ্গের গৌরব কেবল আত্মচেতনার সংকীর্ণতার মধ্যে নিবন্ধ নয়—বঙ্গের মুক্তি হ'ল আত্মিক চিন্তার সঙ্গে বিশ্বমানবসত্তার মহাসম্মিলনে, অনুর সঙ্গে বিভুর মহাসাক্ষাৎকারে, আন্তর্জাতিক বাতাবরণে জাতীয় বিকাশে, মহাসৌহার্দ্য মহাসৌমনস ও মহান অভিসারের সার্থকতায়। এ কেবল দার্শনিক চিন্তা নয়, কেবল তাত্ত্বিক বিলাস নয়, এ হ'ল বাস্তব প্রক্রিয়া, মাটির ধর্ম। কত যুদ্ধ, কত বিবাদ বা সামাজিক দ্বন্দ্ব, ধর্মযুদ্ধ, রাজযুদ্ধ—সমস্ত সংহারকে বক্ষে ধারণ করা সত্ত্বেও সর্বংসহা বঙ্গজননী নিরন্তর প্রেমপ্রসবিনী, আনন্দবিলাসিনী, বালসুকুমারী।

বাংলামায়ের মুখে স্নেহভরা প্রচ্ছন্ন হাসি নিয়ে নেমে এল প্রসন্ন প্রভাত যেন স্রষ্টারূপী প্রকৃতির অভিনব সৌকর্যময় শিল্প-এষণা। সপ্তবর্ণী কিরণ-মালাগণ যখন ভগ্নীবৎ স্বকীয় নৃত্যভঙ্গীতে অভিসারিকা তখন তাদের নূপুর-নিক্কণ নিদ্রিত মানুষের মনে জাগায় ঊষার চেতনা। একদিকে বিহগের কলকাকলি, অন্যদিকে কুসুমসৌরভ। প্রভাতের চমৎকারিতা প্রণয়ীর বিচ্ছেদজাত বিরহ-বেদনাকেও স্তিমিত করতে পারে। তাইত মানুষ সুখসজ্জাকে ত্যাগ করেও প্রভাতকে আলিঙ্গন করে। ভোরের আঁধার বায়, দূর থেকে ভেসে আসে কাংস্য করতালের 'লোহজ' ধ্বনি, তার পশ্চাতে ক্ষীণ কণ্ঠের সুর—

"ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গের নাম রে।
যে জন গৌরাঙ্গ ভজে সে হয় আমার প্রাণ রে॥"

অথবা কারও কণ্ঠে শোনা যায়—

"স্মর রে নব গৌরচন্দ্র নাগর বনোয়ারী।

নদীয়া ইন্দু করুণাসিন্ধু ভকতবৎসলকারী ॥”

কেহ গায়—

“রাই জাগ রাই জাগ শারী শুক বলে
কত নিদ্রা যাও কালমানিকের কোলে ॥”

অনতিদূরের মন্দিরে শোনা যায় মঙ্গল-আরতির গান—

‘মঙ্গল আরতি যুগল কিশোর।
মঙ্গল সখীগণ প্রেমরসে ভোর ॥”

কর্ণেন্দ্রিয়ের কাজ শ্রবণ, কিন্তু এক্ষেত্রে মনে হয় যেন চোখ দিয়েও শোনা যায়, অর্থাৎ, এই ধ্বনির সঙ্গে চোখের এমন একটি যোগ, যে এই ধ্বনিকে প্রত্যক্ষ করার নিমিত্তই যেন চোখ-দুটো খুলে গেল। এই প্রভাতী সংগীতের সুরে আর বর্ণের বিন্যাসে একটা জৈবিক ঐক্য ফুটে ওঠে। মনে হয় ঐ সুর ছাড়া ঐ কথা-ক'টির আর অন্য কোথাও যেন স্থান নাই। সত্যি, গানের কথাগুলি কথা হলেও যেন গানের জন্যই নির্দিষ্টকৃত কথা—এগুলিকে অতিসাংগীতিক উপসাংগীতিক বা এক্সট্রা-মিউজিক্যাল বলা কতটা বিধেয় তা চিন্তার বিষয়। যাই হোক, বাংলা-দেশে সংগীতের দ্বারা হয় প্রভাতী সূর্যের আবাহন। শিশু তনুজ-তনয়াবৃন্দ চূড়ান্ত উদ্যোগে ডালা হাতে চলেছে পুষ্প-আহরণে। প্রকৃতির সাজিয়ে রাখা বকুল, টগর, কাঠমালতী আর গুলাচি ফুলের সম্ভার থেকে নির্বাধ আহরণে অপরিসীম নান্দনিক আনন্দ। তাইত একটা শিশু নয় যেন একটা সদ্যফোটা জীবন্ত গোলাপ। এ প্রভাত হ'ল সুন্দরের প্রভাত তথা আবেগের প্রভাত। অন্যদিকে বামস্কন্ধে আরোপিত একটি লাঙল আর একটি বাঁশের জোয়াল, ডান হাতে চেরা বাঁশের গোল একটা পাচন যার মাথায় থাকে সূক্ষ্ম একটি লোহার হুল আর পেছনে একজোড়া গাই বা বলদ টেনে চলেছে বাঙালীর ধন, ঐতিহ্য তথা জীবনের রক্ষক অর্ধনগ্ন চাষীভাই। নির্বিকারচিত্তে, কেবলমাত্র একটি দায়িত্বের অধিকারে উদভ্রান্ত বাস্তবের সংগে লড়াই করে চলেছে ক্ষীণকায় যোগীপ্রতিম সংরক্ষকের দল, যেন এরাই শিব এরাই শক্তি। এটি হ'ল সত্যের প্রভাত, শিবের প্রভাত তথা বাস্তবের প্রভাত।

দিনমানের একটি প্রহর অতিক্রান্তপ্রায়, ঘরের দুয়ারে সমাগত এক ভিখারী বৈষ্ণব বা বাউল। সদ্যস্নাত, বিন্যস্ত সুদীর্ঘ কেশ, ললাটে ঊর্ধ্বপুণ্ড্র, বক্ষে কয়েক লহর নানারঙের কাষ্ঠ বা বীজের মালা, শুভ্র দেহাবরণ ও বামস্কন্ধে আন্দোলিত তণ্ডুলাধার—সেও একই বর্ণের তবে খুবই সযত্ন সীবনপ্রক্রিয়ায় নির্মিত। ডানহাতে হয়ত একটি একতারা, দোতারা, সারিন্দা বা একটি ‘খমক’ নিয়ে এসে দাওয়ায় বসে “মাঠান, আমি এলাম” বলে নির্বিকারচিত্তে শুরু করল যন্ত্রের ঝঙ্কার। গৃহস্থিত কোন কোন বয়স্কের কাছে হয়ত অবাঞ্ছিত হতে পারে, হয়ত দু'-একটি কটূক্তিও শুনতে হতে পারে, তবু সে উদাসীন। অপরপক্ষে

তার প্রকৃত সমর্থকের দল থাকে বেশ বড়। সুরের ঝঙ্কারটি শোনামাত্র শৈশব-অতিক্রান্ত প্রকৃতির জনকাননের সদ্যফোটা কোরক-সম বালখিল্যের দল এসে জুটে বসে আর একটু দূর থেকে দাঁড়িয়ে শোনে সদ্যবিবাহিতা বালিকাবধূ। কারণ পিত্রালয়েও সে বহুবার ঐ ভিখারী বৈষ্ণবকে দেখেছে, গান শুনেছে আর সিধে দিয়ে বিদায়ও করেছে। যন্ত্রঝঙ্কারের পর স্বাভাবিক নিয়মে শুরু করল গান। এগান হয়ত গোষ্ঠলীলা প্রসঙ্গের, যেমন—

"ওমা যশোদে কত বলব কানাইর বিবরণ"

ইত্যাদি।

নয়ত বা মাথুর-লীলার—

"আমি তোমায় নিতে আসি নাই,
দেখা দাওহে জীবন কানাই।"

নয়ত গৌর-প্রসঙ্গ, যেমন—

"ব্রজ হতে নইদে এসে লাগল ইষ্টিমার"

বা

"গৌর রূপ দেখিয়া হইয়াছি পাগল,
ঔষধে আর মানে না,
চল সজনী যাইগো নদীয়ায়।"

একনিষ্ঠ ঐ কনিষ্ঠ শ্রোতৃবৃন্দের একান্ত অনুরোধে বাবাজী গাইলেন একটি হাসির গান, যেমন—

"খাইবানি ভাই, খাইবানি, যাইবানি ভাই যাইবানি,
নাতিন খাওয়াইব সাধের ম্যাজবানি॥"

আবার গাইলেন, যেমন—

"কি অপূর্ব কলির লীলা, ময়মনসিংগের জেলা,
লুটে নিল দিনের বেলা গ্রাম যাইটখানা।" ইত্যাদি

রেডিও বা রেকর্ডের হয়ত কিছুই নেই কিন্তু বাবাজীর গাওয়া এসব গানের রেশ সারাদিন ধরে সমগ্র পাড়াকে একটা অপূর্ব মাদকতায় মাতিয়ে রাখে। দারিদ্র্যের বহ্নিতে ঝলসে যাওয়া মনগুলিকে এমনি করে মাঝে মাঝে সংগীতের প্রলেপ দিয়ে যায়। মানুষ সাময়িক ভুলে যায় কোনটা বাস্তব কোনটা কল্পনা। এই কল্পনাময় জাগতিকতার পাশাপাশি চলে কঠোর বাস্তবের অনুশাসন। দেখা যায়, উঁচু মেঠো সড়কের উপর দিয়ে ধেয়ে চলেছেন এক বয়স্ক। মাথায় তাঁর ঘোমটা, বাঁ হাতে ধরা কোলে একটি শিশু, দ্রুতপদে পশ্চাতে অনুসরণ করে চলেছে আরও একটি কিশোর বা কিশোরী। বয়স্কর মস্তকে গামছা-বাঁধা একটি মৃত্তিকাভাণ্ড যাতে আছে সযত্নে রাখা পান্তাভাত, নুন আর লঙ্কা। বয়ে চলেছে স্বামীর কর্মস্থলে অর্থাৎ পশ্চিমের মাঠে, সেখানেই হবে সপরিবারে

আজ মধ্যাহ্নের আহার। এর থেকে বোঝা যায় কিছু মানুষ বেঁচে থাকার জন্য খেয়ে, অন্য মানুষকে খাবার জন্য বাঁচিয়ে রাখে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যেন পল্লীর কল্পনা আর মাঠের বাস্তবতার মধ্যে একটি বিরাট ব্যবধান, কিন্তু বাংলার মাটিতে, বাংলার সংসারে তথা বাংলার সমাজে এই কল্পনা আর বাস্তব, বিষয় আর বস্তু, আত্মা আর পরমাত্মার মধ্যে একটি অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সমন্বয়। তাইত বাংলার জনগণ প্রেম-মুখরিত, রসবিগলিত হয়েও নিরলস বাস্তব যোদ্ধা। এককালে গ্রীসদেশের লোকেরা হয়ত শৈল্পিক চমৎকারিতায় আত্মভোলা হয়ে তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দায়িত্বের কথা বিস্মৃত হয়ে থাকত, কিন্তু বাংলার জনগণ গান গেয়ে, কীর্তনের দল নিয়ে অন্যায়কে প্রতিরোধ করেছে, অত্যাচারীকে দমন করেছে। এগুলি দর্শন হলেও গৌড়বঙ্গের ইতিহাস, একে উপেক্ষা করে কার সাধ্য ?

গায়ত্রীদেবী ত্রিসন্ধ্যায় ত্রিরূপা—এর যথার্থতা বোঝা যায় প্রকৃতির রূপবৈচিত্র্যে আর মানুষের কর্মকাণ্ডের অংশবিশ্লেষণে। মধ্যাহ্নকাল উত্তীর্ণপ্রায়, দিনমানের মহাযজ্ঞের জন্য আহৃত সমস্ত সমিধও নিঃশেষিত। তখনই বেজে ওঠে অপরাহ্নের সুর যার মধ্যে প্রতিধ্বনিত হয় একদিকে সারাদিনের ক্লান্তিময় তৃষার অভিব্যক্তি, অন্যদিকে উপভোগময় রজনীর স্বাগত সম্ভাষণ। পূরবীর সুরে ঝংকৃত হয়—

"নিভল রে ঐ দিনের আলো
উঠল ফুটে রাতের হাসি।"

আত্মদর্শনের সঙ্গে গতিময় প্রকৃতির মিল দেখে হয়ত কেউ গেয়ে উঠল—

"হরি দিন ত গেল সন্ধ্যা হ'ল পার কর আমারে।"

আবার কারো মন উতরোল সুখসম্ভোগের স্বপ্নবিলাসে। কারও মুখে গান—

"মেরো অঙ্গনে আওব যব রসিয়া।
পালটি হেরব হাম ঈষত হাসিয়া॥"

এদিকে সজ্জিতা নব্যা ও সবৎস প্রৌঢ়ার দল নীরাধার কক্ষে ধারণ করে চলেছে অব্যবসায়ী নটিনীর মত দূর থেকে দূরান্তরে, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে টিপকলের পানীয় জল সংগ্রহ করতে। এ যাত্রাপথে কথোপকথনের অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে অন্যতম বিষয় হ'ল—আজ সন্ধ্যায় কার বাড়ীতে কোন্ উৎসবে কার কোথায় নেমন্তন্ন। কোথাও হরিলুট, শনিবারে শনি-সত্যনারায়ণ পুজো, কোথাও শীতলার ভাসান, কোথাও রয়ানী, কোথাও গুর্খার নাড়ু, গৃহসজ্জার বা কীর্তনের আসর। সকলেই প্রায় একমত হয়ে ঐ কীর্তনের বাড়ীতেই তাদের সান্ধ্যসমিতি বসায়। মনে হয় যেন ঐ কীর্তনের সঙ্গেই তাদের জন্মজন্মান্তরের একটা আত্মিক যোগ, এটি কোন ফলকামী সাধন বলে নয়, এটি হ'ল স্বভাবসুলভ শুভ বিচার। অংশুমালীর হৃদয়ে যখন ধরিত্রীর দ্বিতীয়ার্ধের জন্য বিরহবেদনা তীব্র হয়ে ওঠে

তখনই ক্রমশ তাঁর তেজরূপী ঐশ্বর্যকে সংকুচিত করে নীরবে পশ্চিমাস্যে আত্মগোপন করেন। 'শ্রীমতী রাধারাণীর যেমন, মানে আক্রান্ত হয়ে পদানত বল্লভকে উপেক্ষা করার দরুন, স্বর্ণবর্ণ বিবর্ণ হ'য়ে প্রায় কৃষ্ণাঙ্গ হয়ে পড়ে, ঠিক তেমনি সূর্যদেব অস্তাচলে যাবার সংগে সংগে অপরাহ্নময়ী হেমাংগ ক্রমশ কৃষ্ণাংগে পর্যবসিত হয়ে রাত্রির রূপ নেয়।

সন্ধ্যার স্তিমিত আলো, মাঠময় পৃথিবী, প্রতিটি মাঠের আবার একটি করে সীমা। কিছু গাছপালার সমাবেশ, ফাঁকে ফাঁকে ঘর আর মিটিমিটি আলো। নিঃসীম নিস্তব্ধতার ঝুঁকি মাথায় নিয়ে এগিয়ে যেতে হয় একটি মেঠো পথে, যে একই পথ চলেছে মাঠ থেকে গ্রামে, আবার গ্রাম থেকে মাঠে। পথ নয় যেন একটি মালার সুতো, চালতা ফুলের মত ছোট ছোট পল্লীগুলোকে গেঁথে প্রকৃতির গলায় পরিয়েছে এক বনগ্রামের মালা। কোথাও পথের একধারে গ্রাম, আবার কোথাও দু'ধারে। কোথাও আম-কাঁঠাল, কোথাও শাল-জারুল, আবার কোথাও বাঁশ-বেতের জংগল। সব কিছুতেই যেন একটা মেঠো গন্ধ। গাঁয়ের মোড়ল হাঁটুর উপরে নূতন কাপড় প'রে, কাঁধে একটা জামা ফেলে, এক হাতে বড় বড় দুটো চামড়ার জুতো আর এক হাতে একটি লাঠি নিয়ে ধেয়ে চলেছেন স্টেশনের দিকে, হয়ত বা গাড়ী ধরে মেয়ের বাড়ী যেতে। তাঁকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করে যে একটি উত্তর পাওয়া যাবে তার মধ্যেও থাকবে মেঠো উচ্চারণ। অর্থাৎ গ্রামসূত্রে আমরা যা-ই পাই তার মধ্যেও থাকে বর্তমান শহুরে বিচারে একটু মেঠো গন্ধ। হঠাৎ দূরে কোন একটি বাড়ীতে দেখা যায় কতিপয় হ্যাজাক্ বাতির আলো, বহুলোকের ভীড়। মাঝে মাঝে খোল-করতালের মেল-জমাটের কলরব আর তারই সংগে ছন্দ মিলিয়ে ভেসে আসছে উচ্চগ্রামে গাওয়া কতিপয় পুরুষকণ্ঠের মিলিত সুর। বন্ধুবান্ধব ও প্রিয়জনকে ডেকে আনার অভিপ্রায়ে দু'-একজন হয়ত ফিরে আসছে ওখান থেকে, আর বাকী সকলেই দল বেঁধে কেউ বা লন্ঠন হাতে, আবার কোন দল পাটকাঠি জ্বালিয়ে চলেছে ঐদিকে।

শীত-গ্রীষ্ম বোধ নাই, আবরণের বালাই নাই, নিমন্ত্রণের অপেক্ষা নাই— আহা, কি আকর্ষণ! সকলেই শ্রোতা একথা ঠিক, কিন্তু সকলেই কি সাধক—তা নাও হতে পারে। যদি প্রশ্ন করা হয়—"কোথায় যাচ্ছ গো?"—বলবে—"গান শুনতে।" সত্যিই ত, এদের চেনা অভিজাত সংগীত আর কিই-বা আছে। বাউল, ভাটিয়ালী? খুবই চেনা, তবে সেগুলি অনেকটা একক সংগীত তাই আতিশয্যও কম। কীর্তন হ'ল গান কিন্তু তার সংগে জুড়ে আছে নাটকীয় উপস্থাপনা, কীর্তনীয়ার সংযোজন প্রতিপদেই সৃষ্টি করে শ্রোতার নূতন প্রত্যাশা। তাই এর আকর্ষণ বেশী। এ আকর্ষণের সর্বোপরি কারণ হ'ল—এ গানের সংগে গায়ক, বাদক আর শ্রোতার আছে একটা মাটির সম্পর্ক, তাই এ গানের প্রতি আকর্ষণ তারা পেয়েছে উত্তরাধিকারসূত্রে, কেবলমাত্র গায়কের পাণ্ডিত্য বা

সাঙ্গীতিক রূপ-জৌলুসের জন্য নয়। গ্রাম-বাংলার মাটিতেই যার আবির্ভাব, পল্লীবাসীর কণ্ঠ জড়িয়ে যার বিলাস. পল্লীমানবসত্তার একান্ত উপভোগের বিষয় হিসাবে যার পরিচিতি সেই হ'ল কীর্তন, সেই হ'ল গান।

শ্রোতারা সবাই যে আবেগধর্মী, তা নয়। এর মধ্যে অনেকে থাকেন দক্ষ শ্রোতা বা 'পারসেপটিভ্ লিস্নার'। তাঁদের মধ্যে অনেকে কিছু কিছু গানও জানেন, গানের তত্ত্ব বা প্রাচীন সুর সম্পর্কেও অনেকেই অভিজ্ঞ। এ নিয়ে অনেক গল্পও আছে। কালনায় এক আসরে গান শুনতে এসে টিটকিরী দিয়ে মহিলা শ্রোতারা গান বন্ধ করে দিয়েছিলেন, গায়ক গিয়েছিলেন সেখানে খ্যাতির আশায়। পরে ঐ মহিলাদের কীর্তন-পারদর্শিতা দেখে গায়ক তাঁদের কাছে ক্ষমা চাইতে বাধ্য হন।

নবদ্বীপের কোন এক আসরে একজন প্রসিদ্ধ গায়ক তাঁর গীত-বীরত্ব দেখাচ্ছিলেন—এমন সময়ে একজন বৃদ্ধ শ্রোতা তাঁকে অনুরোধ করলেন 'বিকচ সরোজ ভাণ্ড মুখমণ্ডল' গানটি গাইতে। গায়ক তাঁর অজ্ঞতা স্বীকার না করে তেওট তালে গানটি গাইতে শুরু করলেন। অধিকাংশ শ্রোতা ক্ষুব্ধ হয়ে বলে উঠলেন "ওহে অর্বাচীন, মানুষ দেখছ না, গান শিখে গান করবে।" গায়ক লজ্জিত হয়ে পরের দিন ঐ শ্রোতাদেরই একজনের কাছে গানটি সম্পর্কে প্রশ্ন করলে, সেই শ্রোতা বড় দশকোশী তালের প্রসিদ্ধ এ গানটির এক কলি গেয়ে শুনিয়ে দিলেন। গায়ক ক্ষমা চেয়ে মুক্তি পেলেন। অনুরূপ ঘটনা ঘটেছিল বহুদিন আগে রাধাকুণ্ডে। প্রসিদ্ধ গায়ক দামোদর কুণ্ডু মহাশয় ঐ স্থানে হোরী গান গাইতে শুরু করেন। যথারীতি সকল বাবাজীই শ্রোতা হয়ে বসেছেন। অপূর্ব গান হচ্ছে। কোনও একটি গানে ছিল সুহই রাগের প্রভাব, শ্রোতারা হুংকার দিয়ে উঠে চলে গেলেন এবং মন্তব্য করলেন, 'এ গায়কের মুখ দেখা পাপ'। মনোকষ্টে পরদিন কুণ্ডের পাশে বসে আছেন দামোদর, এমন সময়ে ঐ শ্রোতাদেরই একজন স্নান করে ঐ পথে যাচ্ছিলেন। দামোদর করজোড়ে ক্ষমাভিক্ষা করে পূর্ব-দিনের অপরাধ সম্পর্কে যখন জ্ঞাত হতে চাইলেন, সেই শ্রোতা ভক্ত তখন বললেন—"তোমার সব গানেই বসন্ত রাগিণীর প্রভাব ছিল, তাই সকলেই তখন বসন্তের বিলাস স্মরণে আরোপিত। আকস্মিক তুমি সুহই প্রভাবিত গান শুরু করাতে সকলের আরোপ নষ্ট হয়ে গেল।" দামোদর বললেন, "প্রভু, আমি এই গান সুহই রাগের প্রভাবেই শিখেছি।" তখন বাবাজী বললেন—"গান তোমার ঠিক হলেও পূর্বাপর সম্পর্ক রক্ষা করে গানটি গাইতে হয়।" দামোদর প্রশ্ন করলেন—"তা কি করে সম্ভব?" বাবাজী তখন নিজে সুর করে গানটি গেয়ে তাঁকে দেখিয়ে দিলেন। এমন বহু আসরের সন্ধান আছে যেখানে গায়ককে দর্প হারাতে হয়। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বর্ধমান ইত্যাদি জেলার গ্রামে গঞ্জে চাষীমহলে এখনও এমন অনেক লুপ্তপ্রায় গান বেঁচে আছে।

আজ থেকে প্রায় ত্রিশ বছর আগে কাটোয়া-আজিমগঞ্জ রেলপথে ঝামটপুর-বহড়ান রেল-স্টেশনে নেমে কৃষ্ণদাস কবিরাজের পাটে যাব বলে অপেক্ষা করছি। এমন সময়ে শুনি একটি আঠারো-বিশ বছরের যুবক মাথায় কাপড়ের পাগড়ী বেঁধে গোটাকতক গরুকে মাঠে ছেড়ে দিয়ে গুনগুন করে একটা গানের সুর ভাঁজছে। অনুমানে মনে হ'ল জাতগানের সুর। ইচ্ছে হ'ল তাকে কিছু প্রশ্ন করি। কাছে গিয়ে প্রথমে জিজ্ঞাসা করলাম—"পাটবাড়ী যাব কি করে?" সে নির্দ্বিধায় উত্তর দিল—"এইত সুমুখের গাঁয়ে ঢুকে যাও, দু'কদম হাঁটলেই পাবে।" জিজ্ঞাসা করে জানতে পেলাম—তার নাম ছিদাম ঘোষ, পাশের গাঁয়েই বাড়ী। জিজ্ঞাসা করলাম—"ভাই, কি গান গাইছিলে?" সে বলল—"গোঠের একটি গান, আমার বাবা গাইতেন।" অনুরোধ করতেই সে গানটি আবার গেয়ে দিল। গানটি হ'ল—"নীলপীত ধড়া নন্দ সাজায় আপনি।" প্রসিদ্ধ মধ্যম দশকুশী গান। সামান্য দোষত্রুটি বাদ দিলে গানটি অপূর্ব করে এক কলি গেয়ে শুনাল। একে মুর্শিদাবাদের কণ্ঠ, আবার পাটের কাছে বাড়ী। এমন কত গান কত জনের কাছে ছড়িয়ে আছে, ঘরে বসে তার হদিশ মেলা ভার। এমন আর একটি ইতিহাস বলেছেন—৺রাধারমণ কর্মকার, প্রখ্যাত কীর্তনীয়া। কলকাতায় গড়পারে কালীবাবুর বাড়ীর আসরে প্রতিবছরই রাধারমণদা একটি নূতন গান শোনাতেন। একবার কলহান্তরিতা গান গাইতে গিয়ে একটি গান—"কৈছে চরণ কর পল্লব ঠেললি, বেললি মান ভুজংগে"—বিষম পঞ্চম তালে গেয়ে শোনালেন। এতদিন জানতাম গানটি চঞ্চলগতি চঞ্চুপুট তালেই গাওয়া হয়। কিন্তু গানটির এই নূতন রূপ দেখে স্তম্ভিত হলাম। পরে রাধারমণদার কাছে জানতে চাইলাম, এ গানটি তিনি কোথা থেকে পেলেন। বেশ মজা করে গানের সূত্রটি তিনি বললেন এবং জানা গেল কাটোয়ার কাছে দাঁইহাটের কোন অঞ্চলের একজন চাষীভাইয়ের কাছ থেকেই এ গানটি তিনি পেয়েছেন। তার নাম অনিল বৈরাগ্য। এমন বহু ঘটনা আছে যার ইতিহাস সমগ্রভাবে তুলে ধরলে রাঢ়বঙ্গের পল্লীবাসীদের প্রতি সকলেই শ্রদ্ধাশীল হবেন। তাঁরা সবাই গায়ক নন, অনেকেই শ্রোতা মাত্র। সাধে কি দাবী করা হয় যে কীর্তন হ'ল বাঙালীর গান।

কীর্তন বাঙালীর সাংস্কৃতিক সম্পদ, কারণ অবিভক্ত বাংলার পল্লীতে পল্লীতে প্রতিটি গৃহস্থ-ঘরে যে-কোন মাঙ্গলিক বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে কীর্তন গানের ব্যবস্থা করা হ'ত এবং বর্তমানেও হয়ে থাকে। সন্তান জন্মাবার পর ষষ্ঠীর রাতে কীর্তন, গৃহসঞ্চারে কীর্তন, গরু বাচ্চা দিলে কীর্তন, পূজায় পার্বণে কীর্তন, অসুস্থতা-নিবারণে কীর্তন, শ্মশানযাত্রায় কীর্তন, সর্বশেষ শ্রাদ্ধবাসরে কীর্তন। তাই কীর্তনের পরিব্যাপ্তি জনজীবনের সর্বত্র। কেবল ধর্মীয় আচরণ বলে সীমিত করে রাখলে যেমন কীর্তনকে সংকীর্ণ করা হয়—তেমনি কেবল গানের ধারা বললেও কীর্তনের প্রকৃত পরিচয় দেওয়া হয় না। কীর্তন

হ'ল বাঙালীর উদার মানসিকতার পরিচয়বাহী উন্নতমানের সংগীত, যার উপর ধর্মীয় গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে শ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর দ্বারা। এ কীর্তন বাঙালী কণ্ঠ ভিন্ন অন্য কণ্ঠে যথার্থভাবে গীত হয় না। ওড়িষ্যাই হোক আর মণিপুরই হোক বঙ্গের কীর্তনকে তাঁরা অনুকরণ করতে চেয়েছেন কিন্তু যথার্থ অনুকরণ সম্ভব হয় নাই; যে কারণে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে ওড়িষ্যার কতিপয় লেখক বা আসামের শংকরদেব ভিন্ন কীর্তনের পদ সৃষ্টি করেছেন। মহাজন পদাবলীর মৌলিক রূপ তাঁরা ধরে নিতে পারেন নাই। বৈষ্ণব পদকর্তা বিরচিত মহাজন পদাবলীর সাহিত্য বাংলা সাহিত্যের মূল পর্যায় বলে গণ্য। কীর্তনের উৎপত্তি বিষয়ে যদি বৈষ্ণব সাহিত্যের উল্লেখগুলি মানতে হয় তবে নিশ্চিতভাবে বলতে হয় যে, এ কীর্তনের স্রষ্টা বঙ্গভূমিজাত শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ। তা ছাড়া ষোড়শ-সপ্তদশ শতক পর্যন্ত বঙ্গদেশে অন্য কোন স্বকীয় অভিজাত সংগীত ছিল বলে জানা যায় না। কেবলমাত্র কীর্তন গানই ছিল সামাজিক গান, সকলের গান তথা বাঙালীর গান। গৃহস্থবাড়ীর প্রতিটি অনুষ্ঠানেই যে কীর্তন হয়ে থাকে সবক্ষেত্রেই সেগুলি পদাবলী কীর্তন বা নাম-কীর্তন নয়। অনেকক্ষেত্রে 'পাল্লাগান' বা 'জবাবী গান'ও হয়। এগুলি মূলত বাউল গান, দুজন গায়ক থাকে, দল কোথাও একই থাকে, কোথাও আবার দুটি থাকে। প্রধানত গুরু-শিষ্য, দেহতত্ত্ব, পঞ্চতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ক গানগুলিতে একটি প্রচ্ছন্ন প্রশ্ন থাকে, দ্বিতীয় গায়ক তার উত্তর দেন, আবার তিনিও একটি প্রশ্ন করে থাকেন। এমন প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে গানগুলি হয় বলেই এগুলিকে 'পাল্লাগান' বলা হয়। পূর্ববঙ্গে এ গানের প্রচলন খুব বেশী। এগুলি বাউলধর্মী গান হলেও পুরোপুরি কীর্তনের পদ্ধতিতেই এগুলি গাওয়া হয়, সেজন্য এগুলিকেও কীর্তন বলেই বলা হয়ে থাকে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে বসে 'ছুটা গানের' আসর বা বৈঠকী আসর। এ আসরে কিন্তু পুরাতনী গানও গাওয়া হয়, সেই সঙ্গে 'বাঁধুটী গান' বলে এক ধরনের গান গাওয়া হয় যার তাল এবং ছন্দ বেশ কঠিন। বাদকের পূর্ব থেকেই জানা না থাকলে এসব গান বাজানো কঠিন। এর মধ্যে কৃষ্ণকমল গোস্বামী, লক্ষ্মীকান্ত কীর্তনীয়া, চন্দ্রাধুবী, অক্ষয় পাল প্রমুখ অনেকের রচিত গান আছে। তাছাড়া বরিশালের নট্টসম্প্রদায়ের লোকেদের রচিত কতকগুলি পদ এবং সুর এসব 'বাঁধুটি গানে' পাওয়া যায়। অনেক বাড়ীতে কৃষ্ণলীলা গান হয়। এমন বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে একজন স্থানীয় অধিকারীর পরিচালনায় কতিপয় কিশোর বালককে বেশভূষায় সজ্জিত করে নিমাইসন্ন্যাস, কৃষ্ণসুদামা, মানভঞ্জন, কলংকভঞ্জন ইত্যাদি পালাগুলিকে নাটকীয়ভাবে উপস্থাপিত করা হয়। এসব গানের আসরগুলির ব্যবস্থা করা হয় ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায়। বাড়ীর উঠানে ওজনের হরিলুট, হারানো প্রাপ্তি, আরোগ্য-লাভ ইত্যাদি যে-কোন সাধারণ বিষয়ের জন্য কীর্তনের ব্যবস্থা করে থাকেন

গৃহস্থ। এর পশ্চাতে একদিকে যেমন সংস্কারের প্রভাব থাকে, অন্যদিকে থাকে সকলের সঙ্গে মিলেমিশে সাময়িক একটু আনন্দের বাটোয়ারা করার উদ্দেশ্য। এছাড়া চাঁদা তুলে যৌথ প্রচেষ্টায় সর্বজনীনভাবেই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বড় বড় কীর্তনের আসর বসানো হয়ে থাকে।

কীর্তন মেলা

পশ্চিমবঙ্গে কিছু কিছু নির্দিষ্ট স্থান আছে যেখানে বহুকাল যাবৎ কোন নির্দিষ্ট তিথিতে বিশেষ কীর্তন উৎসব হয়ে থাকে। ঐসব প্রতিটি স্থানেরই প্রাচীন মাহাত্ম্য আছে, এবং সেখানে উৎসব উপলক্ষে বঙ্গদেশের প্রায় সমস্ত প্রসিদ্ধ কীর্তনীয়াগণ সদলে উপস্থিত থাকেন। একদিন, দু'দিন বা তিন দিন ব্যাপী ধারাবাহিকভাবে কীর্তন চলতে থাকে, বিভিন্ন পালা গেয়ে থাকেন বিভিন্ন গায়ক। অসংখ্য জনসমাগম হয়, বহু দূর দেশ থেকেও অনেক লোকজন এসে থাকে। প্রতিটি দলের জন্য একটি করে বাসাবাড়ী, একজন আজ্ঞাবাহক, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সিধা ইত্যাদি দিয়ে সুবন্দোবস্ত করা হয়। যত সাধারণ লোকই হউক না কেন, প্রতিটি কীর্তনীয়া সেখানে সম্মানিত অতিথি। বহু জন-সমাগম হয় বলে এগুলিকে বলা হয় মেলা। আগে বহুস্থানে এমন 'কীর্তন মেলা' হ'ত কিন্তু বর্তমানে তার সংখ্যা অনেক হ্রাস পেয়েছে। এর মধ্যে কতিপয় প্রসিদ্ধ মেলার উল্লেখ করা যেতে পারে। এগুলি হ'ল—

১। মুর্শিদাবাদ জেলার 'ভরতপুর' গ্রাম। কাটোয়া-আজিমগঞ্জ রেলপথে সালার স্টেশনে নেমে বাসে ভরতপুর গিয়ে গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করলেই গোপীনাথের মন্দির। স্থানটির ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধি হ'ল এই যে এখানে শ্রীচৈতন্যদেবের পার্ষদ, রাধাশক্তি গদাধর পণ্ডিতের জন্ম। গদাধরের কণ্ঠে ঝুলানো থাকত যে গোপীনাথ শিলাবিগ্রহ তাই এখানে মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত, আর সেই সঙ্গে আছে শ্রীচৈতন্যদেব ও গদাধর পণ্ডিত উভয়ের হাতে-লেখা সাতশত পঁয়তাল্লিশ শ্লোকের শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা। স্থানটি মুসলমানপ্রধান কিন্তু মেলার সময় সবার মিলনে অপূর্ব আনন্দ সৃষ্টি হয়। মেলা হয় বৈশাখ মাসের অমাবস্যা তিথিতে। স্তিমিত হলেও, উৎসবের কিছুটা এখনও আছে।

২। মুর্শিদাবাদ জেলার 'ঝামটপুর' গ্রাম। কাটোয়ার পরে ঝামটপুর-বহড়ান স্টেশনে নেমে পূর্বদিকের গ্রামে প্রবেশ করে কিছুটা গেলেই পাটবাড়ী। চারদিকে শুধু মাটির ঘর, খড়ের ছাউনী। পল্লী হিসাবে অনুন্নত। এ পল্লীরই এক-ধারে ছোট একতালা একটি ঘরে মন্দির। স্থানটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব হ'ল, এখানে চৈতন্যচরিতামৃত-রচয়িতা কৃষ্ণদাস গোস্বামী জন্মগ্রহণ করেন। এখানে মেলা হয় আশ্বিন মাসের শুক্লা একাদশী তিথিতে। পার্শ্ববর্তী গ্রাম দক্ষিণখণ্ডেও ঐ একই সময় উৎসব হয়ে থাকে। ঐ উৎসব ইদানীং প্রবর্তিত হয়েছে কীর্তনীয়া

যামিনী মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের দ্বারা। অনেকসময় একই গায়ক উভয় স্থানে গানে যোগ দিয়ে থাকেন।

৩। বীরভূম জেলার 'একচক্রা' গ্রাম। প্রকৃত উৎসবের স্থানটির নাম গর্ভবাস, যেখানে শ্রীনিত্যানন্দ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বর্ধমান থেকে রামপুরহাট রেলপথে 'মল্লারপুর' স্টেশনে নেমে বাসে বা হেঁটে প্রায় দশ মাইল দূরে গর্ভবাস। সুন্দর একতলা মন্দির, বাইরের দিকে নাটমন্দির, পাশে একটি যাত্রীনিবাসও বর্তমানে হয়েছে। অল্পদূরে 'বীরচন্দ্রপুর', সেখানে আছেন 'বাঁকা রায়' বিগ্রহ ; মূলতঃ কৃষ্ণবিগ্রহ। কথিত আছে কালাপাহাড় সংহারী রূপ নিয়ে যখন ঐ মন্দির ধ্বংস করতে গিয়েছিল তখন ঐ বিগ্রহ নেত্র বিস্ফারিত করে মাথা ঘুরিয়ে তাকিয়েছিলেন, তা দেখে কালাপাহাড় পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হয়। ঐ গর্ভবাসে কীর্তনোৎসব হয়—মাঘ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশীতে এবং আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের নবমী তিথিতে।

৪। বর্ধমান জেলার 'শ্রীখণ্ড' গ্রাম। বর্ধমান-কাটোয়া লাইট রেলপথে কাটোয়া থেকে কিছুদূরে শ্রীপাট-শ্রীখণ্ড স্টেশনে নেমে খানিকটা গ্রামের মধ্যে হেঁটে গেলেই ঠাকুরবাড়ী। এই বাড়ীতেই শ্রীচৈতন্যদেবের পার্ষদ নরহরি সরকার মহাশয় এবং রঘুনন্দন আচার্য জন্মগ্রহণ করেন। নরহরি সরকার ছিলেন ব্রজলীলার মধুমতী। তাছাড়া তিনি পদকর্তাও ছিলেন। চৈতন্যমঙ্গলের রচয়িতা লোচনদাসও ঐ স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। মনোরম পরিবেশে মহাপ্রভুর মন্দির। অনতিদূরে মাঠের মধ্যে মেলা, উৎসব হয়—এটিকে বড়ডাঙ্গার উৎসব বলা হয়। কার্তিক মাসের কৃষ্ণা দ্বাদশীতে ঐ উৎসব হয়ে থাকে। বহু জনসমাগম হয়। ঐ স্থানে গৌরগুণানন্দ ঠাকুর মহাশয় নিজের তত্ত্বাবধানে রেখে কীর্তন-শিক্ষার্থীদের বিনা পারিশ্রমিকে শিক্ষা দিতেন। এদের মধ্যে যাঁরা খ্যাতিলাভ করেছেন, তাঁদের মধ্যে আছেন হরিদাস কর, পঞ্চানন ভট্টাচার্য প্রমুখ ব্যক্তিগণ।

৫। বর্ধমান জেলার 'জাজীগ্রাম'। কাটোয়া থেকে অল্পদূরে বাসে যেতে হয়। মাঠের পারে উৎসবের স্থান। ভিটে বাঁধানো দোচালা একটি ঘরে রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ। সম্মুখে ইতিহাস-বিজড়িত একটি বড় পুষ্করিণী। স্থানটি মোটেই নিরাপদ নয়, কারণ ধাতব বিগ্রহও মাঝে মাঝে চুরি হয়ে যায়। এখানেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন বৈষ্ণবকুলচূড়ামণি বীর হাম্বীরের গুরু শ্রীনিবাস আচার্য। এখানে উৎসব হয় কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথিতে।

৬। নদীয়া জেলার শান্তিপুরের অতিনিকটে 'বাবলাগ্রাম'। অনেকটা জন-মানবশূন্য বললেও চলে। সেখানেই একতলা মন্দিরে শ্রীরাধামদনগোপাল বিগ্রহ সেবা। সামনে নাটমন্দির, পাশে ছোট ছোট দু'-একটি ঘরে যাত্রীনিবাস। চারদিকে আমলকী গাছের বন। আর যাই হোক, স্থানটি খুব ভজনের উপযোগী। এখানেই জন্মগ্রহণ করেন গৌর-আনা ঠাকুর শ্রীঅদ্বৈতাচার্য। কীর্তনের ইতিহাসে

এ স্থানটির গুরুত্ব খুবই বেশী, কারণ শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ যৌথভাবে বিধি-সম্মত কীর্তনের আয়োজন করেন এখানেই। এখানে মেলা বা উৎসব হয় মাকরী সপ্তমীতে অর্থাৎ মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের সপ্তমী তিথিতে।

৭। 'কাটোয়া' শহরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্দিরে বিশেষ কীর্তন-মহোৎসব হয় শ্রীগদাধর দাসের উৎসব নামে। এই উৎসব হয় কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথিতে।

৮। কলিকাতার নিকটবর্তী 'পানিহাটী'তে শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী প্রবর্তিত দণ্ডমহোৎসব উপলক্ষে বর্তমানেও কীর্তন-মহোৎসব হয়ে থাকে। এই পানি-হাটীতেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন শ্রীরাঘব পণ্ডিত। উৎসবটি সংঘটিত হয় জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষের ত্রয়োদশীতে।

৯। রাজসাহী জেলার খেতুরী গ্রামে এবং সেইসঙ্গে আজিমগঞ্জের নিকটে গাম্ভীলা গ্রামেও বৎসরের বিভিন্ন সময়ে কীর্তন-উৎসব হয়ে থাকে। খেতুরী হ'ল নরোত্তমদাস ঠাকুরের জন্মস্থান, সেখানেই ছয়টি ভগবদ্‌বিগ্রহ স্থাপিত হয়েছিল এবং সে উৎসবের সূত্রে কীর্তনে অনেক বৈশিষ্ট্য সংযোজিত হয়েছে। তাই এই উৎসবের প্রতি সকলেরই আকর্ষণ থাকে। এখানে উৎসব হয় : (ক) বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের একাদশী থেকে পূর্ণিমা পর্যন্ত। (খ) শ্রাবণমাসের পূর্ণিমা তিথিতে এবং কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে। (গ) আশ্বিন মাসের কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমী তিথিতে।

১০। 'শ্রীধাম নবদ্বীপ', হাওড়া থেকে তিনঘণ্টার পথ। সর্বত্রই ঠাকুরবাড়ী আর নাটমন্দির। এখানে প্রায় সবসময়ই কীর্তন থাকলেও, বিশেষভাবে সকল গায়ক বাদক একত্র হন ধূলটের সময়। বৈষ্ণবদের কার্তিকব্রত বা পুরশ্চরণকাল বলে একটি নির্দিষ্ট সময় আছে যার শুরু হয় বিজয়াদশমীর পরদিন থেকে, শেষ হয় রাসপূর্ণিমায়। মাসাধিক এই সময়ে নবদ্বীপের প্রতিটি ঠাকুরবাড়ীতে বড় বড় গায়কদের গান থাকে। এই ঠাকুরবাড়ীগুলির মধ্যে মহাপ্রভুর বাড়ী, নিতাইর বাড়ী, গোবিন্দবাড়ী, শ্রীবাস অঙ্গন, নবদ্বীপ হরিসভা, মদনমোহনের বাড়ী ইত্যাদি প্রধান। প্রায় প্রতিদিনই নগরসংকীর্তন এবং ধাম-পরিক্রমার দল নিয়ে সংকীর্তনাদি হয়ে থাকে। শান্তিপুরে ধূলট উৎসব হয় মাঘ মাসের শুক্ল-পক্ষের সপ্তমী তিথিতে। ঐ তিথিতে আবার নবদ্বীপেও বারো দিনের বিশেষ ধূলট উৎসব শুরু হয় মহাপ্রভুর বাড়ীতে ভাগ্যকুলের কুণ্ডু মহাশয়দের পরিচালনায়। রাজা জানকীনাথ রায়ই ঐ উৎসবের প্রবর্তক ছিলেন।

১১। মুর্শিদাবাদ জেলার 'উদ্ধারণপুর'। অতি সুন্দর গ্রাম্য পরিবেশ। কাটোয়া থেকে অজয়ের খেয়া পার হয়ে বিস্তীর্ণ চড়াভূমি ধরে গঙ্গাতীর দিয়ে মাইল-তিনেক হেঁটে গেলেই উদ্ধারণপুর। পুরানো মন্দির দু-একটি আছে। ঐ গ্রামেই জন্মগ্রহণ করেন দ্বাদশগোপালের একজন উদ্ধারণদত্ত ঠাকুর, মনে হয় তাঁর নামেই গ্রামটির নামকরণ হয়েছে। উৎসব হয় অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লপক্ষের

-ত্রয়োদশীতে। ঐ তিথিতে আরও একটি উৎসব হয় হুগলী জেলার 'আদি-সপ্তগ্রামে'।

সমগ্র পশ্চিম বাংলায় এমন অসংখ্য উৎসবের সন্ধান আছে, যার অনেকগুলি পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে অবলুপ্তপ্রায়। কতগুলি নিছক চাঁদার উপর নির্ভরশীল, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে সামান্য কিছু দেবত্র চাষী জমি থাকার দরুন কোন-মতে উৎসব প্রতিপালিত হয়ে যাচ্ছে। এমন আরও বহু স্থানের কথা উল্লেখ করা যায়; যেমন—১। বর্ধমান জেলার শক্তিগড় স্টেশন থেকে মাইল ছয় হেঁটে বোড়গ্রাম, বৈশাখ মাসের পূর্ণিমাতে উৎসব। ২। মালদহ জেলার 'রা কেলি'তে জ্যৈষ্ঠ মাসের সংক্রান্তি দিনে উৎসব, ৩। মেদিনীপুর জেলার 'গোপীবল্লভ-পুরে' জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষের পঞ্চমী তিথিতে। ৪। হাওড়া-নবদ্বীপ রেলপথে 'বাঘনাপাড়া'য় উৎসব হয় আষাঢ় মাসের পঞ্চমী তিথিতে। ৫। 'কালনা'য় গৌরী-দাসের পাটে উৎসব হয় দোলপূর্ণিমায়। ৬। ঠাকুর কানাইর উৎসব হয় নদীয়া জেলার 'ভাজনঘাটে', কার্তিক মাসের পূর্ণিমা তিথিতে। ৭। শিয়ালদহ-রাণাঘাট রেলপথে চাকদহ স্টেশনের নিকট 'কাঁঠালপুলি' গ্রামে উৎসব হয় অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশীতে। ৮। জয়দেবের উৎসব হয় বীরভূম জিলার 'কেন্দুলী' গ্রামে পৌষ মাসের সংক্রান্তি দিনে। এখানে অবশ্য বর্তমানে বাউল মেলাই প্রসিদ্ধ। ৯। বর্ধমান জেলার 'আউরিয়া' গ্রামে উৎসব হয় মাঘ মাসের শুক্ল-পক্ষের একাদশী তিথিতে। ১০। হুগলী জেলার 'খানাকুল-কৃষ্ণনগর' অভিরাম পণ্ডিতের পাটে উৎসব হয় মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের একাদশীতেই। তাছাড়া মুর্শিদাবাদ জেলার ভগবানগোলার নিকট 'বুধুরী' গ্রামে রামচন্দ্র কবিরাজ ও পদকর্তা গোবিন্দদাসের জন্মস্থানে উৎসব, দাঁইহাটের নিকট 'অগ্রদ্বীপে' পদকর্তা বাসু ঘোষ ও গোবিন্দ ঘোষের উৎসব হয়। এখানে দারুজ বিগ্রহ গোপীনাথ, গোবিন্দের শ্রাদ্ধাদি করেন। মুর্শিদাবাদের 'কাঁদড়া' গ্রামে পদকর্তা জ্ঞানদাসের জন্মস্থানে মেলা হয়। তাছাড়া নবদ্বীপে প্রাণগোপাল গোস্বামীর বাড়ীতে, মণি-পুরে আনন্দগোপাল গোস্বামীর বাড়ীতে, তিনকড়ি গোস্বামীর ঠাকুরবাড়ীতে, বহরমপুরে নিতাইচাঁদ গোস্বামীর বাড়ীতে, এবং রামসীতাপাড়া গুরুকুঞ্জ প্রভৃতি স্থানের উৎসবগুলি কিছুদিন আগে পর্যন্তও পদাবলী কীর্তনের বিশেষ উৎসব বলে গণ্য হ'ত। হাওড়া জেলার রামকৃষ্ণপুরে গৌরগোপাল গোস্বামীর বাড়ীতে, শ্রীভূমিতে প্রাণকিশোর গোস্বামী মহাশয়ের বাড়ীতে, কলিকাতায় চালতাবাগান গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনীতে, ডব্লিউ. সি. ব্যানার্জী স্ট্রীটে অনঙ্গমোহন হরিসভায়, বিবেকানন্দ রোডে বলরাম ধর্মসোপান ইত্যাদি স্থানে এখনও কীর্তনের জাত-গানের ঐতিহ্য বজায় রেখে বার্ষিক উৎসবাদি সংঘটিত হয়ে থাকে। এর মধ্যে, বিশেষত পাটের উৎসবগুলিতে সকল প্রসিদ্ধ গায়কই উপস্থিত থাকতে চেষ্টা করতেন। সকলেই প্রায় সদলবলে যেতেন। অনেকে আবার একাই চলে যেতেন,

কারণ আঞ্চলিক কিছু গায়ক-বাদক অনায়াসে জুটিয়ে নেওয়া যেত। এমনও শোনা যায় হয়ত একজন বয়স্ক গায়ক মূলে গান করছেন, অন্যান্য দু'একজন মূল-গায়নও তাঁর সঙ্গে দোহারি করে গান নামাতেন। এসব প্রাচীন গায়কদের মধ্যে ছিলেন—অনুরাগীদাস, রসিকদাস, রাধাশ্যাম, প্রতাপ মজুমদার, মহিম সরকার, ফটিক চৌধুরী, অন্ধ শিবদাস, আখরিয়া হরিদাস, দামোদর কুন্ডু, ধ্রুবদাস, বদুনন্দনদাস, যামিনী মুখার্জী, অবধোত বন্দ্যোপাধ্যায়, গণেশ দাস, বনমালী দাস, শচীনন্দন ঘোষ, কমল ঘোষ, যশোদানন্দন, গৌরগোপালদাস (দাঁইহাট), রাধারমণ কর্মকার, হরিদাস কর, রথীন ঘোষ, রাধাচরণবাবাজী, দুঃখভঞ্জন সান্যাল (ভোম্বল মাস্টার), রাসবিহারী মিত্র ঠাকুর, ক্ষুদে ভট্টাচার্য, তাছাড়া ইদানীং নন্দকিশোর দাস, পঞ্চানন দাস, গোপাল দাস (বহরমপুর), গোবিন্দ-গোপাল মিত্র ঠাকুর প্রমুখ। সকলের পক্ষেই উৎসবের আকর্ষণ যে কেবলমাত্র ধর্মীয় কর্তব্য ছিল তা নয়, সেখানে সংগীতের একটি বিশেষ প্রতিযোগিতা ছিল। কে কোন্ গান, কোন্ পর্যায় নতুন করে গাইতে পারেন, বিন্যাস করতে পারেন সেদিকেই ছিল অনেকের আকর্ষণ। অন্য কারণ যাই থাকুক না কেন, বাস্তবে এইগুলি সংগীতের আসরেই পর্যবসিত হ'ত। এসব আসরে লীলা-কীর্তনই হ'ল প্রধান।

পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থানে এমন অনেক বড় বড় আসর হ'ত। পশ্চিমবঙ্গের লীলাকীর্তনগুলির আসরে দেখেছি দু'হাজার থেকে প্রায় পাঁচ-সাত হাজার পর্যন্ত শ্রোতার সমাগম হ'ত। পূর্ববঙ্গে অবশ্য লীলাকীর্তন অপেক্ষা নামকীর্তনের প্রসারই ছিল। তবু ঐ বঙ্গেও বিভিন্ন জেলায় প্রসিদ্ধ কিছু আসর ছিল। যেমন ফরিদপুরের শ্রীঅঙ্গনে, কাছাড় জেলার নরসিংপুরে, চট্টগ্রামের খিতাপচরে, ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জের নিকট চান্দুড়ায়, ফরিদপুরের ওড়াকান্দি, চট্টগ্রাম রাইজান থানার অন্তর্গত ডাবুয়া, বীণাজুয়ী ইত্যাদি গ্রামে, বরিশালের কলসকাঠি গ্রামে, পাবনা সোমাতলায়, রাজশাহী জেলার আমহাটি গ্রামে। এছাডা নামকীর্তনের আসর ছিল পূর্ববঙ্গের বড় বড় মোকাম অর্থাৎ হাট-বাজারে। যেমন—বরিশাল জেলার পাতার হাট (প্রাচীন নাম 'পাতাই হাট'), গৌরনদী থানায় গৈলা, ঝালকাঠি, ফরিদপুরের চরমুগুরিয়া, ভোজেশ্বর, মাদারিপুর (পালং), ঢাকা জেলায় ভাগ্যকুল, আব্দুল্লাপুর, সিরাজদিঘা, কলাকোপা ইত্যাদি স্থানে। এছাড়া ঢাকা শহরকে বলা হ'ত দ্বিতীয় বৃন্দাবন। এখানে বহু ঠাকুরবাড়ী। সব বাড়ীতেই গান-বাজনা, প্রধানত কীর্তনগানই হ'ত। এসব ঠাকুরবাড়ীর মধ্যে ছিল—লক্ষ্মীবাজারের লক্ষ্মী-নারায়ণজীর বাড়ী, উত্তর নবাবপুরে লালুপাল-টোকানীপালদের বাড়ী, উত্তর মৈশুন্ডীতে লালমোহন সাহার ঠাকুরবাড়ী, কাগজীটোলায় মোহিনীবাবুর নাচঘর, শ্যামবাজারে গোপীবল্লভ ও বিহারীলালজীর আখড়া ইত্যাদি। বিভিন্ন

উৎসব উপলক্ষে ঢাকার ঐ ঠাকুরবাড়ীগুলিতে গান হ'ত। পশ্চিমবঙ্গের নামজাদা কীর্তনীয়ারা ত যেতেনই, তাছাড়া আগেকার দিনের নামকরা বাঈরাও যেতেন। অবশ্য বিভিন্ন গানের সঙ্গে তাঁদের কীর্তনও গাইতে হ'ত। এঁদের মধ্যে ছিলেন পটলবাঈ, ছাপ্পান্ন ছুরি, পান্নাবাঈ, কমলা ঝরিয়া প্রমুখ অনেকে। এদের স্বকীয় গানের ধারা বজায় রেখে দু'চারখানা কীর্তন গান গাইতেন—সেগুলি অবশ্য মহাজন পদাবলীর পদই থাকত। যেমন পটলবাঈ-এর প্রসিদ্ধ গান ছিল —"কুন্দকুলচম্প্রমাশিশিখিচন্দ্রিকালংকৃতি···" ইত্যাদি। লোফা তালের এ গানটি তিনি অপূর্ব গাইতেন। ছাপ্পান্ন ছুরি গাইতেন—"মেরো অঙ্গনে আওব যব রসিয়া" ইত্যাদি, পান্নাবাঈ গাইতেন "বধূ তোমারি গরবে গরবিনী হাম" ইত্যাদি গান। তাছাড়া গণেশ দাস, রসিক দাস প্রমুখ অনেকেই বহুবার ঢাকা গিয়ে গান করেছেন। সমগ্র বাঙলাদেশে একটি সাংস্কৃতিক ঐক্য স্থাপন করতে পেরেছিল কীর্তন। এদেশের প্রখ্যাত ভাগবত-কথক প্রাণগোপাল গোস্বামী, যদুগোপাল গোস্বামী, নীলমণি গোস্বামী, কুলদারঞ্জন ভাগবতরত্ন পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থানে পাঠ ও বক্তৃতার মাধ্যমে আত্মতৃপ্তিলাভ করেছেন। নদীয়ার কৃষ্ণকমল গোস্বামী, হাওড়ার দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য (গীতিরত্ন) প্রমুখ গায়কগণও বেশীরভাগ পূর্ব-বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন। কীর্তন যে কেবল গ্রামেরই গান ছিল তা নয়, কারণ সেযুগের নবদ্বীপ ছিল যেন 'কেম্ব্রিজ অফ বেঙ্গল'। শহর হিসাবে ঢাকারও আভিজাত্য ছিল খুব বেশী। এসব শহরেও কীর্তনের সমান আদর ছিল। তাই নিঃসঙ্কোচে বলা যায় যে কীর্তনগান হ'ল এককালের বঙ্গদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যপূর্ণ সঙ্গীত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কীর্তনের শ্রেণী

সাধারণ শ্রোতা হিসাবে কীর্তনগানের নানা উপকরণ সমন্বিত অর্থাৎ খোল-করতালের ধ্বনি আর সেইসঙ্গে সবে মিলে একসঙ্গে গান শুনেই তাকে কীর্তন বলে চিহ্নিত করে থাকি। কিন্তু কীর্তন নিজে একটি গানের শ্রেণী হলেও কীর্তনের আবার বিষয়ভিত্তিক বা প্রয়োগভিত্তিক কয়েকটি ধরন আছে—এগুলিকেই কীর্তনের শ্রেণী বলে অভিহিত করা হয়। প্রাথমিক আলোচনায় কীর্তনকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে—যার একটি হ'ল কথকতা কীর্তন বা 'শুক কীর্তন', অপরটি হ'ল 'নারদীয় কীর্তন' বা কীর্তনগান। কীর্তনগানের প্রচলনসূত্রে যে-কয়টি শ্রেণীর সন্ধান পাওয়া যায় সেগুলি নিম্নরূপ :

১। বন্দনা কীর্তন, ২। প্রার্থনা কীর্তন, ৩। আরতি কীর্তন, ৪। অধিবাস কীর্তন, ৫। পরবগান, ৬। সূচক কীর্তন, ৭। নামকীর্তন, ৮। পদাবলী কীর্তন এবং ৯। লীলা বা পালা কীর্তন।

এগুলি সবই যে সমসাময়িক সৃষ্টি ঠিক তা নয়। পদাবলী কীর্তন ও পরব গানের যে ধারা প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে, তাই পরে লীলাকীর্তনের রূপ পরিগ্রহ করেছে; পরবর্তী পর্যায়ে শ্রীচৈতন্যদেবের সূত্রে নামকীর্তনের রূপায়ণ এবং বৈষ্ণবীয় ভজনপ্রণালীসূত্রে বন্দনা, প্রার্থনা, আরতি ও অধিবাসের সূচনা হয়। সূচক গানও প্রাচীনকালের সৃষ্টি, তবে শ্রীচৈতন্যদেবের পার্ষদবৃন্দের সূচক ষোড়শ শতকেরই প্রকরণ।

বন্দনা কীর্তন

বন্দনা হ'ল বৈষ্ণবীয় নববিধা ভক্তির একটি বিশেষ অঙ্গ, সেজন্যই নানাবিধ বন্দনা নানাভাবে লেখা হয়েছে। বর্তমানকালে প্রধানত যে বন্দনাগুলি বিশেষভাবে গীত হয়ে থাকে, সেগুলি হ'ল : ১। গুরুবন্দনা, ২। গৌর-বন্দনা, ৩। পঞ্চতত্ত্ব বন্দনা, ৪। রাধাকৃষ্ণ বন্দনা, ৫। বৈষ্ণব বন্দনা। 'বন্দনা-গান' মঙ্গলগান এবং 'কড়চা' সূত্রেই উদ্ভূত এবং প্রাচীনকালের নিয়ম অনুযায়ী যে-কোন গ্রন্থকার গ্রন্থসৃষ্টির প্রারম্ভেই যে যাঁর উপাস্য দেবতা-সকলকে উদ্দেশ্য করে বিভিন্ন ভাবায় একটি করে বন্দনা লিখতেন। মঙ্গলগানের ক্ষেত্রে অর্থাৎ চৈতন্যমঙ্গল, কৃষ্ণমঙ্গল ছাড়াও মনসামঙ্গল, শীতলামঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, দেবীমঙ্গল ইত্যাদি সব গানেরই প্রথম অংশে গায়ক-পরিচিতি ও বন্দনা থাকে এবং এই বন্দনার অংশটি খুবই আকর্ষণীয়। তবে এসব ক্ষেত্রে বন্দনা অংশটি হ'ল মঙ্গলগানের আঙ্গিক কিন্তু কীর্তনের ক্ষেত্রে 'বন্দনা' নিজেই

একপ্রকার গান। সব বন্দনা-গানই সহজ তালে এবং পরিচিত সুরে গাওয়া হয়, যেন সকলেই এ গানে অংশগ্রহণ করতে পারে। ভাবুক গায়ক এসব বন্দনা-গানের সঙ্গে ভক্তদের অন্তরের কিছু কিছু ভাবের উপযুক্ত আখর সংযোজন করে বন্দনা-গানকেই কীর্তনের একটি বিশেষ শ্রেণীতে রূপান্তরিত করে থাকেন।

১। 'গুরুবন্দনা' বিষয়টি বৈষ্ণবসাধনার একটি মৌলিক নীতি, কারণ ভজনের মূল পথপ্রদর্শকই হলেন গুরু, তাঁরই সূত্রে দীক্ষাদির সাহায্যে গৌর বা কৃষ্ণ ভজনের অধিকার জন্মে। কিন্তু সমগ্র ভজনপন্থায় শ্রীগুরুদেবের স্থানটিকে একটু জটিল করে তোলা হয়েছে। গুরু কৃষ্ণ অভিন্ন সত্তা বলে গণ্য হওয়াতে কোন কোন সাধনার স্তরে জাগতিক দেহ নিয়েই ভক্তগণ সব গোপীদের ভাব অনুকরণ করতে শুরু করেন এবং গুরুকে কৃষ্ণবুদ্ধিতে নানাবিধ সেবা করে থাকেন। সেগুলিই সামাজিক ন্যায্য দৃষ্টিভঙ্গীতে পরবর্তীকালে অশ্লীল এবং নিন্দনীয় পর্যায় বলে গণ্য হয়েছে। এঁরা সহজিয়াপন্থী বলে পরিচিত এবং এককালে এঁদের এমন আচরণের জন্যই বিশুদ্ধ গৌড়ীয় বৈষ্ণবপন্থীরাও অনেক-সময় সমালোচিত হতেন। এঁদের গুরুবন্দনার পদ আছে, তা হ'ল তাঁদের সাম্প্রদায়িক ব্যাপার এবং সেই পদ অন্যান্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ কখনও গান করেন না। তা ছাড়া নদীয়াতেই চাকদহের নিকট 'কর্তাভজা' নামে একটি সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছিল, তার অস্তিত্ব এখনও আছে। এঁদের ভাষায় মূল গুরু হলেন বড়-কর্তা, তাঁর পুত্র কর্তা, এমনি করে গুরুবর্গের ধারাটি হ'ল কর্তার ধারা। এসব সিদ্ধান্ত নিতান্ত ব্যক্তিগত অনুভূতির সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত। আরও এক সম্প্রদায় আছে—'মা-দাদা', এ সম্প্রদায়ে গুরুকে অগ্রজ বা 'দাদা' জ্ঞানে বন্দনা করতে হয়। তাছাড়া বাউল সম্প্রদায়ে গুরু-তত্ত্বটিকে অত্যন্ত সহজ সরল করে নিয়ে তাকে কেন্দ্র করে নানাভাবে বাউলশিক্ষার পদ সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং বিভিন্ন ধরনের গুরুবাদের ভিত্তিতে বিভিন্ন ধরনের গুরুবন্দনা রচিত হয়েছে, কিন্তু এসব গুরুবন্দনা বৈষ্ণবগণ গানও করেন না, আস্বাদনও করেন না। তাঁদের কাছে : "মহিমায় গুরু কৃষ্ণ এক করি জান।" গুরু সমস্ত মঙ্গলাধার সর্বানন্দময় বিভু সত্তা। "শুদ্ধস্বর্ণরুচি বিভ্রম, শুদ্ধ ভাবভূষা কলেবরং, সচ্চিদানন্দ সান্দ্রাঙ্গং, করুণামৃতবর্ষিণং"—ইত্যাদি। যেহেতু আত্মাকে তথা পরমাত্মাকে প্রিয়তমরূপে পাবার সুযোগ তিনি করে দেন, তাই তিনি বিদ্বান এবং তিনিই হরি অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ।

"স বৈ প্রিয়তমশ্চাত্মা যতো ন ভয়মণ্বপি।
ইতি বেদ স বৈ বিদ্বান যো বিদ্বান সো গুরুর্হরিঃ॥"—শ্রীমদ্ভাগবত

গুরুকে কৃষ্ণরূপে, আবার গুরুকে সখারূপে ভজন করাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের বিধি। তিনি 'অখণ্ডমণ্ডলাকার', চরাচরপরিব্যাপ্ত, জ্ঞানাঞ্জনশলাকাধারী। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর যে-কোন দেবজ্ঞানে তিনি পূজ্য। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের উক্তি হিসাবে

শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে উক্ত আছে :

"আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যা সূয়েৎ সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥"

বামনসংহিতায় উক্ত আছে :

"যো মন্ত্রঃ সো গুরুঃসাক্ষাৎ যো গুরুঃ স হরিঃ স্মৃতঃ।
গুরুর্যস্য ভবেত্তুষ্টস্তস্য তুষ্টো হরিঃ স্বয়ং॥"

এমনভাবে শ্রীগুরুমাহাত্ম্য বিভিন্ন গ্রন্থে নানাভাবে উল্লিখিত হয়েছে, তবে খুবই স্পষ্ট এবং সুশৃঙ্খল ও সরলভাবে বাংলাভাষায় বর্ণনা করেছেন ঠাকুর নরোত্তম। বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণব বিভিন্ন কুলে গুরুবাদের বিভিন্ন অনুভূতি প্রতি-ফলন-জনিত তত্ত্বসংকটের মুখে, গুরুতত্ত্বের সমগ্রদিক রক্ষা করে আটটি সংস্কৃত শ্লোকে নিবন্ধ একটি বন্দনা রচনা করেছেন শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী তাঁর 'স্তবামৃত লহরী' গ্রন্থে। গুরুদেবের বন্দনা হিসাবে নিত্যপাঠ্য এবং কীর্তনীয় এ শ্লোক কয়টিকে 'গুর্ব্বাষ্টক' বলে চিহ্নিত করা হয়। অষ্টকটি হ'ল :

১। "সংসারদাবানললীরলোকত্রাণায় কারুণ্য ঘনাঘনত্বং।
প্রাপ্তস্য কল্যাণগুণার্ণবস্য বন্দে গুরুশ্রীচরণারবিন্দম্॥

২। মহাপ্রভো কীর্ত্তননৃত্যগীতবাদিত্রমাদ্যং মনোসরসেন।
রোমাঞ্চ কম্পাশ্রু তরঙ্গভাজ বন্দে গুরুশ্রীচরণারবিন্দম্॥

৩। শ্রীবিগ্রহারাধনা নিত্যনানাং শৃঙ্গার তন্মন্দির মার্জ্জনাদৌ।
যুক্তস্য ভক্তাংশ্চ নিযুঞ্জতোঽপি বন্দে গুরুশ্রীচরণারবিন্দম্॥

৪। চতুর্ব্বিধ শ্রীভগবদ্প্রসাদ স্বাদ্বর্ণতৃপ্তাং হরিভক্তসংজ্ঞাং।
কৃত্যেব তৃপ্তিং ভজত সদৈব বন্দে গুরুশ্রীচরণারবিন্দম্॥

৫। শ্রীরাধিকামাধবয়োরপার মাধুর্য্যলীলা গুণরূপনাম্নাং।
প্রতীক্ষণাস্বাদন লোলুপস্য বন্দে গুরুশ্রীচরণারবিন্দম্॥

৬। নিকুঞ্জ যুনোরতি কেলি সিদ্ধে যার্যালিভির্যুক্তিরপেক্ষণীয়।
তত্রাতিদাক্ষাৎ অতিবল্লভস্য বন্দে গুরুশ্রীচরণারবিন্দম্॥

৭। সাক্ষাৎ ধরিত্তেন সমস্তশাস্ত্রৈরুক্তৈস্তথাভাব্যত এবসদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভুর্য প্রিয়রেব তস্য বন্দে গুরুশ্রীচরণারবিন্দম্॥

৮। যস্য প্রসাদাৎ ভগবৎপ্রসাদ যস্যাপ্রসাদান্ন গতি কুতোঽপি।
ধ্যায়ংস্তুবং তস্যবসস্ত্রিসন্ধ্যাং বন্দে গুরুশ্রীচরণারবিন্দম্॥
শ্রীমদ্গুরোরষ্টক মেতদুচ্চৈ ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে পঠতি প্রযত্নাদ্।
যস্তেন বৃন্দাবননাথ সাক্ষাৎ সেবৈব লভ্যাজনু সহস্ত এব॥"

এইটি নিত্যকল্প বন্দনা হলেও, কীর্তন আসরে গাইবার উপযুক্তও। বেশ কয়টি গুরুবন্দনার গান পাওয়া যায়, তার মধ্যে যে গানটি সবচেয়ে বেশী প্রচলিত সেটি হ'ল বৈষ্ণবদাস রচিত একটি প্রসিদ্ধ পদ। প্রাচীন বড় গায়কগণ গানটিকে

একতালি তালে গাইতেন কিন্তু পরবর্তী যে সুরটির প্রচলন তা সাধারণ দাসপ্যারী তালের প্রচলিত সুর। গানটিতে একদিকে যেমন বৈষ্ণবোচিত আর্তি, অন্যদিকে শ্রীগুরুদেবের নিকট প্রার্থনা। নানাবিধ আখর সংযুক্ত করে নানাভাবে বৈষ্ণব-মহলে গানটি গাওয়া হয়ে থাকে, কিন্তু ইদানীং সবচেয়ে আকর্ষণীয় করে গাইতেন শ্রীরামদাসবাবাজী মহারাজ। তাঁর সংযোজিত আখরগুলি সব শাস্ত্রীয় প্রবচনের মত এখনও অনেকের কণ্ঠে গীত হয়ে থাকে। গানটি হ'ল :

মূলপদ—"জয় জয় শ্রীগুরু প্রেমকল্পতরু"

আখর—
১। বদনভরে জয় গাও ভাই
২। পরমকরুণ শ্রীগুরুদেবের
৩। যাঁহার কৃপায় নাম পেলাম।—ইত্যাদি

মূলপদ—"অদ্ভুত যাহাক প্রকাশ হে।"

আখর—
১। কি অদভুত প্রকাশরে ভাই
২। জীবের নিস্তার লাগি
৩। আপনি শ্রীনন্দসুত।—ইত্যাদি

মূলপদ—"হিয়া অগেয়ান তিমির বর জ্ঞান
সুচন্দ্র কিরণে করু নাস হে॥"

আখর—
১। আমার অজ্ঞান আঁধার বিনাস কর
২। জ্ঞানাঞ্জন শলাকা দিয়ে
৩। ওহে আমার দয়াল গুরু।—ইত্যাদি

মূলপদ—"ইহ লোচনানন্দ ধাম।
অযাচিত মো হেন পতিত হেরি যো পঁহু
যাচি দেওয়ল হরিনাম॥"

আখর—
১। যেচে সেধে নাম দিল ভাই
২। এমন দয়াল আর দেখি নাই
৩। পতিত অধম উদ্ধারিতে।—ইত্যাদি

মূলপদ—"দুরমতি অগতি অসৎমতি যোজন
নাহি সুকৃতির লবলেশ।"

আখর—
১। কোন সুকৃতি নাই হে আমার
২। আকৃতিতে মানুষ বটে
৩। প্রকৃতিতে পশুর অধম।—ইত্যাদি

মূলপদ—"শ্রীবৃন্দাবন যুগল ভজনধন
তাহে করল উপদেশ॥"

আখর—
১। নিরজনে ভজ গিয়া
২। শ্রীরাধামদনগোপাল পদ

৩। ভজিলে আনন্দ পাবে।—ইত্যাদি

মূলপদ—"নিরমল গোর প্রেমরস সিঞ্চনে
পূরাওয়ল সব মন আশ।"

আখর— ১। কেউত বাকী রইল নারে
২। আমি বাকী রইলাম পরে
৩। ভবসংসার পারাবারে।—ইত্যাদি

মূলপদ—"সোচরণাম্বুজে রতি নাহি হোয়ল
রোয়ত বৈষ্ণব দাস।"

আখর— ১। কি হবে গতি, এখন আমার
২। শ্রীগুরুপদে না হ'ল মতি
৩। বৃথা হ'ল আসা যাওয়া।—ইত্যাদি

এমন আরও অনেক গুরুবন্দনা গান আছে, কিন্তু এ গানটিই বর্তমানে সবচেয়ে জনপ্রিয়, গ্রামোফোন কোম্পানীতে একটি রেকর্ডও করানো হয়েছে।

২। 'গৌরবন্দনা' আবশ্যকীয় বলে নানাভাবে পদরচনা হয়েছে। বিশেষতঃ নরহরি সরকার এবং নরোত্তমদাসের পদগুলি নানাভাবে গাওয়া হয়ে থাকে। তবে 'গৌরবন্দনা' অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যদেবের বন্দনা করা হয় কীর্তনের প্রাক্কালে, অন্য গানের আঙ্গিক পর্যায়ের প্রথম কৃত্য হিসাবে। লীলাকীর্তনে গৌরচন্দ্রিকা প্রচলিত হওয়ার দরুন পৃথকভাবে কোন গৌরবন্দনার পদ গাওয়ার প্রয়োজন থাকে না, কিন্তু তৎসত্ত্বেও প্রাচীন গায়কগণ 'আপত্তনের' সূত্রে গৌরবন্দনা বা আবাহন করে থাকেন। 'আপত্তনের' দুটি অংশ—'পূর্বরূপ' এবং 'উত্তররূপ', যাকে সুরের আলাপও বলা যেতে পারে। এই আলাপ পর্যায়ে—'এস হে, গৌর হে' এই কথাটি নানাভাবে উচ্চারণ করে গৌরবন্দনা করা হয়। এর পরেই শুরু হয় গৌরচন্দ্রিকা, যা মূলতঃ গৌরবন্দনাই। অবশ্য কীর্তনের প্রারম্ভে গৌর ও নিতাইকে আহ্বান করার জন্য দীর্ঘকালের প্রচলিত একটি সহজ পদ আছে। পদটি হ'ল :

"এস গৌরাঙ্গ এস নিতাই।
এস দুটি ভাই গৌর নিতাই
দ্বিজমণি দ্বিজরাজ হে।
পূজিব চরণ এই অকিঞ্চন
রাখিব হৃদয় মাঝে হে॥
যন্ত্র যদি পড়ে থাকে
লক্ষ জনার মাঝে।
যন্ত্রিক বিহনে যন্ত্র
কেমনে সে বাজে॥" ইত্যাদি

আখরপুষ্ট হয়ে ঐ পদটি বেশ আকৃতিসম্পন্ন হয়ে ওঠে। অবশ্য ঐসব আখর সর্বক্ষেত্রে খুবই শাস্ত্রীয় হয় না। যেমন একদিন নূতনবাজার শতবার্ষিকী হরি-সভাতে পাঠের সময় এ প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় দ্বিজপদ গোস্বামী হেসে হেসে একটি মন্তব্য করলেন—"গৌরবন্দনা গাইতে গিয়ে একজন গাইছে—'যদি নইদে ছেড়ে আসতে নার, হৃদয়ে নদীয়া কর'—চৈতন্যদেবের আর কাজ নাই, আমার-তোমার কথায়ই ঠিকাদার পাঠিয়ে হৃদয়কে নদীয়া করে দেবেন আর কি।" অবশ্য কথাটি একদিক থেকে ঠিক, কারণ শ্রীচৈতন্য বিভুতত্ত্ব, জীব হ'ল অণুতত্ত্ব, তাই অণুর মধ্যে বিভুকে আহ্বান করলে অণু-বিভু অপরাধ জাত হয়। এগুলি অবশ্য অত্যন্ত চিন্তাশীল বৈষ্ণবীয় সিদ্ধান্ত। কিন্তু সাধারণ ক্ষেত্রে এসব আখর শ্রোতাদের কাছে খুবই হৃদয়গ্রাহী হয়। এসব ছাড়াও প্রার্থনাদির কীর্তনের আসরে 'গৌরবন্দনা' হিসাবে ব্যবহারযোগ্য বহু গানই আছে, তার উল্লেখ নানা স্থানে আছে।

৩। 'পঞ্চতত্ত্ব বন্দনা' ও 'রাধাকৃষ্ণ বন্দনা' হ'ল শ্রীমদ্ভাগবতপাঠের আদ্যন্ত বা আঙ্গিক কীর্তন। 'পঞ্চতত্ত্ব বন্দনা' গানটিতে গৌর, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, শ্রীবাস ও গদাধর এই পঞ্চতত্ত্ব ছাড়াও অন্যান্য গৌরপরিকরগণের জয়সূচক গান থাকে। অত্যন্ত সহজ সুরে চতুর্মাত্রিক ছন্দের চঞ্চুপুট তালে গাওয়া হয়। ছন্দটি হ'ল—ঝা | দাঘি | নেদা | খি উরর—এমন ছন্দে করতালের তিনটি করে আঘাত। গানটির প্রথম চরণটি একটু টেনে দাসপ্যারী তালে গাওয়া হয়। আখর 'মাতান' হয়ে যাবার পর চঞ্চুপুট তালে শুরু করা হয়। ভক্তদের মনের মত আখর সংযোজন করে কোন কোন স্থানে গানটিকে ভরে তোলা হয়. তবে পরবর্তী অনুষ্ঠানটি হ'ল ভাগবত-পাঠ, তাই বেশী সময় পাওয়া যায় না—কীর্তনের দিক থেকে এটির গুরুত্ব একটু কমে যায়। কিন্তু এ গানটি গাইতেই হয়। এটি হ'ল নিয়ম, এবং উপস্থিত সকলেই সমবেতভাবে এ গানটি গেয়ে থাকেন। এ গানগুলিও রামদাসবাবাজী মহারাজই খুব রসসিক্ত ও ভাবসমৃদ্ধ করে তুলতেন। গানটি হ'ল :

"জয় জয় নিত্যানন্দাদ্বৈত গৌরাঙ্গ।
নিতাই গৌরাঙ্গ নিতাই গৌরাঙ্গ ॥"

এই অংশটুকু সাধারণ দাসপ্যারী। পরবর্তী অংশ চঞ্চুপুট তালে—

"জয় জয় যশোদানন্দন শচীসুত গৌরচন্দ্র।
জয় জয় রোহিণীনন্দন বলরাম নিত্যানন্দ ॥
জয় জয় মহাবিষ্ণুর অবতার শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র।
জয় জয় গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ ॥
জয় জয় স্বরূপ রূপ সনাতন রায় রামানন্দ।
জয় জয় খণ্ডবাসী নরহরি মুরারী মুকুন্দ ॥
জয় জয় পঞ্চপুত্র সঙ্গে ভজেন রায় ভবানন্দ।
জয় জয় তিন পুত্র সঙ্গে নাচেন সেন শিবানন্দ ॥

জয় জয় দ্বাদশগোপাল আদি চৌষট্টিমহান্ত।
জয় জয় ছয় চক্রবর্তী অষ্ট কবিরাজাচার্য্য॥
জয় জয় উড়িয়া গৌড়ীয় যত গৌর ভক্তবৃন্দ।
তোমরা সবে মিলে কর কৃপা আমি অতি মন্দ॥
যেন আকুল প্রাণে গাইতে পারি হা নিতাই গৌরাঙ্গ।
তোমরা কৃপা করে দাও গৌরচরণারবিন্দ॥
(এবার আমায় দাও গৌর চরণ)"

ভক্তদের অতি প্রিয় এ গানটির সবকয়টি চরণ একই সুরে, সেজন্য প্রতি ক্ষেত্রেই দ্বিতীয় চরণটি একটু চড়িয়ে শুরু করা হয় মাত্র।

৪। 'রাধাকৃষ্ণ বন্দনা'ও পাঠের আঙ্গিক কীর্তন, পাঠ শেষ হলে গাওয়া হয়। এ গানগুলি অবশ্য সব গ্রন্থে পাওয়া যায় না। পাওয়া গেলেও পদ সব-ক্ষেত্রে একই রকম নয়। একটু পরিবর্তিতও থাকে। সুর, তাল ও পরিবেশনের দিক থেকে 'পঞ্চতত্ত্ব বন্দনা'ও যেমন 'রাধাকৃষ্ণ বন্দনা'ও অবিকল তেমন, কেবল গানের কথা-কয়টি ভিন্ন। রাধাকৃষ্ণ-বন্দনার গানটি হ'ল:

"জয় জয় রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ।
রাধে গোবিন্দ রাধে গোবিন্দ॥"

এই অংশটুকু দাসপ্যারী, পরের অংশ চঞ্চুপুট তালে।

"জয় জয় শ্যামসুন্দর মদনমোহন বৃন্দাবনচন্দ্র।
জয় জয় রাধারমণ রাসবিহারী শ্রীগোকুলানন্দ॥
জয় জয় রাসেশ্বরী বিনোদিনী ভানুকুলচন্দ্র।
জয় জয় রাধাকান্ত রাধাবিনোদ শ্রীরাধাগোবিন্দ॥
জয় জয় ললিতা বিশাখা আদি যত সখীবৃন্দ।
জয় জয় শ্রীরূপ মঞ্জরী আদি মঞ্জরী অনঙ্গ॥
জয় জয় পৌর্ণমাসী কুন্দলতা জয় বীরাবৃন্দ।
তোমরা সবে মিলে কর কৃপা আমি অতি মন্দ॥
যেন আকুল প্রাণে গাইতে পারি হা রাধে গোবিন্দ।
তোমরা সবে মিলে দাও যুগল চরণারবৃন্দ॥
(এবার আমায় দাও যুগল চরণ)"—ইত্যাদি

চঞ্চুপুট তালের এ গান দুটি গাইবার সময় বিভাগটি হয় নিম্নরূপ—

| —জয়জয় | —শ্যাম | —সুন্দর | ম দন | —মোহন | —বৃন্দা |
" —বন | চন্দ্র |

প্রতিটি চরণের সুর একই রকম, কেবল দ্বিতীয় চরণের 'জয় জয়' অংশটি একটু চড়া করে বলা হয়।

৫। 'বৈষ্ণব বন্দনা'র পদ মহাজন পদাবলীতে অনেক আছে, কিন্তু একটি

গান সর্বক্ষেত্রেই আবশ্যকীয়। অর্থাৎ লীলাকীর্তনই হউক, নামকীর্তনই হউক আর প্রার্থনাদি অন্য কীর্তনই হউক, সবক্ষেত্রে কীর্তনের শেষে সবাই মিলে এ গানটি করে থাকেন। গানটির প্রথম চরণ 'হরি হরয়ে নম কৃষ্ণ যাদবায় নম'— যার উল্লেখ চৈতন্যভাগবতে নামকীর্তন হিসাবে উক্ত আছে। কিন্তু পদটি সামগ্রিকভাবে সকলেরই বন্দনা, প্রধানতঃ বৈষ্ণব-বন্দনা বলে প্রতিক্ষেত্রেই সবশেষে গাওয়া হয়ে থাকে। অত্যন্ত সহজ পাঁচালি গানের সুরের মত, চঞ্চুপুট তালেই গাওয়া হয়। এক্ষেত্রে আখর-সংযোজনার রীতিও বিশেষ নাই। বৈষ্ণব ভক্তগণ প্রায় সকলেই এ গানটি জানেন এবং সমভাবে গেয়ে থাকেন। গানটি হ'ল :

"হরি হরয়ে নম কৃষ্ণ যাদবায় নম।
যাদবায় মাধবায় কেশবায় নম॥
গোপাল গোবিন্দরাম শ্রীমধুসূদন।
গিরিধারী গোপীনাথ মদনমোহন॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত সীতা।
হরিগুরু বৈষ্ণব ভাগবত গীতা॥
জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ॥
এই ছয় গোঁসাঙীর করি চরণ বন্দন।
যাহা হৈতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ॥
এই ছয় গোঁসাঞি যাঁর মুঁই তাঁর দাস।
তাঁ সবার পদরেণু মোর পঞ্চগ্রাস॥
তাঁদের চরণ সেবি ভক্তসনে বাস।
জনমে জনমে হয় এই অভিলাষ॥
এই ছয় গোঁসাঞি যবে ব্রজে কৈলেন বাস।
রাধাকৃষ্ণ নিত্যলীলা করিলেন প্রকাশ॥
মনের আনন্দে বল হরি ভজ বৃন্দাবন।
শ্রীগুরু বৈষ্ণবপদে মজাইয়া মন॥
শ্রীগুরু বৈষ্ণব পাদপদ্ম করি আশ।
নাম সংকীর্তন করেন নরোত্তম দাস॥"

নিত্য-করণীয় এ গানটির সঙ্গে আরও অনেক পদ বৈষ্ণবগায়কগণ সংযোজিত করে, সকলে দাঁড়িয়ে নৃত্যের ভঙ্গীতে গানটি করে থাকেন। এ ছাড়া, প্রার্থনা পর্যায়ে অসংখ্য বৈষ্ণব-বন্দনা আছে। বন্দনা গানের এই কয়টি পর্যায়ই সর্বাধিক প্রচলিত।

প্রার্থনা কীর্তন

ভক্তপ্রাণের আকুতি প্রকাশের জন্য আত্মনিবেদন, দৈন্যবোধ, বৃন্দাবনলালসা

গৌরনিত্যানন্দের চরণে শরণাগতি, বৈষ্ণবের কৃপাভিক্ষা, শ্রীগুরুপাদপদ্মে শরণাগতি ও অভিলাষ-জ্ঞাপন ইত্যাদির অভিপ্রায়ে, গানের উপযুক্ত করে বিভিন্ন সময়ে বৈষ্ণব মহাজনগণ যেসব পদরচনা করেছেন, সেগুলিই হ'ল প্রার্থনার পদ এবং সে গানগুলিই হ'ল 'প্রার্থনা কীর্তন'। এই প্রার্থনাগুলি বৈষ্ণবদের কণ্ঠহার হলেও, অন্যান্য যাঁরা ভজন বা ভক্তিমূলক গান করে থাকেন তাঁরাও এসব গান গেয়ে সকলকে আনন্দ দেন। বৈষ্ণব কবিদের অনেকেরই প্রার্থনা গান আছে; যেমন—গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, নয়নানন্দ, রাধামোহন, বাসুদেব ঘোষ, বলরাম দাস প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ, কিন্তু তৎকালীন সমসাময়িক কবিদের মধ্যে ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা অর্থাৎ নরোত্তমদাস বিরচিত পদাবলী অতীব সুন্দর এবং হৃদয়গ্রাহী। অনেক পরবর্তী কালের কবি প্রেমদাস, বিশ্বরূপ প্রমুখের বৈষ্ণবোচিত প্রার্থনাত্মিকা অনেক পদ বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছে কিন্তু নরোত্তম পদাবলী সম্পূর্ণ স্বকীয় সত্তা নিয়ে আজও অব্যাহতরূপে সকলকে আনন্দ দান করে। এই প্রার্থনাগুলির মধ্যে অনেক গানই গরানহাটি গান হিসাবে প্রসিদ্ধ; সকলের গাইবার উপযুক্ত নয়, কিন্তু শ্রবণে সকলের চিত্ত ভরে ওঠে। এই প্রার্থনা গানগুলিরও শ্রেণী আছে—যেমন গৌর-নিত্যানন্দের প্রতি আর্তি:

"গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক শরীর।
হরি হরি বলিতে নয়নে বহে নীর॥
আর কবে নিতাইচাঁদ করুণা করিবে।
সংসার বাসনা আমার কবে তুচ্ছ হবে॥
বিষয় ছাড়িয়া কবে তুচ্ছ হবে মন।
কবে হাম হেরব সেই মধুর বৃন্দাবন॥
রূপ রঘুনাথ পদে করিয়ে আকুতি।
কবে হাম বুঝব সেই যুগল পীরিতি॥
রূপ রঘুনাথ পাদপদ্ম করি আশ।
প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তম দাস॥"

নরোত্তমদাস ঠাকুরের নিবেদনের পদ সবচেয়ে প্রসিদ্ধ। আত্মনিবেদন হ'ল বৈষ্ণবসাধনার বিশেষ বিধি, কারণ শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উক্তি আছে: 'জীব যখন সমস্ত কর্মভার আমাকে অর্পণ করে আত্মনিবেদন করে তখন সে আমাময় হয়ে ওঠে।'

"মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্ত সমস্ত কর্ম্মা
নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো
ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ॥"

তাই আত্মনিবেদনের আকুতিই বৈষ্ণবের প্রধান বিষয়। রচয়িতা নরোত্তমদাস

বৃন্দাবন থেকে ফিরে এলেও তাঁর আশ মিটে নাই, তাই শ্রীগোবিন্দগোপীনাথের শ্রীচরণে আত্মনিবেদন করে বলছেন :

"শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ কৃপা করি রাখ নিজপদে।
কাম ক্রোধ ছয় জনে লইয়া ফিরে নানা স্থানে
বিষয় ভুঞ্জায় নানা মতে ॥
হইয়া মায়ার দাস করি নানা অভিলাষ
তোমার স্মরণ গেল দূরে।
অর্থলাভ যশ আশে কপট বৈষ্ণব বেশে
ভ্রমিয়া বেড়াই ঘরে ঘরে ॥
অনেক দুঃখের পরে লয়ে ছিলে ব্রজপুরে
কৃপাডোর গলায় বান্ধিয়া।
দৈব মায়া বলাৎকারে খসাইয়া সেই ডোরে
ভবকূপে দিলেক ডারিয়া ॥
পুনঃ যদি কৃপা করি এই বার কেশে ধরি
টানিয়া তুলহ ব্রজধাম।
তবে সে দেখি যে ভাল নতুবা পরাণ গেল
কহে দীন দাস নরোত্তম।"

একতালি গান হিসাবে গানটি খুবই প্রসিদ্ধ। নবদ্বীপের মদনমোহনের বাড়ীতে গান করতেন নিতাইদাস বাবাজী, গানটি ভালো গাইতেন এবং এ গানটিতেই নাকি একতালির ঝুমরা ব্যবহার হ'ত। এমন আত্মনিবেদনের পদের মধ্যে বিদ্যা- পতির প্রসিদ্ধ পদটি হ'ল :

"মাধব বহুত মিনতি করু তোয়।
দেই তুলসী তিল দেহ সমর্পিলু
দয়া জনু না ছোড়বি মোয় ॥
গণইতে দোষ গুণলেশ ন পাওয়বি
যব তুহু করবি বিচার।
তুহু জগন্নাথ জগতে কহায়সি
জগ বাহা নহ মুঞি ছাড় ॥
কিয়ে মানুষ পশু পাখীকুলে জনমিয়ে ॥
অথবা কীট পতঙ্গে।
করম বিপাকে গতায়তি পুন পুন
মতি রহু তুয়া পরসঙ্গে ॥
ভনয়ে বিদ্যাপতি অতিশয় কাতর
তরইতে ইহ ভবসিন্ধু।

তুয়া পদপল্লব করি অবলম্বন
তিল এক দেহ দীনবন্ধু ॥”

গানটি মধ্যম দশকুশী তালের গরানহাটি গান হিসাবেই পরিচিত ; অবশ্য বর্তমানে গানটি নানাভাবেই গাওয়া হয়। প্রাচীন পদ্ধতির এ গানটি নবদ্বীপ ব্রজবাসী মহাশয়ের সূত্রে কলিকাতার কিছু কিছু স্থানে যথাযথরূপে প্রচারিত হয়েছিল, পরবর্তীকালে সিনেমায় করা সুরের প্রভাবে গানটির প্রাচীন সাঙ্গীতিক সত্তা অনেকটা হারিয়ে গেছে। বৃন্দাবনোচিত লালসার অভিব্যক্তি দিয়ে অসংখ্য পদ রচনা করেছেন নরোত্তমদাস। তাঁরই একটি প্রসিদ্ধ বড় দশকুশী গান হ'ল :

“হরি কবে হেন দিন হইবে আমার।
দোহা অঙ্গ নিরখিব দোহা অঙ্গ পরশিব
সেবন করিব দোহাকার ॥
ললিতা বিশাখা সঙ্গে সেবন করিব রঙ্গে
মালা গাঁথি দিব নানা ফুলে।
কনক সম্পুট করি কর্পূর তাম্বুল ভরি
যোগাইব বদন কমলে ॥
রাধাকৃষ্ণ শ্রীচরণ সেই মোর প্রাণধন
সেই মোর জীবন উপায়।
জয় পতিত পাবন দেহ মোরে এই ধন
তুয়া বিনে অন্য নাহি হয় ॥”—ইত্যাদি

পদমাধুর্য বিচারে বা নিবেদনাত্মক অভিব্যক্তি হিসাবে এমন পদ দুর্লভ। প্রার্থনার পদ সম্পর্কে অনেকেরই ধারণা যে, এগুলি বোধ হয় সাধারণ ও সহজ গান, কিন্তু ঠিক তা নয় ; এর মধ্যে অনেক বড় বড় গান ছিল যা এখন লুপ্তপ্রায়। যেমন :

১। জয়জগতারণ কারণ ধাম — বড় দশকুশী
২। গোরা বড় পতিত পাবন — বড় দশকুশী
৩। গোবিন্দ গোপীনাথ — ধরা তালের
৪। গোরা পঁহু না ভজিয়া মৈনু — সমতাল
৫। ঠাকুর বৈষ্ণব পদ — মধ্যম দশকুশী

—ইত্যাদি

প্রার্থনা-গান সাধারণতঃ ঠাকুরবাড়ীতে, অল্প লোকসমাগমে ছোট আসরে বা ঘরে অল্প সময়ের জন্য গাওয়া হয়। কিন্তু এ গানগুলিতে আকর্ষণ থাকে বেশী।

আরতি কীর্তন

এই কীর্তন বেশীর ভাগ ঠাকুরবাড়ীতেই নিত্যকৃত্য। কোন কোন ক্ষেত্রে নিত্য না হলেও, কোন উৎসব বা অনুষ্ঠান উপলক্ষে ভক্তদের সমাগম হলে আরতির সময় কীর্তন গান হয়ে থাকে। সাধারণতঃ খোল, করতাল, কাঁসর, ঘণ্টা ইত্যাদি বাজিয়ে ত্রিসন্ধ্যা আরতি হয় আর বিশেষ সময়ে এর সংগে সংযুক্ত হয় গান। আরতি তিনপ্রকার—(ক) মংগল-আরতি, (খ) মধ্যাহ্নকালীন ভোগ-আরতি এবং (গ) সন্ধ্যা আরতি।

(ক) প্রত্যূষে দেবতার শ্রীবিগ্রহের নিদ্রাভংগ হলে তাঁকে জাগানো হয় এবং তার পরেই মংগল-আরতি শুরু হয়। সেবক পুরোহিত পঞ্চপ্রদীপ, ধূপ, কর্পূর-বাতি, জলশংখ, আচ্ছাদন, পাখা, ফুল এবং সর্বশেষ চামর নিয়ে দাঁড়িয়ে আরতি করতে থাকেন আর সেই সময়ে মন্দিরের সামনে নাটমন্দিরে সকলে খোল-করতাল বাজিয়ে মংগল-আরতির নির্দিষ্ট পদগুলি সমবেতভাবে গাইতে থাকেন। শাস্ত্রে আছে :

"শয়নাদুত্থিতোযস্তু কীর্তয়েম্মধুসূদনং।
কীর্তনাত্তস্য পাপস্য নাশমায়াত্যশেষত ইতি॥"

তাই প্রাতঃকীর্তন আবশ্যকীয়, বিশেষতঃ শ্রীবিগ্রহ-আরতির কালে। মংগল-আরতির দুটি পর্যায়—শ্রীগৌরাংগের মংগলারতি এবং যুগলকিশোরের মংগল-আরতি।

শ্রীগৌরাংগের আরতিকালে গেয় পদটি হ'ল :

"মংগল আরতি গৌরকিশোর।
মংগল শ্রীনিত্যানন্দ জোরহি জোর॥
মংগল অদ্বৈত ভকতহি সংগে।
মংগল গাওত প্রেম তরংগে॥
মংগল বাজত খোল করতাল।
মংগল হরিদাস নাচত ভাল॥
মংগল ধূপ-দীপ লইয়া স্বরূপ।
মংগল আরতি করে অপরূপ॥
মংগল গদাধর হেরি পহুঁ হাস।
মংগল গাওত দীন কৃষ্ণদাস॥"

এর পরে গাওয়া হয় যুগলকিশোরের মংগল-আরতি। বৃন্দাবনের পরিবেশে গেয়। পদটি হ'ল :

"মংগল আরতি যুগল কিশোর।
মংগল সখীগণ প্রেম রসে ভোর॥
রতন প্রদীপ করে টলমল থোর।

নিরখত বিধুমুখ শ্যাম গোর ॥
ললিতা বিশাখা সখী প্রেমেতে অগোর।
করি নিরমঞ্ছন দোঁহে দোঁহা ভোর ॥
বৃন্দাবন কুঞ্জহি ভুবন উজোর।
মুরতি মনোহর যুগল-কিশোর ॥
গাওত শুক পিক নাচত ময়ূর।
চাঁদ উপেখি মুখ নিরখে চকোর ॥
বাজত বিবিধ যন্ত্র ঘন ঘোর।
শ্যামানন্দ আনন্দ বাজায় জয় তোড় ॥"

উভয় মঙ্গল-আরতিতে একই প্রভাতী সুর। তালও উভয়ক্ষেত্রে চণ্ডুপুট। গানটিতে তিনটি তুক স্থায়ী, অন্তরা এবং আভোগ। তাল-বিভাগটি নিম্নরূপ :

১। | —ম | অংগল | আ - | র তি | —যুগ | ল কি | শো— | ও ওর |

২। | —ম | অংগল | স খী | গ ণ | —প্রেম | —রসে | ভো - | ও ওর |

প্রতিটি চরণের বিভাগ এই একই রকম ; তবে সুরের ক্ষেত্রে একটু তফাত আছে। সুরটি হ'ল :

	—	ম	অং	গল	আ	—	র	তি
১।	।	।	।					
	ম	ম	ম	গরে	সারে	রেগরে-	সা-	নিসা
	—	যুগ	ল	কি	শো	—	ও	ওর-
					।			।
	রে	প	ধ	প	ম-	গরে	রেগ,	মপ

	—	ম	অং	গল	স	খী	গ	ণ
২।								।
	—	প	প-	পপ	প	ধ-	প	ম
	—	প্রেম	—	রসে	ভো	—	ও	ওর
					।			।
	প-	পনি	ধনি	ধপ	ম-	গর	রেগ	মপ

অন্তরা ও আভোগের সুর :

	—	রত	ন	প্র	দী	প	—	করে
৩।	প-	পপ	ধ	নি	সা (তার)	সানি (সা তার)	ধ-	ধনি

—	টল	—	মল	খো	—	ও	ওর
নি-	নিরে	সা	নি	ধনি	নি-	সানি	ধপ

৪।

নি	র	—	খত	বি	ধ	মু	খ
প	প	—	পপ	প	ধ	প	ম

শ্যা	—	—	মগ	উ	—	উ	উর
প	নি	ধনি	ধপ	ম	গরে	রেগ	মপ

(খ) মধ্যাহ্নকালীন আরতি বলতে ভোগ-আরতি। ভোগের নানাবিধ দ্রব্যাদির আয়োজন করে মন্দিরে সাজিয়ে দেওয়া হয়, তার প্রতিটির উপর তুলসীমঞ্জরী দিয়ে পূজক ভোগ নিবেদন করেন, আর বাইরে নাটমন্দিরে ভক্তগণ খোল-করতাল নিয়ে কীর্তন গাইতে থাকেন। এ কীর্তনের দুটি প্রকরণ—মহাপ্রভুর ভোগারতি, রাধাগোবিন্দের ভোগ-আরতি। মহাপ্রভুর ভোগ-আরতির আবার প্রকারভেদ আছে; যেমন—শান্তিপুরের ভোগ এবং নবদ্বীপের ভোগ। শান্তিপুরের ভোগ-আরতির পদে অদ্বৈতের পত্রপ্রেরণ নিমন্ত্রণাদি থেকে শুরু করে সমস্ত বর্ণনা থাকে। বিভিন্ন মন্দিরে এসব বিভিন্ন প্রকরণগুলি গাওয়া হয়। মহাপ্রভুর ভোগের শুরুর পদটি হ'ল:

"ভজ পতিত উদ্ধারণ শ্রীগৌরহরি।
শ্রীগৌরহরি নবদ্বীপ বিহারী
দীন দয়াময় হিতকারী॥
এস এস মহাপ্রভু করি নিবেদন।
ভোগমন্দিরে প্রভু করহ পয়ান॥
বসিতে আসন দিল রতন আসন।
তার মাঝে বসিলেন শচীর নন্দন॥
বামেতে অদ্বৈতচন্দ্র দক্ষিণে নিতাই।
মধ্য আসনে বৈসেন চৈতন্য গোসাই॥"

রাধাগোবিন্দের ভোগ-আরতির পদে শুরু করা হয়—

"ভজ গোবিন্দ মাধব গিরিধারী।
ও গিরিধারী গোবর্ধন বিহারী
কেলি কলারস গোপীমন চারী॥
কুঞ্জে মধু পান করি বংশী চুরি করি।

তীরে হোরী খেলা খেলি জলে জলকেলি ॥
কৃষ্ণ কণ্ঠ ধরি রাই করয়ে বিহার।
তীরে থাকি সখীগণ কহে ভাল ভাল ॥
আর্দ্র বস্ত্র ছাড়ি শুষ্ক বস্ত্র পরিধান।
ভোগ মন্দিরে দুঁহু করল পয়ান ॥"

এইভাবে প্রাথমিক সূচনায় কিছুটা তারতম্য থাকলেও, পরবর্তী পদগুলি সবই একই রকম এবং বিভিন্ন ভোগ্যদ্রব্যের নামোল্লেখে রচিত। যেমন—

"শাক শুকতা আদি বিবিধ ব্যঞ্জন।
আনন্দে ভোজন করেন শ্রীশচীনন্দন ॥ (যশোদানন্দন) ॥
অমৃত রসাল রম্ভা আরও লুচি পুরি।
আনন্দে ভোজন করেন নদীয়া বিহারী ॥ (বরজবিহারী) ॥
মিষ্টান্ন পুষ্পান্ন আরও সরভাজা।
আনন্দে ভোজন করেন নদীয়ার রাজা ॥ (গোকুলের রাজা) ॥"

"যশোদানন্দন', 'বরজবিহারী', 'গোকুলের রাজা' ইত্যাদি অংশ রাধাকৃষ্ণের ভোগারতি ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ভোগ-নিবেদন-পর্ব চলতে থাকার সময় ভক্তগণ উদ্দণ্ডভাবে অনেকক্ষণ ধরে বার বার জমাট দিয়ে গাইতে থাকেন : ১। মহাপ্রভুর ভোগারতির ক্ষেত্রে—"আরতি করে নরহরি, গৌর বদন হেরি হেরি।" ২। রাধা-গোবিন্দের আরতির ক্ষেত্রে—"আরতি করে রূপমঞ্জরী, যুগলবদন হেরি।" ভোগ-নিবেদনের পর আচমন দেওয়া হবে—সেই সময় থেকে পদের দ্বিতীয়াংশ একই সুরে গাইতে হয়। অংশটি হ'ল :

"জলপান করি প্রভু (দোহে) কৈলেন আচমন।
সুবর্ণ খড়িকায় কৈলেন দন্ত ধাবন ॥
আচমন সারি প্রভু (দোহে) বসলেন সিংহাসনে।
প্রিয়ভক্ত (সখী)গণে করায় তাম্বুল সেবনে ॥
তাম্বুল সেবার পর নিভৃতে শয়ান।
নরহরি দাসে (রূপমঞ্জরী) করে চামর বীজন ॥
ফুলের কেওয়ারী ঘর ফুলের চৌয়ারী।
ফুলের রত্ন সিংহাসন চাঁদোয়া মশারী ॥
ফুলের বিছানা আরও ফুলের বালিশ।
তাহার মাঝে মহাপ্রভু (দুহুজনে) করিছেন আলিশ।"

গানটি গাইবার একটি বৈশিষ্ট্য হ'ল—প্রতি ক্ষেত্রে দ্বিতীয় চরণটি সঞ্চারীর মত এবং পদটি শেষ হলে—'হরে হরে' এই কথাটি যুক্ত করা হয়। ভোগারতি শেষ করে 'হরি হরয়ে নম' ইত্যাদি পদটি গেয়ে প্রেমধ্বনি দিতে হয়,—তৎক্ষণে আরতি শেষ হয়ে যায়—সকলে প্রণাম করে, শঙ্খ-হাতে পূজক শান্তিজল ছিটিয়ে

দেন। এর পরেই আয়োজন হয় প্রসাদগ্রহণের। এটি হ'ল মধ্যাহ্নকালীন নিত্য-ক্রিয়া এবং এই গানটির সংগে সগে ভক্তদের মনের আবেগ-জড়ানো কিছু কিছু আখর দিয়ে গানটিকে ভাবময় করে তোলা হয়। যেমন—

"খাওহে কাংগালের ঠাকুর", "(আমার) কিবা আছে
আর কিবা দিব", "আমি অতি কাংগাল জনা",
"তুমি কাংগাল বড় ভালবাস", "চেয়ে খাও হে
খুদ কুঁড়া", "এইত তোমার করুণা লীলা",
"দয়া করে খাও হে", "শুখা রুখা এক মুঠা",
"যা জুটিয়েছ তাই দিয়েছি", "বড় আশা
লয়ে বসে আছি", "তোমার ভোজনলীলা দেখব
বলে", "কৃপা করে দেখাও একবার" —ইত্যাদি

অসংখ্য আখর অতি সহজ সুরে যেন সকলেই একসংগে গাইতে পারে এমন করে গাওয়া হয়। পদগুলির ভনিতা খুব নির্দিষ্ট নয়। বেশীর-ভাগ ক্ষেত্রেই 'সনাতনদাস', কোথাও 'নরোত্তমদাস', আবার কেউ কেউ শ্যামানন্দপ্রভুর ভনিতা ব্যবহার করে থাকেন। নবদ্বীপের প্রায় সব ঠাকুরবাড়ীতেই এই ভোগ-আরতি হয়ে থাকে।

তাছাড়া শান্তিপুরের অদ্বৈতাচার্যের গৃহে ভোগ-আরতি-সংকল্পে নিম্ন-পদটি গাওয়া হয়ে থাকে :

"ভজ পতিত উদ্ধারণ শ্রীগৌরহরি।
শ্রীগৌরহরি নবদ্বীপ-বিহারী,
দীন দয়াময় হিতকারী॥
এস এস মহাপ্রভু করি নিবেদন।
কৃপা করি মোর গৃহে কর আগমন॥
প্রভু ল'য়ে সীতানাথ করিলেন গমন।
আনন্দেতে হুলু দেয় যত নারীগণ॥
অদ্বৈতগৃহিণী আর যত পুরনারী।
হুলু হুলু ধ্বনি দেয় গোরামুখ হেরি॥
বসিতে আসন দিলা রত্নসিংহাসন।
সুশীতল জলে কৈলা পাদ প্রক্ষালন॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু কর অবধান।
ভোগমন্দিরে প্রভু করহ পয়ান॥
(বামেতে অদ্বৈতচন্দ্র দক্ষিণে নিতাই)।
বামে প্রিয় গদাধর দক্ষিণে নিতাই।
মধ্যাসনে বসিলেন চৈতন্য গোসাঞি॥

চৌষট্টি মহান্ত আর দ্বাদশ গোপাল।
ছয় চক্রবর্তী আর অষ্ট কবিরাজ॥
শাক শুকুতা ভাজি দিয়া সারি সারি।
ভোগের উপরে দিলা তুলসীমঞ্জরী॥
গঙ্গাজল তুলসী দিয়া কৈল নিবেদন।
আনন্দে ভোজন করেন শ্রীশচীনন্দন॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত ছানা নানা উপহার।
আনন্দে ভোজন করেন শচীর কুমার॥
মালপোয়া সরভাজা আর লুচিপুরী।
আনন্দে ভোজন করেন নদীয়া বিহারী॥
না জানিয়ে পরিপাটী না জানি রন্ধন।
শুকা রুখা এক মুষ্টি করহ ভোজন॥
নিতাই রঙ্গিয়া আমার খাইতে খাইতে।
ভাল বলি তুলি দেয় গৌর-মুখেতে॥
ভোজনের অবশেষ কহিতে না পারি।
সুবর্ণ ভৃঙ্গারে দিল সুবাসিত বারি॥
ভোজন সারিয়া প্রভু কৈল আচমন।
সুবর্ণ খড়িকায় কৈল দন্তশোধন॥
আচমন করিয়া প্রভু বৈসেন সিংহাসনে।
কর্পূর-তাম্বুল যোগায় প্রিয় ভক্তগণে॥
সময় জানিয়া নরহরি আরত্রিক লইয়া।
আরতি করায় গোরার বদন হেরিয়া॥
তাম্বুল খাইয়া প্রভুর পালঙ্কে শয়ন।
গোবিন্দদাস করে পাদ সম্বাহন॥
ফুলের চৌয়ারী ঘর ফুলের কেয়ারী।
ফুলের রত্ন সিংহাসনে চাঁদোয়া মশারী॥
ফুলের পাপড়ি প্রভুর উড়ে পড়ে গায়।
তার মধ্যে মহাপ্রভু সুখে নিদ্রা যায়॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর দাসের অনুদাস।
নরোত্তম দাস মাগে সেবা অভিলাষ।"

(গ) আরতির তৃতীয় পর্যায়টি হ'ল 'সন্ধ্যা-আরতি'। এটি প্রধানতঃ বৈষ্ণবীয় দেব-দেউলের কৃত্য। বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে থাকে—ঘণ্টা, কাঁসর, বেল, করতাল ও খোল। এগুলি সবই সমভাবে বাজতে থাকে, সেইসঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে গাওয়া হয় সন্ধ্যারতির গান। এক্ষেত্রে নানাবিধ সন্ধ্যারতির পদ আছে; যেমন—মহাপ্রভুর

আরতি, মদনগোপালের আরতি, তুলসীর আরতি, ইত্যাদি। গান অতি সহজ সুরে চঞ্চুপুট তালে গাওয়া হয়। সমবেত সকল ভক্তই অংশগ্রহণ করে থাকেন।

সন্ধ্যাবেলার সকলের পরিচিত এ গানটি হ'ল :

'ভালি গোরাচাঁদের আরতি বনি।
বাজে সংকীর্ত্তনে সুমধুর ধ্বনি ॥
শঙ্খ বাজে ঘণ্টা বাজে বাজে করতাল।
মধুর মৃদঙ্গ বাজে শুনিতে রসাল ॥
বিবিধ কুসুম ফুলে বনি বনমালা।
শত কোটি চন্দ্র জিনি বদন উজলা ॥
ব্রহ্মা আদি দেব যাঁকো করজোড় করে।
সহস্র বদনে ফণী শিরে ছত্র ধরে ॥
শিব শুক নারদ বেদ বিচারে ॥
নাহি পরাৎপর ভাব বিভোরে ॥
শ্রীনিবাস হরিদাস পঞ্চম গাওয়ে।
নরহরি গদাধর চামর ঢুলাওয়ে ॥
বীর বল্লভদাস শ্রীগৌরচরণে আশ।
জগভরি রহল মহিমা প্রকাশ ॥"

সমানভাবে গানটি গাওয়া হয়, আখরের প্রয়োগ নাই। প্রতিচরণান্তর অর্থাৎ এক, তিন, পাঁচ ইত্যাদি চরণ, আবার দুই, চার, ছয় ইত্যাদি চরণের সুর একই রকম। এক, তিন, পাঁচ ইত্যাদি চরণের ক্ষেত্রে প্রথম শব্দটি দু'বার দু'রকম হয় ; প্রথমবার যে পর্দায় শুরু হয়, দ্বিতীয়বার তার চেয়ে চড়া পর্দার শুরু, নচেৎ সবই এক-রকম। এটি হ'ল মহাপ্রভুর আরতি। সুরটিতে কিছুটা কেদার রাগের আভাস পাওয়া যায়।

১।	—	ভালি	|	—	গোরা	|	চা	—	|	দে	র
	প	র্সা	|	র্সা	নিধপ	|	পম	ম	|	পম	পধ
	—	আ	|	র	তি	|	ব	অ	|	অ	নি
	ধ	পম	|	প	ধ-	|	ম	গ	|	ম	রে
I [	—	বা	|	জে	সং	|	কী	ইর	|	ত	নে
	রে	ম	|	গ	রে	|	সানি	সা	|	রে	সা

—	মধু	—	রস	ধ্ব	—	নি	—]
সা-	রেম	ম	গরে-	রেপ	প	মপ	ধপ]

২।

শং	খ	অ	অঅ	অ	অ	অ	অ
সা	রে	রে	রেরে	রে	রেগ	রেসা	নিধ
অ	অ	অ	বাজে	ঘন্	টা	—	বাজে
পধ	নিসা	সা	নিধ	পা	পম	ম	পধ
—	বাজে	—	কর	তা	আ	আ	আল
প	মগ	গ	মপ	ধপ	মগ	রে	রে

[মধুর মৃদঙ্গ বাজে শুনিতে রসাল] এই অংশটি। [ ] অংশটির মত।

সান্ধ্য আরতিতে মদনগোপালের আরতির পদটি অনেকটা ব্রজবুলি প্রভাবিত; মনে হয় এ পদটি সুপ্রাচীন। পদটির অংশ হ'ল—

হরত সকল সন্তাপ জনমকিয়ে
মিটত সব জম কাল কি।
আরতি কিয়ে জয় জয় মদনগোপাল কি॥
মদনগোপাল জয় জয় যশোদা দুলাল কি,
যশোদাদুলাল জয় জয় গিরিধারী লালকি॥
গোঘৃত আরতি কর্পুর বাতি
হেরত বিধুমুখ ভাল কি॥ —ইত্যাদি

এ গানটিতেও কেদারের আভাস আছে কিন্তু সুরটি খুবই মিষ্টি, এবং এ গানটির সুরের সঙ্গে হিন্দুস্থানী ভজনের সুরের বেশ মিল আছে। সন্ধ্যা আরতির মধ্যে মা যশোদার আরতির একটি উল্লেখযোগ্য পদ্দ আছে। সাধারণতঃ উত্তর-গোষ্ঠের পর্যায়ের শেষে এ আরতির পদটি গাওয়া হয়। সারাদিন গোষ্ঠবিহারের পর সন্ধ্যাবেলা শ্রীকৃষ্ণ যখন সখা, ধেনু ও ধেনু-বৎস সহ ঘরে ফিরে আসেন তখন মা যশোদা তাঁকে আদর করে প্রথমে কোলে নিয়ে, পরে আসনে বসিয়ে আরতি করেন। বাৎসল্যভাবাশ্রয়ের এই আরতি পর্যায়টি অপূর্ব গাইতেন হরিদাস কর মহাশয়। গানটি লোফা তালে গাওয়া হলেও একটি গায়কী ভংগী আছে এবং আখরসংযুক্ত করে অত্যন্ত রসাল করা হয়ে থাকে। পদটির অংশ হ'ল—

"আরতি করু নন্দরাণী, বালক মুখ হেরি।
গায়ত নব নাগরীগণ, রাখাল সব ঘেরি রে॥

রম্ভাফল ঘৃত প্রদীপ, পুষ্পরচিত থারি।
সুন্দরীগণ উলত দেওয়ত, শিশুগণ করতালিরে॥
রাখি শিংগাবেণু যশোদামাই, কোরে নিল দোন ভাই।
মাখন সর ক্ষীর নবনী, খাওয়ে রামকানাই রে॥
সকল শিশুর চাঁদ মুখ ধরি, যশোমতী চুমু খায়।
মংগল পুছে নন্দঘোষ, জগদানন্দ গায়—॥"

আরতির পদ হ'লেও জগদানন্দের এই পদটি নিত্য গাওয়া হয় না,—তবে এটি খুবই জনপ্রিয় পদ।

সন্ধ্যা-আরতির মধ্যে তুলসীর আরতি অনেক ক্ষেত্রেই নিত্যকরণীয়, কার্তিক মাসের সান্ধ্যকৃত্য হিসাবেও এটি একান্ত আবশ্যকীয়। সাধারণতঃ যে পদটি চঞ্চুপুট তালে গাওয়া হয়, সেটি হ'ল—

নমো নমঃ তুলসী মহারাণী।
বৃন্দেজী মহারাণী নমো নমঃ।
নমো রে নমো রে মেইয়া, নমো নারায়ণী, নমো নমঃ॥
যাঁকো দরশে পরশে অঘ নাশই,
মহিমা বেদ পুরাণে বাখানি নমো নমঃ॥
যাঁকো পত্র, মঞ্জরী কোমল,
শ্রীপতি-চরণ-কমলে লপটানি নমো নমঃ॥
ধন্য তুলসী, পূরণ তপ কিয়ে,
শালগ্রামকী মহাপাটরাণী নমো নমঃ।
ধূপদীপ, নৈবেদ্য আরতি,
ফুলনা কিয়ে বরখা বরখানি নমো নমঃ॥
ছাপান্ন ভোগ, ছত্রিশ ব্যঞ্জন,
বিনা তুলসী প্রভু এক নাহি মানি নমো নমঃ।
শিব সনকাদি, আউর ব্রহ্মাদিক
ঢুড়ত ফিরত মহামুনী জ্ঞানী নমো নমঃ॥
চন্দ্রাসখী মেইয়া, তেরী যশ গাওয়ে,
ভকতি দান দিজিয়ে মহারাণী নমো নমঃ॥

সান্ধ্যকৃত্যাদির মধ্যে আরও একটি আবশ্যকীয় কীর্তন হ'ল 'শ্রীহরিবাসর কীর্তন'। এ গানটি কেবলমাত্র একাদশী তিথিতে, রাত্রিবেলা গাওয়া হয়। একাদশী বৈষ্ণবীয় তিথি হিসাবে খুবই পুণ্যতিথি, তাই ঐ তিথিতে ঐ গানটি অবশ্য করণীয়। হরিভক্তিবিলাস গ্রন্থের দ্বাদশ বিলাসে উল্লেখ আছে—

"নমো ভগবতে তস্মৈ যস্য প্রিয়তমা তিথিঃ।
একাদশী দ্বাদশী চ সর্ব্বতীর্থপ্রদানৃণাং॥"

এই একাদশী তিথির রাত্রিজাগরণ বিধেয় এবং সেই জাগরণে নৃত্যগীতাদি আবশ্যকীয়। তিথির পুণ্যতা হেতু এই নৃত্য, গীত, বাদ্যাদিজনিত ফল চতুরাশ্রমজনিত সব ফলের চেয়ে বেশী।

"যঃ পুনঃ কুরুতে গীতং সনৃত্যং বাদ্যসংযুতম্।
ন তৎ ক্রতুশতৈঃ পুণ্যং ব্রতদানশতৈরপি॥
যঃ পুনঃ কুরুতে গীতং বিলজ্জোনৃত্যতে যদি।
লভতে নিমেষার্দ্ধেন চতুরাশ্রমজং ফলম্॥"

তাই বৈষ্ণবকর্তব্যাচারে একাদশী একটি মহৎ তিথি হিসাবে অবশ্যপালনীয়। ঐ রাত্রির জন্য নির্দিষ্ট গানটি হ'ল—

শ্রী হরিবাসরে হরিকীর্তন বিধান।
নৃত্য আরম্ভিলা প্রভু জগতের প্রাণ॥
পুণ্যবন্ত শ্রীবাস অঙ্গনে শুভারম্ভ।
উঠিল কীর্তন ধ্বনি গোপাল গোবিন্দ॥
সবার অঙ্গেতে শোভে শ্রী চন্দন মালা।
সবাই গায়েন 'কৃষ্ণ' প্রেমে হ'য়ে ভোলা॥
মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজে শঙ্খ করতাল।
সংকীর্তন-সঙ্গে সব হইল মিশাল॥
ব্রহ্মাণ্ডে উঠিল ধ্বনি পূরিয়া আকাশ।
চৌদিকের অমঙ্গল সব যায় নাশ॥
চারিদিকে মঙ্গল শ্রীহরি-সংকীর্তন।
মাঝে নাচে জগন্নাথ মিশ্রের নন্দন॥
যাঁর নামানন্দে শিব বসন না জানে।
যাঁর রসে নাচে শিব সে নাচে আপনে॥
যাঁর নামে বাল্মীকি হইল তপোধন।
যাঁর নামে অজামিল পাইল মোচন॥
যাঁর নাম শ্রবণে সংসার-বন্ধ ঘুচে।
হেন প্রভু অবতরি কলিযুগে নাচে॥
যাঁর নাম লইয়া শুক নারদ বেড়ায়।
সহস্রবদনে প্রভু যাঁর গুণ গায়॥
সর্ব্ব মহাপ্রায়শ্চিত্ত যে প্রভুর নাম।
সে প্রভু নাচয়ে দেখে যত ভাগ্যবান্॥
নিজানন্দে নাচে মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
চরণের তালি শুনি অতি মনোহর॥

ভাবাবেশে মালা নাহি রহয়ে গলায় ।
ছিঁড়িয়া পড়য়ে গিয়া ভকতের গায় ॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দচাঁদ জান ।
বৃন্দাবন দাস তঁহু পদযুগে গান ॥

এ গানটিতে প্রতিটি চরণের পরেই 'ভাই হে' বলে একটি সাংগীতিক সংযোজনা থাকে। গানটি গাওয়া হয় 'ধামালি' তালে, আট মাত্রায়। ঐ তালটি প্রার্থনাত্মিকা পদের ক্ষেত্রে খুব বেশী ব্যবহৃত হয়ে থাকে। গানটিতে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে আখর সংযোজনা করা হয়।

অধিবাস কীর্তন

অধিবাস কীর্তন বা মংগল অধিবাস হ'ল আনুষ্ঠানিক কীর্তন। পরের দিন প্রাতঃকাল থেকে কীর্তন-মহোৎসবের শুরু হবে এমন সংকল্প করবার জন্যই এ অধিবাস কীর্তন করা হয়ে থাকে এবং এই অধিবাসবিধির প্রবর্তক স্বয়ং শ্রীচৈতন্যদেব। সংকল্পিত কীর্তন বলতে প্রহরব্যাপী সংকল্প। আট, ষোল, চব্বিশ ইত্যাদি বহুপ্রহরব্যাপী নামসংকীর্তন হ'তে পারে। আবার অষ্টকালীন লীলাকীর্তনও হ'তে পারে, অথবা পছন্দমত নানাপ্রকার কৃষ্ণলীলাগানও হ'তে পারে। এসব ক্ষেত্রেই অধিবাস গান করতে হয় আগের দিন সন্ধ্যাবেলা। সে-সময়ে বিগ্রহের পূজা অভিষেক হয়, নাটমন্দির বা প্যান্ডেলকে আমের পল্লব দিয়ে সাজাতে হয়, চৈতন্যোত্তরযুগে শ্রীচৈতন্যের প্রতিকৃতি বা মৃন্ময় বিগ্রহ বসানো হয়। চৈতন্যের সময়ে গীতা-ভাগবতাদি গ্রন্থ সাজিয়ে রাখা হ'ত। পূর্ণঘট স্থাপন করতে হয় এবং একটি প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখতে হয়। গায়ক, বাদক ও শ্রোতা বৈষ্ণবদের নিমন্ত্রণ করতে হয়। কীর্তন সম্প্রদায়গুলির জন্য বাসস্থান ঠিক করতে হয়; তাদের উপযুক্ত প্রসাদাদির আয়োজন করতে হয়। সন্ধ্যাবেলার আসরে মালা চন্দন দিয়ে গান শুরু হয়। কোথাও মাত্র একটি গান হয় আবার কোথাও পরপর পাঁচটি গান গাওয়া হয়। গান শেষ হ'লে খোল করতাল ইত্যাদি যন্ত্রগুলি আসরে রেখে যেতে হয়। পরদিন সূর্যোদয়ের প্রাক্‌মুহূর্তে গান শুরু করতে হয়। অধিবাসের গানগুলির মধ্যে প্রথম গানটি ঠাকুর নয়নানন্দের রচিত 'জয় রে জয় রে গোরা'। যেখানে একটি গানে অধিবাস হয় সেখানে শুধু এ গানটিই হয়ে থাকে। কীর্তনের মধ্যে এ গানটি বড় দশকুশী গান হিসাবে খুবই প্রসিদ্ধ। প্রথম চরণটি পাঁচ আবর্তের বড় দশকুশী। শ্রীবাস অঙ্গনে যখন এ গানটি হ'ত, জল আনবার সময় মেয়েরা যাবার পথে 'গো' বর্ণটি শুনে গিয়ে, ফেরার পথে 'রা' বর্ণটি শুনতে পেত। খুবই বিলম্বিত লয়ের গান। কেউ কেউ বলেন এটি ময়নাডালের বড় দশকুশী। তা যাই হোক গড়াণহাটি গান সম্পর্কে বর্তমানে সকলের যে ধারণা তা দিয়ে বিচার করলে, মনে হয় এ গানটি একটি প্রসিদ্ধ বড় দশকুশী গড়াণহাটি

গান। গানটির আরও একটি প্রকরণ আছে, যা বিশেষভাবে শ্রীধাম বৃন্দাবনেই প্রচলিত। সেটি হ'ল 'মধ্যম দশকুশী' তালে, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একই তালে গাওয়া হয়। প্রতি চরণে একবার লঘু কাটান আর একবার গুরু কাটান, অর্থাৎ শুধু ঐ একটি গান গাইতেই আড়াই থেকে তিন ঘণ্টা সময় লাগে। পরবর্তী কালে শ্রদ্ধেয় রামদাস বাবাজী মহাশয় লোফা তালে হাল্কা করে গাইতেন, কিন্তু এত অপূর্ব আখর ব্যবহার করতেন যে আখরের মাধুর্য নিয়েই মূল গানটি ভরপুর হয়ে উঠত। মূলগানটি হ'ল --

"জয় রে জয় রে গোরা শ্রীশচীনন্দন
মঙ্গল নটন সুঠাম।
কীর্তন আনন্দে শ্রীবাস রামানন্দে
মুকুন্দ বাসু গুণ গান॥
দ্রাং দ্রাং দ্রিমি দ্রিমি মাদল বাজত
মধুর মঞ্জীর রসাল।
শঙ্খ করতাল ঘণ্টা রব ভেল
মিলল পদতলে তাল॥
কো দেই গোরা অঙ্গে সুগন্ধি চন্দন
কো দেই মালতিক মাল।
পিরীতি ফুলশরে মরম ভেদল
ভাবে সহচর ভোর॥
কোই কহত গোরা জানকীবল্লভ
এ রাধার প্রিয় পাঁচবাণ।
নয়নানন্দের মনে আন নাহিক জানে
গৌর আমার গদাধরের প্রাণ॥"

অধিবাস পর্যায়ের দ্বিতীয় গানটির রচয়িতা সম্পর্কে দু'রকমের ভনিতা পাওয়া যায়। একটি হ'ল পরমেশ্বরদাস, অপরটি বৃন্দাবনদাস। এ প্রসঙ্গে বেশীর ভাগ গানই যেহেতু বৃন্দাবনদাস বিরচিত সেহেতু মনে হয় এ গানটিও বৃন্দাবন-দাসেরই লেখা। অবশ্য একই বিষয়ের উপর একই ধরনের ভাষা দিয়ে একাধিক গান একই কবি রচনা করেছেন কিনা তা নিয়েও সন্দেহের অবকাশ আছে। তাই অনুরূপ রচনা পরমেশ্বরদাস করেন নাই একথাও বলা যায় না; তবে নানা গায়কের মুখে গানটি শুনে দেখেছি বেশীর ভাগই 'বৃন্দাবনদাস' ভনিতায় গেয়ে থাকেন। গানটি 'মায়ুর তেওট' অর্থাৎ 'তেওট' তালে গাওয়া হয়। গানটি সুন্দর বর্ণনামূলক। পদটি আবশ্যকীয় বলে সম্পূর্ণ পদটিই উল্লিখিত হ'ল :

"একদিন পঁহু হাসি অদ্বৈতমন্দিরে আসি
বসিলেন শচীর কুমার।
নিত্যানন্দ করি সঙ্গে অদ্বৈত বসিলা রঙ্গে
মহোৎসবের করিলা বিচার॥
শুনিয়া আনন্দে ভাসি সীতাঠাকুরাণী আসি
কহিলেন মধুর বচন।
তা শুনি আনন্দমনে মহোৎসবের বিধানে
বলে কিছু শচীর নন্দন॥
শুন ঠাকুরাণী সীতা বৈষ্ণব আনিয়া হেথা
আমন্ত্রণ করিয়া যতনে।
যেবা গায় যে বাজায় আমন্ত্রণ করি তায়
পৃথক্ পৃথক্ জনে জনে॥
এত বলি গোরা রায় আজ্ঞা দিল সবাকায়
বৈষ্ণব করহ আমন্ত্রণ।
খোল করতাল লৈয়া অগুরু চন্দন দিয়া
পূর্ণঘট করহ স্থাপন॥
আরোপণ করি কলা তাহে বাঁধি ফুলমালা
কীর্তন মণ্ডলী কুতূহলে।
মাল্য চন্দনগুয়া ঘৃতমধু দধি দিয়া
খোল মঙ্গল সন্ধ্যাকালে॥
শুনিয়া প্রভুর কথা প্রীতে বিধি কৈল যথা
নানা উপহার গন্ধবাসে।
সবে হরি হরি বলে খোল মঙ্গল করে
পরমেশ্বর দাস রসে ভাসে॥"

এর পর তৃতীয় গানটি হ'ল আয়োজন পর্যায়ের। এ গানটিও বৃন্দাবনদাসের লেখা। এ গানটি 'একতালি' বলেই পাওয়া যায়। এটি হ'ল বৈষ্ণব-নিমন্ত্রণের পদ, এই পদেই সমস্ত গোস্বামী ও মহান্তদের আহ্বান করা হয়। এ গানটিকে অনেকে লীলাকীর্তনের অধিবাস বলে মনে করেন, আবার কেহ কেহ নামকীর্তনের অধিবাসে গাইলে 'লীলাগান' শব্দটির পরিবর্তে 'নামগান' শব্দটি ব্যবহার করেন। পদটি হ'ল—

"নানা দ্রব্য আয়োজন করি করে নিমন্ত্রণ
কৃপা করি কর আগমন।
তোমরা বৈষ্ণবগণ মোর এই নিবেদন
দৃষ্টি করি কর সমাপন॥

করি কত নিবেদন আনিল মহান্তগণ
কীর্তনের করে অধিবাস।
অনেক ভাগ্যের ফলে বৈষ্ণব আসিয়া মিলে
কালই হবে কীর্তন বিলাস॥
শ্রীকৃষ্ণের লীলাগান করিবেন আস্বাদন
পূরিবে সবার অভিলাষ।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যচন্দ্র সকল ভকতবৃন্দ
গুণ গায় বৃন্দাবনদাস॥"

চতুর্থ গানটিও বৃন্দাবনদাসের। এ গানটি সর্বত্র গাওয়া হয় না। এটিকেও লীলাগানের অধিবাস বলে অনেকে মনে করেন, কিন্তু নামকীর্তন ক্ষেত্রেও গানটির প্রয়োগ আছে; সেক্ষেত্রেও 'লীলাগান' শব্দটির পরিবর্তে 'নামগান' শব্দটি প্রয়োগ করতে হয়। এ গানটি 'মধ্যম দশকুশী' তালে গাওয়া হয়, 'চূড়াটি বাঁধিয়া'র জোড়া গান বলেই জানা যায়। গানটি হ'ল—

"আগে রম্ভা আরোপণ পূর্ণঘট সংস্থাপন
আম্রপল্লব সারি সারি।
দ্বিজ বেদধ্বনি করে নারীগণ জয় করে
আর সবে বলে হরি হরি॥
দধি ঘৃত মঙ্গল করি সবে উতরোল
করয়ে আনন্দ পরকাশ।
আনিয়া বৈষ্ণবগণ দিয়া মালা চন্দন
কীর্তন মঙ্গল অধিবাস॥
সবার আনন্দমন বৈষ্ণবের আগমন
কালই হবে চৈতন্য কীর্তন।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য চন্দ্র বলরাম নিত্যানন্দ
গুণ গায় দাস বৃন্দাবন॥"

অধিবাস পর্যায়ের সর্বশেষ গানটি বংশীবদনের লেখা। এটি 'বিভাস তেওট' অর্থাৎ তেওট তালে গাওয়া হয়। এটি হ'ল নবদ্বীপ পর্যায়ের অধিবাস। এ পদটিতেও সুস্পষ্ট দেখা যায় যে শ্রীচৈতন্যদেবের উদ্দীপনায়ই অধিবাস কীর্তন শুরু হ'ল। পদটি হ'ল—

"জয় জয় নবদ্বীপ মাঝ।
গৌরাঙ্গ আদেশ পাইয়া ঠাকুর অদ্বৈত যাইয়া
করে খোল মঙ্গলের সাজ॥
আনিয়া বৈষ্ণব সব হরিবোল কলরব
মহোৎসবের করে অধিবাস।

আপনি নিতাই ধন দেয় মালা চন্দন
করে প্রিয় বৈষ্ণব সম্ভাষ ॥
গোবিন্দ মৃদঙ্গ লৈয়া বাজায় তাতা থৈয়া থৈয়া
করতালে অদ্বৈত চপল।
হরিদাস করে গান শ্রীবাস ধরয়ে তান
নাচে গোরা কীর্তন মঙ্গল ॥
চৌদিকে বৈষ্ণবগণ হরি বলে ঘন ঘন
কালই হবে কীর্তন মহোৎসব।
আজু খোল মঙ্গলি রাখয়ে আনন্দ করি
বংশী কহে দেহ জয় রব ॥"

এ গানটির পরেই কিছু সময় নামগান করে গান-বাজনা স্তব্ধ হয়ে যায়। খোল করতাল রেখে দেওয়া হয় পরের দিনের মঙ্গল-আরতির সময় পর্যন্ত। এ হ'ল অধিবাস পর্যায়।

পরবগান

'পরবগান' বলা হয় 'পর্বগান'কে, অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণ লীলাবিষয়ক বৈষ্ণবদের কতকগুলি বিশেষ পর্ব আছে। এই বিশেষ পর্বগুলির জন্য ঐ সমস্ত দিনে এ গানগুলি গাওয়া হয় বলেই এগুলিকে 'পরবগান' বলা হয়। এ পর্বগুলি হ'ল —'হোরি', 'ঝুলন', 'রাস', 'ফুলদোল', 'বাসন্তী রাস' ইত্যাদি। এগুলির মধ্যে 'হোরি', 'ঝুলন' এবং 'রাস' বৃন্দাবনে বিশেষভাবে প্রচলিত ; তা ছাড়া কোন কোন ঠাকুরবাড়িতে এখনও নিয়মিত পর্ব উপলক্ষে গানগুলি গাওয়া হয়। যেহেতু এ গানগুলি অন্যান্য গানের মত বৎসরের সবসময় গাওয়া হয় না, সেজন্য এগুলি প্রায় অপ্রচলিত পর্যায়ে গণ্য হ'তে চলেছে। প্রতিটি পর্যায়ই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবং বিশেষ লীলা হিসাবে পরিচিত, তাই গানগুলির পর্যায়কেও 'লীলা' বলে চিহ্নিত করা হয় ; যেমন—'হোরিলীলা', 'ঝুলনলীলা', 'রাসলীলা', ইত্যাদি।

'হোরিলীলা' ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথির লীলা এবং বসন্তের বিশেষ লীলা। বৃন্দাবনে প্রাচীন পদ্ধতি অনুসারে মহাসমারোহে এ লীলাটি স্মরণ করা হয়। এটিই হ'ল দোল। এসময়ে মুক্ত প্রান্তরে মঞ্চ স্থাপন করা হয়, শ্রীবিগ্রহের মঞ্চারোহণ হয় ; সকলেই ঠাকুরকে আবীর, রং ইত্যাদি দিয়ে থাকে। এ তিথির অপর আকর্ষণ হ'ল—এই তিথিকে আশ্রয় করেই শ্রীচৈতন্যদেব জগতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাই এ তিথিতে যেমন রাধাকৃষ্ণের 'হোরিলীলা' গাওয়া হয় তেমনি শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাবের বিশেষ কীর্তনটিও স্থানে স্থানে গাওয়া হয়। সংগীতবিষয়ে এ হোরিলীলাটি বিভিন্নক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। ধ্রুপদে হোরিগান গাওয়া হয় 'হোরি তালে' অর্থাৎ 'ধামার তালে'। গানের সৌষ্ঠবও

যথেষ্ট রক্ষিত হয়। আঞ্চলিক পর্যায়েও লোকসংগীত হিসাবে এ গান বিহার এবং উত্তরপ্রদেশ অঞ্চলে খুবই প্রচলিত। গানগুলি বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই 'চাচরের' ছন্দে গাওয়া হয় সাত মাত্রায়, মাঝে মাঝে আট মাত্রার লংগী বাজিয়ে জমাট করা হয়। বাংলাদেশের লোকসংগীতেও 'হুলি' গান বলে এই হোরী গানেরই বিশেষ পর্যায় প্রচলিত আছে। তবে সর্বাপেক্ষা অধিক ব্যবহার হচ্ছে কীর্তন গানে। হোরিলীলার বিষয়বস্তুটি হ'ল—শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণ করে শ্রীমতী রাধারাণী সখীগণসহ অভিসার করলেন। এদিকে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সখা অর্থাৎ শ্রীদাম, দাম, বসুদাম, সুবল ইত্যাদিকে সংগে করে ফাগু আর রং নিয়ে প্রস্তুত। অনুরূপে ললিতা, বিশাখা, চিত্রা, চম্পকলতিকা, সুদেবী, রংগদেবী ইত্যাদি সখীবৃন্দকে নিয়ে ফাগু এবং রং পিচকারী নিয়ে চলেছেন—আজ রং খেলার যুদ্ধ হবে দুই দলের। যুদ্ধক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই কৃষ্ণচন্দ্র হারবেন এবং পালাতে চাইবেন, সখীরা বেষ্টন করে ধরবেন, পরে রসাস্বাদনাদির মাধ্যমে লীলাপ্রসংগ শেষ হবে। 'হোরি লীলা'য় বড় গান বিশেষ নাই, কিন্তু গান-গুলির কতগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমতঃ বিশেষ গানগুলি প্রায় সবই একই ধরনের সুরে অর্থাৎ বাংলা বসন্তের প্রভাবযুক্ত। দ্বিতীয়তঃ বেশীর ভাগ গানই 'দুঠুকী' অর্থাৎ সাত মাত্রার ৩।৪।৩।৪ ছন্দ প্রযুক্ত, তৃতীয়তঃ গানগুলি খুব উদ্দীপনাময় এবং একধরনের ছন্দ ব্যবহার করে মাতন তৈরী করা হয়, যাকে বলা হয় 'হোরি ঠমক', চতুর্থতঃ, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই গানগুলি বসে বসে গাওয়া হয়। এমনভাবে গানের পর গান যুক্ত করা হয় যেন লীলাটি শেষ পর্যন্ত নাটকীয় পর্যায়ে পর্যবসিত হয়ে যায়। আখরের মাধ্যমে সম্মোহন সৃষ্টি হয়। শোনা যায়, রাধিকা সরকার বৃন্দাবনে হোরি গান গাইতে আখর দিচ্ছিলেন—"ঐ যায়", "হারুয়া নাগর ঐ যায়", "যেতে যেতে আবার ফিরে চায়"। বাইরের দিকে আংগুল দেখিয়ে বার বার 'ঐ যায়' আখর সংযুক্ত করার সংগে শ্রোতারা সব উঠে ঐদিকে চললেন, চললেন গায়ক নিজেও।

'হোরি লীলার' অভিসার পর্যায়ের তেওট তালের সুন্দর পদটি রচনা করেছেন 'জগমোহন দাস'। শ্রীমতী রাধারাণী মুরলী, ডম্ফ ইত্যাদির শব্দ শুনতে পেয়েছেন—

"ঘন মুরলী ধ্বনি ডম্ফ শবদ শুনি
উমরই নাগরী চিত।
সখিগণ সংগে নামি ধনি নিকসল
গায়ত সুমধুর গীত॥"

অনুরাগভরে হেলে দুলে, নেচে নেচে, ব্রজের পথ আলো করে চলেছেন সখী-গণকে সংগে নিয়ে শ্রীমতী রাধা বিনোদিনী। অভিসারের পথে গান, বাজনা ও নৃত্য সমানভাবে চলেছে—

"ডম্ফ রবাব উপাঙ্গ বাজাওত
কোই সখি করে তাল।
সবে ভেল উনমত আবীর উড়াওত
কোই সখি বলে ভাল ভাল॥

এমনি করে নৃত্যগীতাদি সহ চলেছেন শ্যামপ্রেম-সায়রের মরালিনী, যেতে যেতে ব্রজবধূদের সঙ্গে করে উপস্থিত হলেন কালিন্দীর তীরে। উপস্থিত হতেই বটুসুবলাদি সখাগণকে সঙ্গে করে প্রতিপক্ষের নায়ক শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রও হাজির।

"হোরিক রঙ্গে সঙ্গে ব্রজবধূগণ
আওল কালিন্দীতীর।
বটুসুবল সঙ্গে খেলিতে খেলিতে রঙ্গে
আওল গোকুলবীর॥"

'এস এস' বলে প্রথমে শ্রীমতী রাধারাণীকে আহ্বান করলেন। শ্রীকৃষ্ণের এমন গরবিত ভাব যেন একটু পরেই শ্রীমতী রাধারাণীকে সদলবলে হেরে পালাতে হবে। তাই প্রথমে অল্প, পরে বেশী করে শুরু হল রং-খেলা।

"মদনমোহন হোরি দেয়ত রসগারি
দুই দলে ভেল একঠাম।
ছুটে পিচকারী গুলাল ভরি ভরি
নিরখি মুরছি কোটি কাম॥"

'হর্ষতরঙ্গে'র এ অপূর্ব লীলার বর্ণনা দিয়ে সনাতন গোস্বামী বলেছেন: আহা কি অপরূপ!—

"বিকিরতি যস্ত্রেরিতমঘবৈরিণি
রাধা কুঙ্কুম পঙ্কম্।
দয়িতাময়মপি সিঞ্চতি মৃগমদরস-
রাশি ভিরবিশঙ্কম্॥
ক্ষিপতি মিথো যুবমিথুনমিদং নব
মরুণতরং পটবাসম্।
জিতমিতি জিতমিতি মুহুরভিজল্পতি
কল্পয়দ তনুবিলাসম্॥"

প্রচণ্ড যুদ্ধ—কে হারে, কে জেতে! পদকর্তা অর্থাৎ গায়ক একপাশে দাঁড়িয়ে বলছেন, অর্থাৎ আখর দিচ্ছেন—"আমি কিন্তু জিতে গেলাম", "তোমরা যেই হার আর যেই জিত", "অমন রসের লীলা দেখতে পেলাম"। প্রচণ্ড যুদ্ধ। সকলেই আভিহারিণী বটে কিন্তু আলাভোলা নয়, বুদ্ধি তাঁদের কম নেই। তাই ঐ রসের নাগর যেন পালিয়ে না যান, তাই তাঁকে ঘিরে ধরে রং দিচ্ছেন সব সখিগণ। যূথ-যূথ হয়ে দাঁড়িয়েছেন, বোধ হয় দেখবেন, এবার কোন্ পথে পালায়। লীলার

বর্ণনা দিচ্ছেন বল্লভীদাস—

"সব সখি মেলি ঘেররি
কুঞ্জবনসে না নিকসে' কানাইয়া।"

গানের ঐ অংশটি ধুয়া, প্রতিবার চরণের শেষে সবে মিলে গায়, কেহ 'দুঠুকী তালে', আবার কেউ 'ধামালি তালে'। সখীরা সব দাড়িয়েছেন—

"যুথহি যুথ প্রবন্ধ হোয়ল সব
ললিতা বিশাখা আদি করি। (হেই হো)
সমুখা সমুখী দুহু ছুটে পিচুকারী মুহু
রংগ গুলাল ভরি ভরি॥ (হেই হো)"

আগে অছেন কৃষ্ণচন্দ্র, সংগে তাঁর বটুসুবল আর মধুমংগল। কিন্তু গোপিনীদের ঐ লাখে লাখে পিচকারীর সামনে তাঁরা দাঁড়াতে পারলেন না, তাই—

"মধুমংগল সহ সুবল পলাওয়ত
বল্লভী দাস জয় গায়॥"

সখাগণ সব একে একে পালাতে শুরু করলেন—তখন সখীগণ কৃষ্ণচন্দ্রকে উদ্দেশ করে বলতে শুরু করলেন—জ্ঞানদাসের ভাষা—

"(হেদে হো) ও শ্যাম নাগর হয়ে হারিলে হে॥"

এ অংশটি লোফা তালের ধুয়া। পরের চরণ "চপল চপল দিঠে সুধামুখী চায়"। তার পরের চরণটি "চুয়া চন্দন গোরী দেয় শ্যামগায়"॥ এটিতেই ধীরে ধীরে হোরির ঠমক শুরু হয়, আবার ধুয়ায় ফিরে আসে। এমনিভাবে সব কটি চরণ গাওয়া হয়। চরণগুলি হ'ল—

"ললিতা ললিত হাসি—প্রহেলিকা গায়।
আনন্দে বিশাখা সখি মৃদংগ বাজায়॥ (হো হো)
রংগভরে রংগদেবী শ্যামেরে শুধায়।
আবার খেলিবে ফাগু গোপীকা সভায়॥ (হো হো)
সুদেবী সজল আঁখি নাগরে বুঝায়।
জ্ঞানদাস গোবিন্দের চরণে লুটায়॥ (হো হো)"

সখীগণ বলছেন—"দুঃখ করোনা শ্যাম, না-হয় একবার হেরেছ হে, যাক্ গেছে যাক্ তোমার সখা, আমরা যাব তোমার দলে, এস দেখি আবার খেলি হে। ভাবছ বুঝি তুমি একা, কিন্তু তা ঠিক নয়, আমরা অনেক আছি তোমার সংগে, তাই বলি"—

"এস বঁধু, আরবার খেলি হে ফাগুয়া।
এবার হারিবে যদি ফাগুহারা নিরবধি
জগভরি গাব এই ধুয়া॥"

রাধারাণী বলছেন—"বটে, তোমার দলের বীর সখাগণ সবই পালিয়েছে, আমার

আছে ললিতার আর বিশাখার দুটি যূথ, এর থেকে বিশাখার যূথ তোমাকে দিলাম, তারা তোমার পক্ষে খেলবে, আর ললিতা খেলবে আমার পক্ষে। দেখা যাক্ কি ঘটে। বাজীতি দেখে মনে হয় তোমার সবই ফাঁকা—রং, ফাগুয়া কিছুই নাই, পিচ্‌কারীও ভাঙা। কি দিয়েই বা খেলবে! এস আমার রংই তুমি লও, পিচকারী যা লাগে লও—তবু এস আর-একবার খেলি, নচেৎ তোমাকে সবে 'হারুয়া নাগর' বলবে, আমি তা কেমন করে সইব।"

'যদি বল একা আমি বহু সঙ্গের সঙ্গী তুমি
সম্মুখে বিশাখা হউক তুয়া।
ললিতা আমার সখি আইস আবার খেলি দেখি
জানা যাবে কে কেমন খেলুয়া॥
যদি বল রঙ্গ নাই লেহ রঙ্গ যত চাই
নহে বোলাও আপন খেলুয়া।
পিচকারী নাহি থাকে দিব আমি লাখে লাখে
যত চাবে পাবে হে বঁধুয়া॥"

হোরি লীলার এসব প্রসিদ্ধ গান সুরায়িত হয়ে যখন গায়কের মধুর কণ্ঠ থেকে নির্গত হয় তখন অপূর্ব ব্রজমাধুরী প্রকট হয়ে উঠে। কালোচিত লীলা বলে ঋতুরাজ-সমাগমে রসরাজ গোবিন্দের আচরণ যেমন মূর্ত হয়, তেমন রাই রসবতীর ফাগুমাখা বদনচাঁদ প্রত্যক্ষে উদয় হয় শ্রোতার সমক্ষে। বসন্ত-মাখানো সুরের ভাঁতি, কুসুম-নাচা ঠমকি ছন্দ, ভক্ত হংসবৃন্দের প্রেমসুধাপানের আকৃতি আর গায়ক-বাদকের শৈল্পিক সংকলন বৃত্তি সব মিলে হোরিলীলার যে চমৎকারিতা সৃষ্টি হয়, তা থেকে উপলব্ধি হয় বাংলার সঙ্গীত চিরন্তন এবং অবিনশ্বর।

২। 'ঝুলন লীলা' হ'ল বর্ষাকালোচিত লীলা। শ্রাবণ মাসের শুক্লা একাদশী থেকে পূর্ণিমা পর্যন্ত এ লীলা স্মরণ করা হয়ে থাকে। এ সময়ে প্রতিটি ঠাকুরবাড়িতে অতি সুন্দর করে সাজিয়ে একটি দোলা বানানো হয়, যাকে বলা হয় হিন্দোলা, তারই উপরে রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহকে বসিয়ে ঝুলানো হয়। এটিই হ'ল ঝুলন লীলা বা হিন্দোল লীলা। এ লীলাপ্রসঙ্গটি শুরু হয় রাধারাণীর অভিসার দিয়ে।

"ঝুলা ছলে ধনী চলে বিনোদিনী
ললিতাদি সখি সঙ্গে।"—ইত্যাদি

এটি একটি দুঠুকী গান। অবশ্য এ গানের আগে থাকে গৌরচন্দ্রিকা। ঝুলনের প্রসিদ্ধ গৌরচন্দ্রিকা গড়াণহাটি তেওট তালের—'চর চর কাঞ্চন নিন্দি কলেবর' ইত্যাদি। এর পর অভিসার করে মিলন। এ প্রসঙ্গে অপূর্ব বর্ষার বর্ণনা, বিশেষত আরও একটি গড়াণহাটি তেওট 'নওল নওলি নব রঙ্গমে। দুহু ঝুলত

প্রেম তরঙ্গমে ॥"

এ গানটির পরবর্তী অংশ তেওড়া তালে গাওয়া হয়। যেমন—

"বদত ময়ূর চাতক চকোর
কীর কোকিল অনগনি।
রটতা দরদা তোয়ে দাদুরী
বুন্দ সুন্দর নৌনি নৌনি ॥"

'বুন্দ সুন্দর' অর্থে ঝিরঝির বৃষ্টি মকরন্দ বিন্দুর মত ঝুলন-আয়োজিত হর্ষ-বর্ষদ বনকে শোভা করেছে। গোবিন্দলীলামৃত গ্রন্থে এ প্রসঙ্গটি বিন্যাসে অপূর্ব বৃত্তান্ত পাওয়া যায়। বর্ষার উপকরণ মেঘ, উজ্জ্বল শুভ্রবর্ণ বলে অভিমানীর মত আকাশে ওঠে, কিন্তু ঘুরতে ঘুরতে যখন বৃন্দাবনের উপরে আসে তখন সে শ্যামবর্ণ শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ দেখতে পায় এবং সেই রূপের উজ্জ্বলতা দর্শন করে স্বকীয় রূপের বৃথা অভিমান ত্যাগ করে কৃষ্ণরূপচিন্তায় বিভাবিত হয়ে ক্রমশঃ শ্যামবর্ণ ধারণ করে এবং স্থান ত্যাগ করে পলায়ন করতে চায়, কিন্তু "যাবো বা কু ব্যোম সর্বং নিরুন্ধং"—অর্থাৎ আকাশ গোলাকার বলে আবার ঘুরে একই স্থানে ফিরে আসে। তখন শ্রীকৃষ্ণচরণপ্রাপ্তির তীব্র লালসায়—"সদ্য পাণ্ডুরভূয়াৎ বিক্রন্দিতুসৌ" অর্থাৎ অনন্তর পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করে কাঁদতে শুরু করে। আর সেই অশ্রুই বৃষ্টিরূপে পতিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের চরণ স্পর্শ করে। তা ছাড়া হিন্দোলা রচনার বিষয়ে যোগমায়ার অপূর্ব নিপুণতা। বনের মধ্যে অনেক কদম্ব গাছ আছে। তার মধ্যে যেই যেই দু'টি বৃক্ষের শাখা সংশ্লিষ্ট ভঙ্গীতে বঙ্গীয় চালাঘরের মত হয়ে থাকে সেই সেই শাখার নীচে বেদী নির্মিত হয়—তারই নাম 'মণিকুট্টিম'। এ কুট্টিমের উপরেই রচিত হয় 'রতন হিন্দোল'। হিন্দোলের উপর পুষ্পশয্যা রচিত হয় কেবলমাত্র পরাগ দিয়ে। বৃন্তভাগকে পরিত্যাগ করা হয়, কারণ শক্ত বৃন্ত রাধাগোবিন্দের কোমল অঙ্গে ব্যথার কারণ হ'তে পারে। যে-কোন একটি দোলাকে নির্দিষ্ট করে রাধাগোবিন্দ বসেন আর সখীগণ সেটি দোলাতে থাকেন। আবার কখনও শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং পদযুগলের সাহায্যে দোলনাটি জোরে দোলাতে থাকেন।

রাধারাণী ভীত হয়ে পড়েন—

"ঝুলনা ধমকে চমকে রাই, বিহসি মাধব ধরই তাই,
আনন্দে অবশ পরশ পাই, চাপি ধরই কোলরি।"
—ইত্যাদি

তখন শ্রীকৃষ্ণকে অনুরোধ করেন—"শ্যাম নাগর অতি বেগে ঝুলাইওনা"—এটি আড় তালের একটি প্রসিদ্ধ গান। এ প্রসঙ্গে "বৃষভানুকুমারী নন্দকুমার"—দুঠুকী গানটি অতিপ্রসিদ্ধ। এটি একটি দাগী গান। এটির জোড়া কোন দুঠুকী গান পাওয়া যায় না। ঝুলনলীলা প্রসঙ্গেই প্রেমবৈচিত্ত্যের অপূর্ব ভাবটি

প্রকাশিত হয়। রাধাগোবিন্দ মুখোমুখী হয়ে ঝুলনে বসেছেন, উভয়ে উভয়ের দিকে তাকিয়ে আছেন। দোলনা যখন সম্মুখপানে গতিশীল, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের দেহ যখন নিচের দিকে থাকে তখন মুকুররূপ শ্রীকৃষ্ণ অঙ্গে রাধা অঙ্গের প্রতিফলন দেখতে পেয়ে শ্রীমতী ভাবেন—হায়! প্রাণবঁধু বুঝি নাই। আবার যখন পশ্চাদ্-দিকে গতিশীল তখন রাইতনু মুকুরে শ্রীকৃষ্ণরূপ প্রতিফলিত হয়, তাই তিনিও প্রেমময়ীকে নিমেষে হারান। কাছে থাকা সত্ত্বেও যখন উভয়ে উভয়ের অভাব বোধ করে থাকেন তখনই হয় প্রেমবৈচিত্ত এবং এই ভাবের সুন্দর প্রকাশ পাওয়া যায় হিন্দোল লীলা বা ঝুলনলীলায়।

৩। ভাদ্র মাসের কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে আবির্ভূত হন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র। ঐ দিনটিকে বলা হয় জন্মাষ্টমী। শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হয়েছিলেন মথুরায় কংসের কারাগারে দেবকীর জঠরে। অষ্টমগর্ভজাত এই সন্তান থেকে কংসের ভীতি ছিল বলেই দেবকীর প্রসূতিগৃহ হয়েছিল কারাগারে। চতুর্ভুজ নবজাত শিশুকে দেখে জলে স্থলে অন্তরীক্ষে—সর্বত্র স্তুতি শুরু হয়, সেই সঙ্গে সঙ্গে দেবকীও স্তুতি করেছিলেন। সন্তানের ঐশ্বর্য দেখে যে মাতা স্তুতি করেন তিনি গর্ভধারিণী হয়েও প্রকৃত জননীত্বের দাবী করতে পারেন না। কেবল গর্ভে ধারণ সূত্রেই যদি মাতৃত্বের অভিমান করা যায়, তবে যে স্ফটিকস্তম্ভ থেকে নৃসিংহদেব আবির্ভূত হয়েছিলেন সে-স্তম্ভটিও মাতৃত্বের দাবী করতে পারে। পরন্তু মাতা যশোদা শ্রীকৃষ্ণের মৃৎভক্ষণ লীলার পরে তাঁর মুখগহ্বরে অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তথা বিশ্বরূপ দর্শন করেছিলেন। তাতেও তিনি ঈশ্বর-জ্ঞান করেন নাই, বরং সাধারণ মায়ের মত তাঁকে ওঝা বৈদ্যের কাছে নিয়ে যাওয়ার কথা বলেছিলেন। সেজন্যই কৃষ্ণ-চন্দ্রকে বলা হয়—'নন্দাত্মজ' বা নন্দতনয়। যখন বাসুদেবের জন্ম হ'ল তখন দুরাচারী কংসকৃত সম্ভাব্য অমঙ্গলের কথা চিন্তা করে, নবজাত শিশুকে কোলে নিয়ে, বসুদেব চললেন বৃন্দাবনে নন্দালয়ের দিকে। বজ্রবিদ্যুৎসহ প্রচণ্ড বর্ষণ, অন্ধকারময় পিচ্ছিল পথ অতিক্রম করে যমুনার তীরে উপস্থিত। নাগ এসে ফণা বিস্তার করে শিশুকে রক্ষা করছে আর শিবা এসে যমুনা অতিক্রমণের পথ দেখিয়ে দিচ্ছে। অতিক্রম করতে গিয়ে অকস্মাৎ বসুদেবের হস্ত থেকে স্খলিত হয়ে শিশু নদীগর্ভে পতিত হ'ল। অসহায় বসুদেব ভগবানকে স্মরণ করে জলে হাত দিয়ে অনুসন্ধান করে আকস্মিক ফিরে পেলেন তাঁর সন্তানকে। ততক্ষণে সেই শিশু তাঁর চতুর্ভুজ সম্বরণ করে দ্বিভুজধারণ করেছেন। যথারীতি শিশুকে নিয়ে নন্দালয়ে গিয়ে, মা যশোদার সূতিকাগৃহে রাখলেন এবং সেখান থেকে এক নবজাতিকা নিয়ে ফিরে এলেন দেবকীর কাছে। ঐ শিশুই কংস-নিধনের ভবিষ্যদ্বাণী করে বলেছিলেন—

"তোমাকে বধিবে যে
গোকুলে বাড়িছে সে।"

এ হ'ল কৃষ্ণজন্মকথা এবং কৃষ্ণের গোকুল আগমন বৃত্তান্ত, কিন্তু এ লীলা-প্রসঙ্গে তেমন কোন গান নাই। তবে পরের দিনের প্রাতঃকালীন উৎসবকে বলা হয় 'নন্দোৎসব'। এ উপলক্ষে বিশেষ ধরনের পরব গান আছে, যেটিকে বলা হয় 'নন্দোৎসব' লীলা।

নন্দোৎসব লীলার গৌরচন্দ্রিকাটি অভিনব। কারণ, সমস্ত গৌরচন্দ্রিকাতেই শ্রীচৈতন্যদেবের হয় রাধাভাব, নয় শ্রীকৃষ্ণের ভাব; কিন্তু এ গৌরচন্দ্রিকাটিতে শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং পিতা নন্দের ভাবে বিভাবিত।

"পুরব জনম দিবস দেখিয়া
আবেশে গৌর রায়।
নিজগণ লৈয়া হরষিত হইয়া
নন্দ মহোৎসব গায়॥"—ইত্যাদি

গানটি সম তালে গাওয়া হয়। এর পরেই শুরু হয় নন্দোৎসব। উৎসবের বৈশিষ্ট্য হ'ল এই যে, সকলে গোয়ালা বেশ ধারণ করে কাঁধে ভার, হাতে লগুড় ইত্যাদি নিয়ে নাচতে থাকেন। ভারে থাকে দই, জল, হলুদ, আমপল্লব ইত্যাদি। উৎসবান্তে ভার ভেঙে সকলে মাটিতে গড়াগড়ি করেন। এ প্রসঙ্গে সবই আনন্দোদ্দীপক গান। প্রসিদ্ধ গানও দু'-একটি আছে; যেমন—সনাতন গোস্বামীর রচিত তেওট তালের গান—

"পুত্রমুদারমসূত যশোদা।
সমজোনিবল্লভততিরতি মোদা॥"—ইত্যাদি

মধ্যম দশকোশী তালের প্রসিদ্ধ গান:

"নিশি অবশেষে জাগি বরজেশ্বরী
হেরই বালকমুখ চান্দে।
কতহু উল্লাস কহই না পারিয়ে
উথলই হিয়া নাহি বান্ধে॥"—ইত্যাদি

তাছাড়া নাচের গান আছে। যেমন:

"স্বর্গে দুন্দুভি বাজে নাচে দেবগণ।
হরি হরি হরিধ্বনি ভরিল ভুবন॥
ব্রহ্মা নাচে শিব নাচে আর নাচে ইন্দ্র।
গোকুলে গোয়ালা নাচে পাইয়া গোবিন্দ॥"

৪। পরবগানের মধ্যে সবচেয়ে বেশী প্রচলিত হ'ল 'রাসলীলা'। এর দু'টি প্রকরণের মধ্যে একটি হ'ল 'নিত্যরাস' বা 'মহারাস', অপরটি 'শারদীয় রাস' বা 'নর্তক রাস'। 'নিত্যরাস' সর্বকালীন—যে-কোন সময় গাওয়া চলে, কিন্তু 'শারদীয় রাস' গাইবার নির্দিষ্ট সময় হ'ল বৃন্দাবনের পুরশ্চরণ কাল অর্থাৎ দেবী ভগবতীর শুভ বিজয়ার পরদিন যে একাদশী, সেদিন থেকে শুরু করে

শারদীয়া পূর্ণিমা পর্যন্ত এ লীলাটির গায়নকাল। রাসলীলাই হ'ল গুহ্যতম লীলা, শৃঙ্গার ও সম্ভোগের পূর্ণতম বিলাস। অন্যদিকে কৃষ্ণলীলার বাঞ্ছা-কল্পতরুত্ব গুণের এবং ভগবানের সত্যসংকল্পতা গুণের নিদর্শন। পরম মাধুর্য-মণ্ডিত এ লীলার সূত্রে অপূর্ব ভাব ও রূপ বিকশিত হয়ে বহুবিধ অভিনব রসোপকরণ সৃষ্টি হয়েছিল। বৈষ্ণবীয় মতে এই রাসের সূত্রেই রসের বিকাশ, সঙ্গীতের উৎকর্ষ সৃষ্টি অর্থাৎ রাগ, রাগিণী, তাল ইত্যাদি সৃষ্টি, নৃত্যের নব নব প্রকরণের উদ্ভব ইত্যাদি হয়ে থাকে। আর সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হ'ল—এ লীলা-বিলাসের পরিণতি, রাই-কানু একাকৃতি হয়ে গৌরসুন্দরের আবির্ভাব। রাসলীলা আস্বাদনময়-লীলা—একদিকে রাধাকৃষ্ণের পারস্পরিক আস্বাদন, অন্যদিকে গোপীদের পৃথক পৃথক ভাবে গোবিন্দের সঙ্গলাভ এবং লীলাবিলাস। শ্রীমতী রাধারাণী পূর্ণশক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান—উভয়ের সম্পর্ক ভেদ হয়েও অভেদ। শ্রীমতী হ'লেন প্রেমময়ী, হ্লাদিনীস্বরূপা। এই হ্লাদিনী অর্থাৎ আনন্দশক্তির সারই হ'ল প্রেম এবং প্রেমের সারভাব, আবার এই ভাবের পরাকাষ্ঠাই হ'ল মহাভাব, যা কেবল শ্রীমতী রাধারাণীতেই বর্তমান। এই মহাভাব বিকশিত হয়েছিল রাসলীলা প্রসঙ্গে, আস্বাদনের চরম মুহূর্তে। একদিকে রাধারাণীর মহাভাবের প্রকাশ, অন্যদিকে সমস্ত সৌন্দর্য সংগৃহীত গোবিন্দের রসরাজ রূপের প্রকাশ। মহাভাব আস্বাদন করছেন রসরাজ রূপকে, আবার রূপও আস্বাদন করছেন মহাভাবকে। এই পারস্পরিক আস্বাদনের চরম মুহূর্তে রূপ ও ভাব মিশে একত্র ঘনীভূত হয়ে রাসবিলাসের পরিণতিস্বরূপ গৌরচন্দ্রের বিকাশ।

রাসলীলা প্রসঙ্গটি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে ২৯ থেকে ৩৩ অধ্যায় পর্যন্ত পাঁচটি অধ্যায়ে অপূর্বভাবে বর্ণিত হয়েছে এবং সেই আদর্শকে আশ্রয় করে পদরচয়িতা মহাজনগণ সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন এবং সেগুলির সাঙ্গীতিক বিন্যাস অপূর্ব রূপ ধারণ করেছে। রাসলীলা প্রসঙ্গে নানাবিধ গৌরচন্দ্রিকার গান আছে, তার মধ্যে দু'-একটি খুবই প্রসিদ্ধ ও জনপ্রিয়। যেমন—মধ্যম দশকোশী তালের গান "গোরা নাচে প্রেম বিনোদিয়া", আবার প্রসিদ্ধ বড় দশকোশী গান—"নাচত গৌর রাসরস অন্তর" ইত্যাদি। এর পরেই সূত্রাকারে লীলাপ্রসঙ্গটি উপস্থাপিত করা হয়। শ্রীকৃষ্ণ স্বপ্রকাশ তত্ত্ব, তাই অসংখ্য জৈব ও অজৈব উপকরণ সহ শ্রীধাম বৃন্দাবনই পূর্ণায়িত শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং। কলেবর-বৈষম্য বা উপকরণ পৃথকীকরণের কারণ হ'ল লীলারস আস্বাদন। অর্থাৎ গোপীও কৃষ্ণ, পশুপাখীও কৃষ্ণ, স্থাবরজঙ্গমও কৃষ্ণ, বৃক্ষলতাদি সকলেই কৃষ্ণ। তাই "যাহা যাহা নেত্র পড়ে, তাহা তাহা কৃষ্ণ স্ফুরে!" নব-কিশোর নটবর শ্রীকৃষ্ণও সেই পূর্ণায়িত শ্রীকৃষ্ণের রস আস্বাদনের একটি উপাদান মাত্র। একই দেহের বিভিন্ন তন্ত্রীর মধ্যে যেমন একটি পারস্পরিক

লীলাসংঘট্ট থাকে, বৃন্দাবনেও তেমনি একই দেহান্তর্গত বিভিন্ন অংগ-উপাঙ্গের পারস্পরিক ক্রিয়া সংকল্পই ভগবানের লীলারূপে প্রকাশিত হয়েছে। তাই সাধারণ মানবিক বা সামাজিক বিচারে এর মধ্যে যাঁরা অশ্লীলতা বা অশালীনতা আছে বলে মনে করেন তাঁরা তত্ত্বতঃ কৃষ্ণস্বরূপে আস্থাভাজন নন। এটি নরলীলা হলেও ভগবৎলীলা, এ লীলা মনুষ্যলোকের লীলার সংগে তুলনীয় নয়, অনুকরণীয় নয় এবং সম্ভাব্যও নয়। চৈতন্যচরিতামৃতে তাই বলা হয়েছে—

"অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম জিনি জম্বুনদ হেম
সে প্রেম নৃলোকে না হয়।
যদি হয় তার যোগ কভু না হয় বিয়োগ
বিয়োগ হইলে কভু না জীয়য়॥"

সমগ্র লীলার মূল আদর্শ যেই প্রেম, তার মধ্যে আত্মসুখের লেশমাত্র নাই। আপাতবিচারে মনে হতে পারে সখীদের সংকল্পে আত্মতুষ্টির প্রেরণা থাকতে পারে, কিন্তু প্রকৃতক্ষেত্রে তা নয়। এটি হ'ল কামগন্ধ-বিবর্জিত লীলা।

"আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥"

সকলেই সেবাভিলাষী—কেহ দাস্য-সেবাভিলাষী, কেহ বাৎসল্য-সেবাভিলাষী, কেহ সখ্য-সেবাভিলাষী, আবার কেহ মাধুর্য-সেবাভিলাষী। কৃষ্ণকে সখা বলে সম্বোধন করার মধ্যে যে অভিলাষ, তাকে 'বাপ রে গোপাল' বলার মধ্যেও সেই অভিলাষ, আর তাঁকে 'প্রাণবধূ' বলে সম্বোধন করার মধ্যেও একই অভিলাষ। সর্বত্রই সংকল্প হ'ল সর্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন এবং কৃষ্ণসেবা। এর অন্য কোন অর্থ বাদ করে জাগতিক চিন্তার সংগে জড়িত করলে বিষয়ের সমস্ত রসকে জলাঞ্জলি দেওয়া হয়। তাই রাসলীলা প্রকরণে নানাবিধ বিলাসভংগী চোখে পড়লেও, জানতে হবে এটি একটি তত্ত্বেরই বিকাশ, কেবলমাত্র সাধারণ খেলা নয়।

সূচক কীর্তন

বৈষ্ণব আচার্যবৃন্দের বা গুরুবর্গের তিরোধান তিথিকে উপলক্ষ করে বিরহ-উৎসব সম্পন্ন হয় এবং সে উৎসবে নির্দিষ্ট চরিতগীত নির্দিষ্ট তালে ও সুরে গেয়ে আচার্যকে স্মরণ করা হয়। এই গানকেই বলা হয় 'সূচক কীর্তন'। অনেকের জন্যই নির্দিষ্ট সূচক গান আছে। প্রধানতঃ শ্রীগুরুপূর্ণিমা অর্থাৎ আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা তিথিতে জগদ্গুরু শ্রীসনাতন গোস্বামীর সূচক গাওয়া হয়। সূচক গানের ক্ষেত্রেও প্রথমে গৌরচন্দ্রিকা করে নিতে হয়। এ গৌরচন্দ্রিকার নির্দিষ্ট গানটি হ'ল বড় দশকোশী তালের—

"প্রেম সিন্ধু গোরা রায় নিতাই তরংগ তায়
করুণা বাতাস চারি পাশে।
ভক্ত হংস চক্রবাকে পিবি পিবি বলি ডাকে
তাপতৃষ্ণা সবাকার নাশে॥" —ইত্যাদি

এই গৌরচন্দ্রিকার পর নির্ধারিত সূচক কীর্তন শুরু হয়। সনাতনপ্রভুর সূচক, নরোত্তমদাসের সূচক, শ্রীনিবাস আচার্যের সূচক, দাসগোস্বামীর সূচক ইত্যাদি নানাবিধ সূচক গান আছে। সনাতন গোস্বামীর সূচকের একটি অপ্রকাশিত পদ—রচয়িতা শ্রীলশ্রী গৌর গোবিন্দ ভাগবতস্বামী। পদটি নিম্নরূপ :

"জয় রে শ্রীসনাতন প্রেমভক্তি বিভূষণ
জগতগুরু রূপে অবতার।
শ্রীরূপ অগ্রজবর মো অধমে দয়া কর
দেহ গোরা পদে ভক্তি সার॥
গৌর প্রেমে গরগর সদা আঁখি ঝর ঝর
গোরা গুণে সদা মাতোয়ার।
শ্রীভাগবতসার জগতে কৈল পরচার
দীনজনে করুণা অপার।
গৌরপ্রেম সংকীর্তন রসে সদা মগন
প্রেমরস বরিখে অনিবার॥
শ্রীযমুনা পুলিনে রাধাকৃষ্ণ গুণগানে
কান্দিয়া ব্যাকুল অতিশয়।
মদনগোপাল পদ হৃদি সদা সম্পদ
গৌরগোবিন্দ গুণ গায়॥"

শ্রীনিবাস-আচার্য প্রভু যাঁর বাড়ি ছিল বর্ধমান জেলার জাজীগ্রামে। তাঁর তিরোভাব উৎসবে গাইবার সূচক—

"এ মোর জীবন প্রাণ পরম করুণাবান্
আচার্যঠাকুর শ্রীনিবাস।
জিনিয়া কাঞ্চন দেহ জগতে বিদিত যেহ
শ্রীচৈতন্য প্রেমের প্রকাশ॥
চৈতন্যের প্রিয় যত করে স্নেহ অবিরত
কহিতে কি জানি গুণগণ।
অল্প বয়স হৈতে বিদ্যায় নিপুণচিতে
চিন্তে সদা চৈতন্যচরণ॥
একদিন রাত্রিশেষে শ্রীচৈতন্য স্নেহাবেশে
নিতাই চাঁদেরে সংগে লৈয়া।

শ্রীনিবাস পাশে আসি স্বপ্নচ্ছলে হাসি হাসি।
কহে শ্রীনিবাস মুখ চাঞা॥
'যাবে শীঘ্র বৃন্দাবন, তথা রূপ-সনাতন,
রচিল বিচিত্র গ্রন্থগণ,
বিতরিব তোমা দ্বারে এত কহি বারে বারে
নিত্যসংগে কৈল সমর্পণ॥'
হেনকালে স্বপ্নভংগ ধরিতে নারয়ে অংগ
শ্রীনিবাস ব্যকুল হইলা।
নীলাচল, গৌড় দেশে, ভ্রমিয়া সে প্রেমাবেশে
বৃন্দাবনে গমন করিলা॥
কত অভিলাষ মনে, উল্লাসে অল্প দিনে
মথুরা নগরে প্রবেশিল।
শ্রীরূপ সনাতন এ দোঁহার অদর্শন
শুনি তথা মূর্ছিত হইল॥
কান্দয়ে চেতন পাঞা কহে ভূমে লোটাইয়া
'হা হা প্রভু রূপ সনাতন।
কি লাগি বঞ্চিত কৈলা না বুঝি এসব খেলা
কি লাগিয়া রাখিলা জীবন॥'
ঐছে খেদযুক্ত মন জানি রূপ সনাতন
স্বপ্নচ্ছলে আসি প্রেমাবেশে।
শ্রীনিবাসে কোলে লৈয়া নেত্রবারি নিবারিয়া
কহে অতি সুমধুর ভাষে॥
'শীঘ্র গিয়া বৃন্দাবন কর আত্মসমর্পণ
শ্রীগোপাল ভট্টের চরণে।
না ভাবিবে কোন দুঃখ পাইবে পরম সুখ
ঐছে দেখা দিব দুই জনে॥'
এত কহি অদর্শন হৈল রূপ সনাতন
শ্রীনিবাস প্রভাতে উঠিয়া।
প্রবেশয়ে বৃন্দাবনে প্রেমধারা দুনয়নে
বৃন্দাবন শোভা নিরখিয়া॥
শ্রীজীব শ্রীশ্রীনিবাসে পাইয়া আনন্দাবেশে
গোস্বামীগণেরে মিলাইলা।
শ্রীরূপের স্বপ্নাদেশে অতিস্নেহে শ্রীনিবাসে
শ্রীগোপাল ভট্ট শিষ্য কৈলা॥

শ্রীজীব গোস্বামীর যত স্নেহ কি কহিবে কত
করাইলা শাস্ত্র বিচক্ষণ।
শ্রীবাস আনন্দমনে প্রিয়নরোত্তম সনে
কিছু দিনে হইল মিলন॥
নরোত্তমে লৈয়া সঙ্গে ব্রজেন্দ্র মিলেন রঙ্গে
গোবিন্দের আজ্ঞা মালা পাঞা।
গোস্বামীর গ্রন্থগণ করিলেন বিতরণ
শ্রীগৌড়মণ্ডলে স্থির হঞা।
গৌরপ্রেম সুধাপানে সদামত্ত সঙ্কীর্তনে
জগতে ঘোষয়ে যশ যার।
কহে নরহরি দীনে উদ্ধারে আপনাগুণে
এমন দয়ালু নাহি আর॥"

এরপর অন্যান্য পদ, যেমন—

"জয় জয় শ্রীনিবাস গুণধাম
দীনহীন তারণ প্রেম রসায়ন
ঐছন মধুরিম নাম॥" —ইত্যাদি।

ঠাকুর নরোত্তমের সূচক যেমন—

"ও মোর করুণাময় শ্রীঠাকুর মহাশয়—
নরোত্তম প্রেমের মূরতি।
কিবা সে কোমলতনু শিরীষ কুসুম যনু
জিনিয়া কনক দেহ দ্যুতি॥" —ইত্যাদি

এরপর অন্য গান, যেমন—

"জয়তু শুভমণ্ডিত সুপণ্ডিত
নরোত্তম মহাশয়, মনোজ্ঞ সবরীত
বর গৌরব গভীর অতি ধীরগুণ ধাম।
প্রেমময় রূপ রসকূপ উপমা-রহিত,
মত্ত দিনরাতি রত-গান নব-তান,
গতিনৃত্য হৃতচিত্ত মৃদু অঙ্গ অভিরাম॥" —ইত্যাদি

নাম-সংকীর্তন

কীর্তন হ'ল "বহুভির্মিলিত্বাতদ্ গান সুখম্" (নারদীয় পঞ্চরাত্র), অর্থাৎ অনেকে মিলে ভগবৎ-সুখ-নিমিত্ত ভগবৎ-সম্পর্কিত যে গান গেয়ে থাকেন তাই হ'ল কীর্তন। ভগবৎ-সম্পর্কিত গান বলতে কি?—এ প্রশ্নের সমাধান হয় শ্রীজীব গোস্বামীর উক্তিতে—"ভগবদনামগুণলীলাদি উচ্চৈর্ভাষা তু কীর্তনম্"।

ভগবানের নামগুণ লীলা ইত্যাদির গান। শ্রীচৈতন্যদেব সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন অনেকে মিলে গাওয়া নাম-সংকীর্তনের উপর। তাই শিক্ষাষ্টকের প্রথম শ্লোকেই তিনি বলেছেন—

> "চেতদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্বাপণং
> শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণম্ বিদ্যাবধূজীবনম্।
> প্রতিপদপূর্ণামৃতাস্বাদনম্ সর্বাত্মসমর্পণং
> পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

তা ছাড়া বলেছেন—"নাম সংকীর্তন কলৌ পরম উপায়।" অর্থাৎ সংসারের দাবানলে দগ্ধ হতে হতে যখন মানুষ নিরুপায় এবং অসহায় হয়ে পড়বে তখন তার রক্ষা পাবার একমাত্র পরম উপায়ই হবে নাম-সংকীর্তন। তাই নাম-সংকীর্তনকে আশ্রয় করে সর্বকর্মে অগ্রসর হওয়া নামকে সাক্ষী রেখে সমস্ত সংকল্প করা এবং নামাশ্রয়ই এ জগতে মঙ্গল প্রাপ্তির উপায় এমন বিশ্বাস রেখে নাম কীর্তন করা কর্তব্য। তাই চৈতন্যদেব অঙ্গীকার করেছিলেন—

১। "ঘরে ঘরে প্রবর্তাইমু নাম সংকীর্তন।"

২। "পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম।"

দুটি অঙ্গীকারই সাফল্যের পথে চলেছে, কারণ ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক গ্রামে গঞ্জে এমনকি শহরের বিভিন্ন বাজারে, হাটে, পার্কে, পথের ধারে প্যাণ্ডেল করে জোরালো নামকীর্তন হচ্ছে তা শুনতে হয়। শাস্ত্রমতে আমাদের যে চারটি যুগের কথা বলা হয়—সত্য, ত্রেতা, দাপর ও কলি—এই চার যুগের চারটি নাম। এগুলি হ'ল—

১। সত্য যুগের নাম—

> "নারায়ণ পরা বেদা নারায়ণ পরাক্ষরা।
> নারায়ণ পরা মুক্তির্নারায়ণ পরা গতিঃ ॥"

২। ত্রেতা যুগের নাম—

> "রামনারায়ণানন্ত মুকুন্দ মধুসূদন।
> কৃষ্ণ কেশব কংসারে হরে বৈকুণ্ঠ বামন।"

৩। দাপর যুগের নাম—

> "হরে মুরারে মধুকৈটভারে
> গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ সৌরে।
> যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণো
> নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ ॥"

৪। কলি যুগের নাম—

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥"

চার যুগের এই চারটি নামেরই ত্রাণক্ষমতা আছে তাই এদের তারকব্রহ্ম নাম বলা হয়। বিশেষতঃ এই কলিযুগে 'হরেকৃষ্ণ' এই তারকব্রহ্ম নামই কীর্তনেয়। অবশ্য চৈতন্যদেবের যুগেই আরও বিভিন্ন নামকীর্তনের শুরু হয়। যেমন—

১। "রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষ মাম্।
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহি মাম্ ॥"

২। "হরি হরয়ে নম কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ ॥"

চৈতন্যোত্তর যুগে যে-সব নাম নানাভাবে ভক্তদের দ্বারা কীর্তিত হয়েছে সেগুলি হ'ল—

১। "জয় শচীনন্দন জয় গৌরহরি
বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণনাথ নদীয়াবিহারী ॥"

২। "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ
হরে কৃষ্ণ হরে রাম শ্রীরাধাগোবিন্দ।"

৩। "রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ শ্রীমধুসূদন
রামনারায়ণ হরে জয় জয়।"

বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তারকব্রহ্ম নাম-কীর্তনই হয়ে থাকে, অন্যান্য ক্ষেত্রে এই নামগুলিও কীর্তন হয়। তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গে রাধে গোবিন্দ নাম, ডাকনাম ইত্যাদি বেশী প্রচলন আছে।

৪। "জয় রাধে গোবিন্দ জয় শ্রীরাধে গোবিন্দ জয়"

—অনেক সময় এ পদটির পালাকীর্তনের সুর বজায় রেখে একজন মূল গায়েন পদাবলী গাইতে থাকেন, দোহারগণ পদের পরিবর্তে একই সুরে 'রাধে গোবিন্দ নাম' গাইতে থাকেন, এ ছাড়া বিশেষ প্রতিষ্ঠান-কেন্দ্রিক বিশেষ কতকগুলি নাম আছে যেগুলি সেই প্রতিষ্ঠানের গুরুবর্গের সূত্রে ক্রমশঃ সম্প্রচারিত হয়েছে। যেমন—নবদ্বীপ 'সমাজবাড়ির' রাধারমণ চরণদাসবাবাজী মহাশয়ের সূত্রে প্রচারিত নাম—

"ভজ নিতাই গৌর রাধেশ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম ॥"

আবার প্রভু জগবন্ধু সুন্দরের নামসূত্রে মহা উদ্ধারণ মঠ সম্প্রচারিত নাম—

"হরিপুরুষ জগবন্ধু মহা উদ্ধারণ।
চারি হস্ত চন্দ্রপুত্র হা কীট পতন ॥
প্রভু প্রভু প্রভু হে অনন্ত আনন্দময় ॥"

শ্রীধাম নবদ্বীপের শ্রীগুরুকুঞ্জের প্রভুপাদ শ্রীশ্রী গৌরগোবিন্দ ভাগবত স্বামীজীর সূত্রে সম্প্রচারিত নাম—

"জয় রাধা মদনগোপাল শ্রীরাধা মদনগোপাল।"

নানাবিধ নামকীর্তন নানা সূত্রে সম্প্রচারিত হ'লেও শ্রীচৈতন্যদেবের আমল থেকে নামকীর্তন বা নগরকীর্তন হিসাবে যে নামের কীর্তন প্রচলিত হয়ে আসছে তা হ'ল 'হরেকৃষ্ণ' তারকব্রহ্ম নাম। এই নামকীর্তনই হ'ল পাষণ্ডদলনের মূল অস্ত্র। শ্রীচৈতন্যদেব বহুবিধ সামাজিক আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন এবং সেই সময়ে আন্দোলনের মূল স্লোগানই ছিল এই নামগান। এ গানের সূত্রে পাওয়া যায় একদিকে ভক্তির অনুভব, অন্যদিকে সত্যাশ্রয়ী আন্দোলনের প্রেরণা। এই নাম-কীর্তনের মূল প্রবর্তকই হ'লেন শ্রীচৈতন্য।

শ্রীচৈতন্যদেবের সময় থেকেই নাম-কীর্তনের দল তৈরী করা হ'ত বেশ কয়েকজন গায়ক-বাদকের সমভিব্যাহারে। ন্যূনপক্ষে দুইজন শ্রীখোল বাদক, বেশ কয়েকজন গায়ক, একজন মূল গায়ক নিয়ে কমপক্ষে পনরো কুড়িজন লোকের একটি সম্প্রদায় হ'ত। পূর্ববঙ্গে তিরিশ-চল্লিশ জনেরও সম্প্রদায় হত। জনা-চারেক থাকত বাজিয়ে। নামকীর্তন বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই হয় সংকল্প করে। অর্থাৎ নির্দিষ্ট কিছু সময়ের জন্য অবিচ্ছিন্ন ভাবে। প্রতিটি দিন আট প্রহর হিসাবে—ষোল, চব্বিশ, বত্রিশ, ছাপ্পান্ন, বাহাত্তর, এমনকি তার চেয়েও অনেক বেশী সময় ধরে অবিরত নাম-কীর্তন হয়ে থাকে। এই সংকল্পরক্ষার নিমিত্ত কমপক্ষে চরটি নাম-কীর্তনের দল প্রস্তুত রাখতে হয়। এ দলগুলি দিনে দু'ঘণ্টা এবং রাত্রে দু'ঘণ্টা করে গান করে। ফলতঃ অনায়াসে নির্দিষ্ট সময়ের গান সম্পন্ন হয়ে যায়। বহুলোকের সমাগম, সকলকে যথারীতি আপ্যায়ন, সকলের ভোজনের সংস্থান রাখা ইত্যাদি বিষয়গুলিতে উৎসব বিরাট আকার ধারণ করে মহোৎসবে পরিণত হয়। বহুদূর থেকে শুনা যায় ঐ শ্রীখোল-করতালের ধ্বনি এবং এক বিরাট ধুমধাম।

পরবর্তীকালে অর্থাৎ বিংশ শতকের প্রথমদিকে এ কীর্তনের ধারায় কিছুটা পরিবর্তন সংঘটিত হয়। আগে যেমন নির্দিষ্ট কয়েকটি সুরে গাওয়া হ'ত এবং গাওয়া হ'ত সকলে মিলে, এখন তার প্রথাগত পরিবর্তন হ'ল। রাগসংগীতের ধারার কিছু কিছু সংমিশ্রণ হ'ল এবং একজনের পর একজন করে গানটি গেয়ে চলে—এই বিধি করা হ'ল। দাসপ্যারী তাদের আশ্রয়ে নানাবিধ ছন্দ করে শ্রীখোল বাজানো হয় বেশ ক্লাসিক্যাল ধারায়, সঙ্গে সহায়কারী হিসাবে থাকে তার-যন্ত্র—বেহালা, দোতারা, সারিন্দা ইত্যাদি। প্রথম পর্যায়ে যারা এই নামকীর্তনে ক্লাসিক্যাল রাগের সংযোজন করেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন—ফরিদপুরের রাইমোহন সাহা (রাইয়া বাড়ুই), অনন্ত মাস্টার; ঢাকা জিলার কলাকোপার শম্ভু আচার্য। ফণি কুণ্ডু, গদাধর শীল, শৈলেন সাহা, মনোমোহন বুনো, গোপাল কাপালি প্রমুখ কতিপয় ব্যক্তি। এঁদের অনেকে আবার

রাগসংগীতে পারদর্শী ছিলেন। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে পুরাতন গানের সুর ভেঙে নামকীর্তনের রাগ-রাগিণীর সৃষ্টি করা হয়েছিল। পূর্ববঙ্গে জাঁকালো দল ছিল অক্ষয় গোলদারের। বিত্তশালী লোক, বড় দল তৈরী করেছিলেন, নৌকা করে বিভিন্ন জায়গায় গান করতে যেতেন। 'বুনো'দের দল ছিল প্রসিদ্ধ। এ দলেই মনমোহন প্রসিদ্ধ গায়ক। জেলা অথবা গ্রাম ভিত্তিক দলের নাম হ'ত। পরবর্তী কালের প্রসিদ্ধ গায়কদের মধ্যে ছিলেন—গোপেশ্বর চক্রবর্তী, বৈদ্য চক্রবর্তী, হরমোহন বাউল, হরিনারায়ণ চক্রবর্তী, নগেন সাধু প্রমুখ অনেকে। প্রতিটি দলেরই আবার একজন করে দলপতি থাকতেন।

আধুনিক প্রথায় অর্থাৎ রাগাশ্রিত নামকীর্তন পদ্ধতিতে শ্রীখোল-সংগতের একটি নূতন দিক উন্মোচন করেন লেখকের শ্রীখোল-শিক্ষার গুরু সনাতন সাহা। আদি বাড়ী ময়মনসিংহের টাঙ্গাইল, প্রথম শ্রীখোল-শিক্ষা হরিদাস ওস্তাদজীর নিকট। সনাতন সাহা দাসপ্যারী তালের নামগানের উপযুক্ত নূতন ঠেকা সৃষ্টি করেন, তদনুপাতিক চমকদারী লহর সংযোজনের রীতি এবং মাতনের কৌশল সৃষ্টি করেন। সমসাময়িক বাদক ছিলেন কিশোরী সাহা, ঢাকার রাধিকা চক্রবর্তী। সনাতন ওস্তাদজীর ছাত্রসংখ্যাই ছিল অনেক বেশী, এবং তাঁরা সকলেই খ্যাতিলাভ করেছিলেন। যথা : বনমালী পাল, মদন সাহা (চুটকী মদন), দ্বিজেন শীল প্রমুখ। বর্তমানে যাঁরা খ্যাতিলাভ করেছেন তাঁরা হ'লেন গৌরাঙ্গ দাস, চন্দ্রমোহন কংসবনিক, শ্যামল নট্ট, নারু প্রমুখ অনেকে। লেখক দীর্ঘদিন সনাতন ওস্তাদজীর সংগে থেকে বাদ্যশিক্ষা করেছেন। অন্যান্য যন্ত্রবাদকদের মধ্যে দোতারা বাজনায় বিখ্যাত ছিলেন চৈতন্যদাস (চৈতা), হীরালাল প্রমুখ কয়েকজন। সারিন্দায় বিখ্যাত—নিতাই বাউল, ভক্ত বাউল, সন্তোষ বাউল প্রমুখ। সকলের প্রচেষ্টায় নামকীর্তনের সাংগীতিক অংশটি খুবই সুস্পষ্ট হয়েছে এবং এরই জন্য এ-গান এখন আরও জনপ্রিয় হয়েছে, আগেকার তুলনায় যথেষ্ট গণমুখী হয়েছে। নামকীর্তন ধর্মান্ধতার বিষয় নয়। এটি একটি আচরণ মাত্র, যে আচরণের সূত্রে জাগে সামাজিকতা বোধ, জনকল্যাণে গণ-উদ্যোগের প্রেরণা, সমবায়ভিত্তিক সমাজ-সংস্কারের চেতনা, জাতিবর্ণের সংকীর্ণতা এবং হীনমন্যতা থেকে মুক্তি, শুভকর্মে দানব্রতে উদারতা, সৌহার্দ্য এবং সৌমনস সৃষ্টি-র ক্ষেত্রে যৌথ প্রয়াস এবং সর্বোপরি আনন্দের উপভোগ। এই সর্বাত্মক পরিবেশটি শান্তি ও কল্যাণের ইংগিতবাহী। সমাজ-পরিবেশের কল্যাণের সূত্র ধরে আত্মিক কল্যাণ, আবার আত্মিক অনুভূতির বিনিময়সূত্রে সামাজিক কল্যাণসাধন। তাই নাম-কীর্তন হ'ল কীর্তনের জনপ্রিয় এবং গণমুখী প্রকরণ।

পদাবলী কীর্তন

কীর্তনগানের জন্য উপযোগী করে প্রাচীন কালের কতিপয় বৈষ্ণব আচার্য কবি

(মহাজন) কিছু কিছু কবিতা লিখেছেন। প্রত্যেকটি কবিতাই একটি করে পদ। এমন পদ কত আছে তার সীমা নাই। তবে যে-সব পদ পদাবলী সংকলনে সংকলিত হয়েছে তার সবগুলি গান হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিল কিনা তার যথার্থ প্রমাণ নাই। তবে নানাবিধ গবেষণা-সূত্রে যে-সব সন্ধান পাওয়া গেছে তাতে বোঝা যায় এর সিংহভাগ কবিতাই ছিল প্রসিদ্ধ গান। এর প্রতিটি পদ একটি কীর্তন। এমন এক বা একাধিক মহাজন-কৃত পদগানকেই বলা হয় 'পদাবলী কীর্তন'। এক্ষেত্রে লীলাবিন্যাসের প্রয়োজন কম, গানটির উপস্থাপনই বড় কথা। এমনকি বিভিন্ন গানের মধ্যে প্রসঙ্গের মিল না থাকলেও ক্ষতি নাই। রেডিও, রেকর্ড, দূরদর্শন বা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যে গানগুলি সম্প্রচারিত হয় তা মূলতঃ পদাবলী কীর্তন। গড়াণহাটি ধারাটি যেমন পদাবলী কীর্তনের ক্ষেত্রে সুপ্রযোজ্য তেমন আবার হাল্কা সুরের গানগুলিকে শ্রুতিরোচক করে পরিবেশন করার একটি প্রচেষ্টাও শিল্পীদের মধ্যে দেখা যায়। শিল্পীরা ছিলেন—কৃষ্ণচন্দ্র দে, অপর্ণা দেবী, কমলা ঝরিয়া, আঙ্গুরবালা, ললিতা বৈষ্ণবী, হরিদাস কর, পঞ্চানন ভট্টাচার্য, রথীন ঘোষ, রজেন সেন প্রমুখ গায়ক-গায়িকাবৃন্দ। এখনও আছেন মুড়াগাছার রাধারাণী দেবী, গীতশ্রী ছবি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ গায়িকাবৃন্দ। পদাবলী কীর্তন মূলতঃ পালা কীর্তনের অংশবিশেষ। অনেকগুলি পদকে সংকলিত করে ঘটনার নাটকীয় বর্ণনার উপস্থাপনকল্পে করা হয়—পালা কীর্তন বা লীলাকীর্তন। পদকীর্তন হ'ল ইদানীং প্রচলিত কীর্তনের অর্থাৎ কবি জয়দেবোত্তর যুগে প্রচলিত কীর্তনের প্রাচীনতম রূপ। এরই সংস্কারপ্রাপ্ত রূপটি হ'ল গড়াণহাটি গানের ধারা। ভিন্ন ভিন্ন গানের ভিন্ন ভিন্ন রূপ। পরপর সংযোজন করলেও স্বকীয় সত্ত্বা নষ্ট হয় না। পালা কীর্তন পর্যায় প্রকরণের সময় গানগুলি যখন সংযোজন করা হয়, প্রতিটি গানের বৈশিষ্ট্যের যাথার্থ্যরক্ষা করতে চেষ্টা করা হয়। তাই পদাবলী কীর্তনই হ'ল কীর্তনের প্রাচীনতম নিদর্শন।

পালা বা লীলাকীর্তন

পালা শব্দটি যাত্রা বা নাটকের ক্ষেত্রে যে অর্থে ব্যবহৃত হয় কীর্তনের ক্ষেত্রেও অনেকটা তাই। বৃন্দাবনে প্রকটিত রাধা, কৃষ্ণ, সখা, সখী, গোপ, গোপী ইত্যাদি সকলের সঙ্গে বিলাসসূচক ঘটনাগুলিকেই লীলা বলে বর্ণিত করা হয়। প্রকৃতপক্ষে লীলা হ'ল ভগবৎরূপের খেলা। লীলার আদি নাই অন্ত নাই, ক্লান্তি নাই দুঃখ নাই, আনন্দময় অবিশ্রান্ত একটি নিত্যধারা। ভগবৎস্বরূপের প্রকট অবস্থার সমস্ত কর্মই লীলা। শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের লীলাপ্রসঙ্গ নানাভাবে বর্ণিত হয়েছে বিভিন্ন গ্রন্থে। এই লীলাসূত্রকে অবলম্বন করে নানাবিধ গান রচনা করেছেন মহাজনগণ তাঁদের কাল্পনিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং অনুভবের গভীরতার সহায়তায়। পৃথকভাবে এ গানগুলি হ'ল লীলাকীর্তনের আঙ্গিক—লীলা প্রকরণটিকে

পূর্ণাঙ্গ রূপ দিবার জন্য। বিভিন্ন পদকর্তার ঐ লীলা সংক্রান্ত বিভিন্ন পদ সংগ্রহ করে গায়ক তাঁর আত্মিক অনুভূতি ও শৈল্পিক সৃষ্টিশীল ক্ষমতা দ্বারা একটি আস্বাদনীয় বৈশিষ্ট্য উপস্থাপনের চেষ্টা করেন।

লীলাকীর্তনে কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে গাইতে হয়:

(১) রাধাকৃষ্ণ লীলাপ্রসংগ উপযোগী গৌরচন্দ্রিকা প্রথমেই গাইতে হয়।

(২) পদ-সংকলনে শাস্ত্রীয় ক্রম রক্ষা করতেই হয়।

(৩) ঘটনার পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে যে যে ক্ষেত্রে মহাজনপদাবলীর অভাব হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে তুক গান বা শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে কিছু উল্লেখ করতে হয়।

(৪) আখর সংযোজন ক্ষেত্রে শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এবং রসের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করতে হয়।

(৫) শুদ্ধ কীর্তনের ধারা বজায় রেখে গান করতে হয়। প্রতিটি গানের ভনিতা গাইবার সময় পদকর্তার প্রতি সম্মান দেখাতে হয়।

(৬) সাংগীতিক বৈশিষ্ট্যগুলির গুরুত্ব মানতে হয়, অর্থাৎ যে গান যে তালে এবং যে সুরে গাওয়ার কথা সেভাবেই যেন গাওয়া হয় এবং শ্রোতা ভক্তদের আকাঙ্ক্ষার সংগে সংগতি রেখেই যেন গান সংযোজন করা হয়।

(৭) লীলাকীর্তন-বিশ্লেষণে কেবল নায়ক-নায়িকা, সখা-সখী ইত্যাদির প্রতি সমগ্র গুরুত্ব দিলে হয় না, পরিবেশ-বিশ্লেষণ অন্যান্য পৌরাণিক বা শাস্ত্রীয় প্রসংগ অবতারণা করতে হয়।

(৮) অনুষ্ঠানের সার্বিকতা রক্ষাকল্পে ভক্তিভাব দেখাতে হয় এবং শ্রোতা ভক্তদের মনোমতো দেববিগ্রহের ফটো, মালা, চন্দন ইত্যাদি ব্যবহার করতে হয়।

(৯) চন্দন, মালা ইত্যাদি পরাবার সাধারণ নিয়ম: প্রথমে একটি ফুল দিয়ে বাটিতে চন্দন নিয়ে শ্রীখোল এবং করতালে দিতে হয়, পরে শ্রীখোল-করতালে মালা দিতে হয় তারপর মূলগায়েন, দোহার ও বাদকদের চন্দন এবং মালা পরিয়ে প্রণাম করতে হয়।

(১০) লীলাকীর্তনের ক্ষেত্রে সর্বাধিক আবশ্যকীয় হ'ল 'মিলন'। অর্থাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলন সম্পর্কিত গান, শেষ পর্যায়ে করতে হয় এবং এই মিলন শুনলেই বোঝা গেল গান শেষ।

(১১) লীলাকীর্তনে যে-কোন সময়ে যে-কোন লীলা গাওয়া চলে না। দিনের যে অংশে কীর্তন হবে, সে অংশের নির্দিষ্ট লীলাপ্রসংগ গাওয়াই বিধেয়। যেমন: নিশান্তে—কুঞ্জভংগ; প্রাতে—বাল্যলীলা, দেবগোষ্ঠ, গমনগোষ্ঠ, খণ্ডিতা; পূর্বাহ্নে—খেলাগোষ্ঠ, কলহান্তরিতা, শ্রীকুণ্ডমিলন; মধ্যাহ্নে—নবোঢ়া রসোদ্গার, সূর্যপূজা, গোপীগোষ্ঠ নৌকাবিলাস; অপরাহ্নে—উত্তরগোষ্ঠ, পূর্বরাগ, রসোদ্গার, ভাবোল্লাস; সায়াহ্নে—রূপানুরাগ, আক্ষেপানুরাগ শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ; প্রদোষে—রূপাভিসার, মিলন; নক্তলীলায়—রাসলীলা, সাক্ষাৎ

আক্ষেপ, রসালস, তা ছাড়া মাথুর বিরহে ভবন এবং ভাবী পর্যায়েই প্রাতকালীন পর্যায়।

(১২) ঋতুভেদে উৎসবানুযায়ী কতগুলি লীলাপ্রকরণ আছে, সেগুলি গাইতে হয়। যেমন দোলে—হোরীলীলা ; ঝুলনে—ঝুলন লীলা ; জন্মাষ্টমীর পরের দিন নন্দোৎসব ; বসন্তে—বাসন্তীরাস ; শরৎকালের পূর্ণিমায় শারদীয়া রাস।

(১৩) লীলাকীর্তনে শ্রীখোল-সংগতে অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে বাজাতে হয়। লীলার প্রসংগ, ভাব ও রস অনুযায়ী ঠেকা, লহর, কাটান ইত্যাদি সংযুক্ত করতে হয়। বাদককে দাঁড়াতে হয় এবং নৃত্যভংগী দেখাতে হয়।

(১৪) অষ্টকালীন লীলাকীর্তন হয়, সময়োচিত নির্দিষ্ট আটটি প্রসংগ নিয়ে। বিভিন্ন পর্যায়ের বিভিন্ন গায়ক ধারাবাহিকতা রক্ষা করে গান করে থাকেন।

(১৫) লীলাকীর্তনের ক্ষেত্রে বাংলা, ব্রজবুলি এবং সংস্কৃত এই তিনপ্রকার ভাষা এবং আঞ্চলিক উপভাষা প্রয়োগ করা হয়।

এই লীলাকীর্তনেরই অপর নাম 'পালা কীর্তন' এবং এই 'পালা কীর্তন' শব্দটি মনে হয় পূর্ববংগের সূত্রে এসে লীলাকীর্তনের সংগে যুক্ত হয়েছে। 'পালা' বলতে যাত্রা, নাটক ইত্যাদির পালা। লীলাকীর্তনে যেহেতু নাটকীয় পদ্ধতিতে ঘটনাটি উপস্থাপিত হয়, সেহেতুই মনে হয়, পালা শব্দটি সংযোজিত হয়েছে। পূর্ববংগের অধিবাসীগণ লীলাকীর্তনের পরিবর্তে 'পালা কীর্তন'ই বলে থাকেন। লীলাকীর্তনই হউক আর পালা কীর্তনই হউক, কীর্তনের এ ধারাটির সৃষ্টি হয়েছে সবচেয়ে পরবর্তীকালে। গানগুলি যখন প্রথম রচিত হয় তখন সেগুলি পৃথক গান হিসাবেই গাওয়া হ'ত। তাই প্রত্যেকটি গানের পৃথক অস্তিত্ব। এই অস্তিত্বের সূত্রেই গানের গড়াণহাটি রূপটি পাওয়া যায়। পরে লীলাপ্রসংগের পূর্ণায়ত রূপ দিতে গানগুলি খুঁজে গায়কগণ একটি ঘটনার রূপ দিয়েছেন। স্বভাবতঃই এর সৃষ্টি কিছু পরে এবং এ সৃষ্টি ক্ষেত্রে বা পালা প্রকরণ ক্ষেত্রে কিছুটা মংগলগানের প্রভাব আছে। চৈতন্যদেবের সমসাময়িক কীর্তনীয়া লোচনদাস ছিলেন মংগলগায়ক। তা ছাড়া 'নাটগানের' প্রভাবও যথেষ্টই আছে। এর থেকে বোঝা যায়, লীলা কীর্তনের পূর্ণাংগ রূপসৃষ্টির প্রয়োজনেই মনোহরসাই গানের ধারা সৃষ্টির প্রয়োজন ছিল। গানকে আখর দিয়ে পল্লবিত করা, সুরবিস্তার দিয়ে অলংকরণ করা, হাল্কাভাবে গানকে পরিবেশন করা, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পদাবৃত্তি করে দেওয়া—ইত্যাদি মানা হয়। এই বৈশিষ্ট্যগুলি কেবলমাত্র লীলাপ্রসংগ সংকলন ক্ষেত্রেই বেশী প্রয়োজনীয় ছিল। তা ছাড়া যে-সব গান লীলাপ্রসংগে প্রয়োগ করা হয় এবং যেগুলি মনোহরসাই বলেই পরিচিত, সে গানগুলিরও প্রথম অংশ অর্থাৎ গানের মুখ অনেকটা গড়াণহাটি পদ্ধতিতে বিলম্বিতে গাওয়া হয়। কীর্তনের মধ্যে পালা কীর্তন বা লীলাকীর্তন প্রকরণটি বোদ্ধা শ্রোতাদের কাছে সবচেয়ে আকর্ষণীয়।

তৃতীয় অধ্যায়

কীর্তনের আধ্যাত্মিকতা

বাংলার কীর্তনকে অনেকে 'ত্রিপথগামী' বলে উল্লেখ করেছেন। কারণ ঐ কীর্তনের বৈশিষ্ট্যগুলি বিশ্লেষণ করলে তিনটি বিষয়ই সর্বাধিক প্রকট হয়ে উঠে। এগুলি হল—আধ্যাত্মিক সত্তা, সাহিত্যিক সত্তা এবং সাঙ্গীতিক সত্তা। 'ত্রিপথ-গামী' উক্তির মধ্যে একটি ইঙ্গিত লক্ষ্য করা যায় যে, কীর্তনের এ বৈশিষ্ট্যগুলির পৃথকীকরণ সম্ভব এবং পৃথক করাও হয়েছে। সাহিত্যিকেরা সাহিত্যপ্রকরণ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করে সন্তুষ্ট। কীর্তনের গানের সুর অনেক সংগীত-স্রষ্টাই নানাভাবে ব্যবহার করেছেন। অবশ্য এমন ব্যবহার সবক্ষেত্রে যে ভাল হয়েছে তা ঠিক নয়, কারণ অনেক ক্ষেত্রে রসিকতার জন্য বা বিদ্রূপের জন্য কীর্তনের সুরের আশ্রয় নেওয়া হয়। এ'গুলি নিশ্চয়ই কাম্য নয়, কারণ সাঙ্গীতিক দিক থেকে কীর্তন অনেক উন্নত মানের—তার অপপ্রয়োগে সকলেই ব্যথিত হন। ধর্মীয় আচরণ কীর্তন ছিল একমাত্র বৈষ্ণবেরই আচরণ, কিন্তু আজ পরিধি যথেষ্ট সম্প্রসারিত হয়েছে—শাক্ত, শৈব সকলেই কীর্তনকে স্বকীয় ভজনের একটি পন্থা বলে গ্রহণ করেছেন। এটি অবশ্য আনন্দেরই বিষয়। কিন্তু প্রশ্ন হ'ল, এই বিচ্ছিন্ন চিন্তাধারার প্রসারের ফলে সামগ্রিকভাবে কীর্তনের কোন উন্নতি হয়েছে কি ? তা হয়নি। কারণ যাঁরা অংশ নিয়েই সন্তুষ্ট তাঁরা সমগ্রের জন্য ভাববেন কেন ? অবশ্য অংশবিশেষের স্বরূপ উদ্ঘাটন করেই যাঁরা সমগ্র কীর্তনকে চেনার তৃপ্তি পেয়েছেন তাঁদের ক্ষেত্রে অনেকটা অন্ধের হাতি দেখার মতো।

রবীন্দ্রনাথ কীর্তনকে একটি সামগ্রিক প্রকাশ বলে মেনেছেন এবং অর্ধ-নারীশ্বর রূপের সঙ্গে উপমা করেছেন। রূপে ভাবে মাখামাখি অর্থাৎ কাব্য আর সুর একত্র মিলেছে একটি অভিনব শিল্পপ্রকরণে। প্রকৃতপক্ষে কীর্তনের এ তিনটি উপকরণ সর্বাধিক প্রধান হলেও, এদের মধ্যে আছে একটি জৈবিক ঐক্য ; অর্থাৎ তিনে মিলে এক আর একেই তিন। আমার যেটি ভাল লাগে সেটি পৃথক করে নেওয়া অনেকটা অর্ধ-কুক্কুটীর গল্পের মতো। তাই কীর্তনের সামগ্রিক আকর্ষণ কিছুটা হ্রাস পেয়েছে, যদিও তার সাহিত্যসম্পদ, ধর্ম্মীয় ঐশ্বর্য এবং সাঙ্গীতিক রসের কিছুটা বিস্তার হয়েছে। আধ্যাত্মিক, সাহিত্যিক, সাঙ্গীতিক —এ তিনটি বৈশিষ্ট্যই কীর্তনকে শিল্প হিসাবে সমৃদ্ধ করেছে এবং সে শিল্পের বিষয় বলে যদি কিছু থাকে তা হল ভাব, ভক্তি বা আধ্যাত্মিকতা, আর শিল্পের রূপের আঙ্গিক হিসাবে আছে সাহিত্য ও তার অলংকার, সংগীত ও সুর এবং তাল। তাই কীর্তনের পরিচয় নিতে গেলে তিনটি দিকই যথার্থভাবে জানা দরকার।

আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্য

বাংলার কীর্তনের বিষয় হিসাবে আছে ভক্তির অংগ আধ্যাত্মিকতা, ভাব ও ভক্তি। ভক্তির সূত্রেই কীর্তনের সৃষ্টি আর কীর্তনের ফলশ্রুতিও হ'ল ভাব। ফলতঃ কীর্তনের ক্ষেত্রে বিষয়ের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী, সেজন্যই কীর্তনের আধ্যাত্মিকতাকে উপেক্ষা করা যায় না। অবশ্য ভাব, ভক্তি ও আধ্যাত্মিকতা ইত্যাদি বিষয়গুলি অনুভবসাপেক্ষ ব্যাপার। এ হ'ল নৈর্ব্যক্তিক এবং নির্বিকল্প আত্মানুভূতি মাত্র, তা বিষয়ী-ভেদে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে। কীর্তনের ধর্মীয় বিষয়টি বিরাট। ভাগবৎ ধর্ম হিসাবে ভক্তিধর্মাচারের নয়টি অংগের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম দুটি অংগই হ'ল শ্রবণ এবং কীর্তন। শ্রীমদ্ভাগবতে প্রহ্লাদোক্ত শ্লোকে পাওয়া যায়—

"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণুস্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যং আত্মনিবেদনম্॥"

পদকর্তা গোবিন্দদাস এরই সূত্রে বলেছেন :

"শ্রবণ কীর্তন স্মরণবন্দন
পাদসেবন দাসীরে।
পূজন সখীজন আত্মনিবেদন
গোবিন্দদাস অভিলাষীরে॥"

কলিযুগ-বৈশিষ্ট্য

কলিযুগে আধ্যাত্মিক উন্নতির উপায় হ'ল কীর্তন। এ-যুগ বলতে বর্তমান কলিযুগ, এবং এর কী অবস্থা হ'তে পারে সে-সম্পর্কে প্রাচীন পুরাণকারগণ পূর্ব থেকেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। তাঁদের মতে, এক পাদ মাত্র ধর্ম থাকবে তাও ক্রমশ ক্ষীণ হবে অর্থাৎ শতকরা পঁচাত্তর ভাগ লোকই ধর্মনিরপেক্ষ বা ধর্মরহিত থাকবে। লোকেরা হবে লোভী, দুরাচার, নির্দয়, অকারণ কলহপরায়ণ, দুর্ভাগা ও অতিশয় তৃষ্ণাযুক্ত। শূদ্র, কৈবর্ত ইত্যাদি হবে প্রধান জাতি বিশেষ। এ সময়েই মায়া, মিথ্যা, তন্দ্রা, নিদ্রা, হিংসা, শোক, মোহ, ভয়, দৈন্য ইত্যাদির প্রভাব থাকবে সবচেয়ে বেশী। লোকেরা হবে মন্দমতি, অল্পভাগ্য, বহু-আহার-কারী, কামী ও বিত্তহীন। স্ত্রীগণ স্বেচ্ছাচারিণী এবং অসতী হবে। তারা হ্রস্বকায়া, বহুভোজিনী, বহুপুত্রা, নির্লজ্জা, সর্বদা কটুভাষিণী এবং চৌর্য ও মায়া বিষয়ে অত্যন্ত সাহসসম্পন্না হবে। দেশগ্রাম হবে দস্যুপ্রধান, বেদাদি শাস্ত্র পাষণ্ড লোকেদের দ্বারা দূষিত হবে, শাসকদল হবে প্রজাভক্ষক, ব্রাহ্মণেরা হবে শিশ্নোদরপরায়ণ। পিতা, ভ্রাতা, সুহৃৎ, জ্ঞাতিগণকে ত্যাগ করে পুত্র শ্বশুর-কুলের শ্যালকাদির সংগে মন্ত্রণাপরায়ণ, দীন এবং স্ত্রৈণ হবে।

"কলৌ কাকিণিকেঽপ্যর্থে বিগৃহ্য ত্যক্তসৌহৃদাঃ।
ত্যক্ষ্যন্তি চ প্রিয়ান্ প্রাণান্ হনিষ্যন্তি স্বকানপি ॥"

ভাঃ ১২।৩।৪১

এ যুগে ক্ষুদ্রতম অর্থ অর্থাৎ একটি পয়সার জন্যও বিবাদ করে সৌহার্দ্য ত্যাগ করবে, এমনকি প্রাণ পর্যন্ত পরিত্যাগ করবে এবং স্বজনকে হত্যা করবে।

"ন রক্ষিষ্যন্তিমনুজাঃ স্থবিরৌ পিতরাবপি।
পুত্রান্ ভার্যাশ্চ কুলজাং ক্ষুদ্রাঃ শিশ্নোদরম্ভরাঃ ॥"

ভাঃ ১২।৩।৪২

অর্থাৎ বৃদ্ধ পিতামাতাকে রক্ষা করবে না, শিশ্নোদরপরায়ণ হয়ে সৎকুলজা ভার্য্যা এমনকি পুত্রগণকেও পরিত্যাগ করবে। জানি না এসব ভবিষ্যদ্বাণী কতটা প্রকটিত হয়েছে। তবে কালটা যে খুব সুখের নয়, তা ব্যক্তিগতভাবে অনুমান করা যায়। ধর্মাচার হবে দুর্দশাগ্রস্ত, তাই কোন কঠিন ধর্মাচার এযুগে প্রযোজ্য হ'তে পারে না। একটি যুগ ছিল যখন প্রতিটি লোকই ছিল ধার্মিক, যাকে শাস্ত্রে সত্যযুগ বলা হয়েছে এবং যখন ধর্ম ছিল চার পাদ। সে সময়ে লোকেরা গৃহত্যাগ করে শত শত বৎসর ধ্যান করে ধর্মাচার পালন করতেন। ধর্মের অংশ কমে গেল, এক পাদ অধর্ম যুক্ত হ'ল অর্থাৎ শতকরা পঁচিশভাগ লোক ধর্মবিরহিত হ'ল; কিন্তু তখনও তাদের অর্থবিত্তের অভাব নাই। সে যুগে যজ্ঞই ছিল ধর্মাচার। যজ্ঞের উপচার সংগ্রহ করা ছিল কঠিন কাজ—হাজার হাজার মণ ঘি, চাল, ডাল ইত্যাদির সংস্থান করা সকলের সম্ভব ছিল না। তাই যজ্ঞছিল রাজন্যবর্গের ক্রিয়া, কারণ তাঁদের অর্থবল এবং জনবল উভয়ই ছিল। তৃতীয় পর্যায়ে অধর্মের অংশ বেড়ে গেল, অর্থাৎ অর্ধেক লোক ধর্মরহিত হয়ে গেল, তখন ধর্মাচার কিছুটা সহজ হ'ল। সেবা, পূজা, পরিচর্যা ইত্যাদির দ্বারাই ধর্ম-কর্ম হ'তে লাগল। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে সত্য, নিষ্ঠা, রীতি, বেদাচার ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞানের যথেষ্ট প্রয়োজন। তাই যথারীতি সুফল হয় নাই।

যুগধর্ম ও কীর্তন

এ যুগে মানুষের সহিষ্ণুতা কম তাই ধ্যান হওয়া সম্ভব নয়, মানুষ বিত্তহীন তাই যাগযজ্ঞাদি করাও সম্ভব নয়; বেদ-বিধিতে নিষ্ঠার অভাব, ফলতঃ পূজা-অর্চনাও ততটা ফলপ্রসূ নয়। তাই এমন একটি ধর্মাচারের প্রয়োজন যা সকলের পক্ষে করা সম্ভব, যেখানে কোন কৃচ্ছ্রতা, সুকঠিন শাস্ত্রবিধি ইত্যাদি থাকবে না এবং কুল-কৌলীন্য বা জ্ঞান-পাণ্ডিত্যের অপেক্ষা থাকবে না। ঠিক উপযুক্ত এবং সুচিন্তিত ধর্মাচারটি হ'ল কীর্তন।

শ্রীমদ্ভাগবতে তাই উল্লেখ করা হয়েছে—

"কৃতে যদ্ধ্যায়তে বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্তনাৎ॥"

১২।৩।৫২

এ যুগের সহজতম সাধনপন্থা বা ধর্মাচার হিসাবে কীর্তনের গুরুত্ব বহু পূর্বেই উক্ত হয়েছে। শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ে উক্ত আছে—

"কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ।
যত্র সংকীর্ত্তনেনৈব সর্বস্বার্থোঽভিলভ্যতে॥"

কলিযুগ দোষদুষ্ট হ'লেও একটি মহত্তম গুণে গুণান্বিত, অর্থাৎ কেবলমাত্র সংকীর্তনের দ্বারাই সর্বপ্রকার স্বার্থসিদ্ধি হয়। সেজন্য সকল আর্য গুণী ও সারবেত্তাগণ কলিকে সম্মান করে থাকেন।

"কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসংগ পরং ব্রজেৎ॥"

১২।৩।৫১

বর্তমান সময়ে এ একটি মাত্র নিয়ম, অর্থাৎ কৃষ্ণের কীর্তন করে বন্ধনমুক্ত হয়ে পরমগতি লাভ করা যায়। চৈতন্যচরিতামৃতের অন্তলীলার উক্ত আছে—

"নামসংকীর্তন কলৌ পরম উপায়।"

সুমেধা ব্যক্তিগণ এই যুগে কৃষ্ণকীর্তন মহাযজ্ঞের দ্বারা সাধনক্রিয়া করে থাকেন।

"সংকীর্তন যজ্ঞে কলৌ কৃষ্ণ আরাধন।
সেইত সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ॥"

বৃহন্নারদীয় পুরাণে যুগধর্ম বিষয়ে উক্ত আছে—

"হরের্ণাম হরের্ণাম হরের্ণামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"

তত্ত্বের সত্যতা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য 'হরের্ণাম' বা 'নাস্ত্যেব' শব্দগুলি তিনবার করে প্রয়োগ করা হয়েছে।

প্রাচীন শাস্ত্রাচারে এযুগোপযোগী ধর্মের উল্লেখ থাকলেও শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত এ ধর্মের সন্ধান বা ফলপ্রসূতা সকলে জানতে পারে নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু এযুগধর্মকে সুস্পষ্টভাবে স্বকীয় আচরণের মাধ্যমে প্রচার করবার নিমিত্ত যুগাবতার রূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

প্রাচীন শাস্ত্রে কীর্তন

প্রাচীন শাস্ত্রাদির উল্লেখগুলি নিম্নরূপ :

স্কন্দ পুরাণে উল্লেখ আছে ঋক্, সাম, যজু ও অথর্ব এই চার বেদঅধ্যয়ন অপেক্ষা কীর্তনের ফল অধিক।

"মা ঋকো মা যজুস্তাৎ মা সাম পাঠকিশ্চম্ ।
গোবিন্দেতি হরের্ণাম গেয়ং গায়স্ব নিত্যশঃ ॥"

মানুষ সাধারণতঃ ধর্মকর্মের জন্য তীর্থাদি ভ্রমণ করে থাকে, কিন্তু এমন সহস্র বা কোটীতীর্থ ভ্রমণ করে যে ফলপ্রাপ্তি হয়—কেবলমাত্র বিষ্ণুর নাম সংকীর্তনে ততোধিক ফল হয়ে থাকে। বামন সংহিতায় উক্ত আছে—

"তীর্থকোটী সহস্রাণি তীর্থকোটী শতানি চ।
তানি সর্বাণ্যবাপ্নোতি বিষ্ণোর্ণামানু কীর্ত্তনাৎ ॥"

মানুষ পুণ্যসঞ্চয় করবার জন্য দানব্রতাদি করে থাকে এবং এ দানের ফল সর্বাধিক হয় গ্রহণের দিনে গঙ্গাস্নানের পর। এমন কোন এক গ্রহণ-সময়ে প্রয়াগে গঙ্গাস্নান করে যদি এক কোটী গাভী দান করা হয় অথবা যদি মেরু প্রমাণ স্বর্ণও প্রদান করা হয়, তাতে যা পুণ্য হ'তে পারে তার চেয়ে শতগুণ পুণ্যলাভ করা যায় কেবলমাত্র গোবিন্দকীর্তনে। তাই লঘুভাগবত গ্রন্থে বলা হয়েছে—

"গোকোটীদানং গ্রহণে খগস্য প্রয়াগগঙ্গোদক কল্পবাসঃ।
যজ্ঞাযুতঃ মেরুসুবর্ণদানং গোবিন্দকীর্ত্তের্নসম শতাংশৈঃ ॥"

এই সংকীর্তনের সূত্রেই মহাপাপ দূর হয়ে যায়, মহাপাতকীও উদ্ধার হয়ে যায়—গৌরলীলায় এগুলিই ইতিহাস। সে-সম্পর্কে বিভিন্ন পুরাণে নানাভাবে বলা হয়েছে। যেমন—

১। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে :

"মহাপাতকযুক্তোঽপি কীর্ত্তয়ন্ননিশং হরিঃ।
শুদ্ধান্তঃকরণো ভূত্বা জায়তে পঙ্‌ক্তিপাবনঃ ॥"

২। স্কন্ধ পুরাণে :

"তন্নাস্তি কর্মজং লোকে বাগজং মানসমেব বা।
যন্নং ক্ষপয়তে পাপং কলৌ গোবিন্দকীর্ত্তনাৎ ॥"

৩। তথাহি :

"আধয়োব্যধয়ো যস্য স্মরণান্নাম কীর্তনাৎ।
তদৈব বিলয়ং যান্তি তমনন্তম্ নমাম্যহম্ ॥"

৪। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে :

"সর্ব্বপাপপ্রশমনং সর্ব্বোপদ্রবনাশনম্।
সর্ব্বদুঃখক্ষয়কারং হরিনামানুকীর্ত্তনাৎ ॥"

৫। বিষ্ণু পুরাণে :

"সর্ব্বরোগোপশমনং সর্ব্বোপদ্রবনাশকং।
শান্তৈদং সর্ব্বারি ধর্মানং হরের্ণামনুকীর্ত্তনাৎ ॥"

৬। বিষ্ণু ধর্মোত্তর পুরাণে—

"শমায়ালং জলং বহ্নেস্তমসোভাস্করোদয়ঃ।
শান্তৈ কলেরঘৌমস্য নাম সংকীর্ত্তনং হরেঃ॥"

৭। পরাশর সংহিতায়—

"ন শাম্ব ব্যাধিজং দুঃখং হেয়ং নন্যোষধৈরপি।
হরিনামৌষধং পীত্বা ব্যাধিস্ত্যাজ্যো ন সংশয়ঃ॥"

৮। বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণে—

"কীর্ত্তনাদ্দেবদেবস্য বিষ্ণোরমিত তেজসঃ।
যক্ষ রাক্ষস বেতাল ভূতপ্রেত বিনাশকাঃ॥
ডাকিন্যো বিদ্রবন্তি স্ম সে তথান্যে চহিংসকা।
সর্ব্বানির্থ হরং তস্য নাম সংকীর্ত্তনং স্মৃতঃ॥"

এ উক্তিগুলি থেকে সুস্পষ্ট দেখা যায় নামসংকীর্তনের উপর মানুষের বিশ্বাস কত বিস্তৃত। শুধু পাপনাসকতা নয়, ব্যাধির উপশম, ভূতপ্রেত পিশাচাদির হাত থেকে রক্ষা সব-কিছুই এ হরিকীর্তনের সাহায্যে সম্ভব।

সঙ্কীর্তনৈক পিতরৌ

আজ থেকে পাঁচশত বৎসর পূর্বে শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যদেব আবিভূ'ত হলেন শ্রীজগন্নাথ মিশ্র নামক এক আচারী ব্রাহ্মণের ঘরে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের আধ্যাত্মিকতার চরম উৎকর্ষ স্থাপনের জন্য এবং এই উৎকর্ষতার সূত্রেই কলিহত জীবের প্রতি কৃপাপ্রদানের মাধ্যমে ত্রিভুবন উদ্ধার করার জন্য। তাই গোপাল ভট্ট বলেছেন—"ত্রিভুবনপাবনং কৃপয়ালেশম"। ভবভয়ে জর্জরিত মানুষকে অভয় প্রদান করে তাঁর কারুণ্যঘন লীলা প্রকাশ করবার জন্য। তাই বলা হয়েছে "ভবভয়ভঞ্জন কারণকরুণম্", ভগবদ্নামগুণাদি প্রকাশের দ্বারা জগদ্বাসীকে প্রেমশিক্ত করার জন্য। তাই বলা হয়েছে—"জল্পিত নিজগুণ নাম বিনোদং" তাছাড়া দুর্জনদের পাপবৃত্তি খণ্ডনের মাধ্যমে দণ্ড প্রদানের নিমিত্ত। তাই বলা হয়েছে—"দুর্জন কল্মষ খণ্ডন দণ্ডং।" তাঁর আবির্ভাবের সূত্রেই কীর্তনের আবির্ভাব তথা মংগলের আবির্ভাব। তাই শ্রীবৃন্দাবনদাস চৈতন্যভাগবত গ্রন্থে মংগলাচরণে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রণামমন্ত্রে লিখেছেন—

"আজানুলম্বিতভুজৌ কনকাবদাতৌ
সংকীর্তনৈক পিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ।
বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্ম্মপালৌ
বন্দে জগৎপ্রিয়করৌ করুণাবতারৌ॥

শ্লোকে জগৎপ্রিয়কর, করুণাবতার বা যুগধর্মপাল বলে যে বিশেষণগুলি প্রযুক্ত করা হয়েছে, তার মূল সূত্রই হ'ল 'সঙ্কীর্তনৈক পিতরৌ' শব্দটি।

সংকীর্তনের পিতৃস্বরূপ আবির্ভূত হয়ে কীর্তনের মূলতত্ত্বকে উদ্ঘাটন করে তার পুনর্জীবন, পুনর্যৌবন দান এবং পুণঃপ্রচারের চেষ্টা করেছেন। তাঁর বক্তব্য ছিল—"ঘরে ঘরে প্রবর্তাইমু নাম সংকীর্তন।" (চৈভাঃ) 'প্রবর্তাইমু' শব্দটির মধ্যে একটি রহস্য হ'ল এই যে 'অন্যের সহায়তায় প্রবর্তন করিব'। (এক্ষেত্রে সাঙ্গ, উপাঙ্গ, অস্ত্র, পার্ষদ ইত্যাদির সহায়তায় প্রধানতঃ অভিন্নাত্মা ভক্তস্বরূপ অবধূত শ্রীনিত্যানন্দের সহায়তায়)। বিবর্তস্বরূপ গৌরের বিলাস-স্বরূপ শ্রীমন্নিত্যানন্দ "অভিন্নচৈতন্যতনু ঠাকুর অবধূত"। সে জন্যই বোধ হয় বৃন্দাবনদাস দ্বিবচনার্থক 'পিতরৌ' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। চৈতন্য-আবির্ভাবে যে কীর্তন-ধর্মের সূচনা হবে সে-বিষয়ে বহু উল্লেখ আছে। যেমন—

১। শ্রীজীব গোস্বামী বলেছেন (তত্ত্বসন্দর্ভে):

"অন্তঃ কৃষ্ণং বহির্গৌরং দর্শিতাঙ্গাদি বৈভবম্।
কলৌ সংকীর্তনাদ্যৈঃ স্ম কৃষ্ণচৈতন্যমাশ্রিতাঃ॥"

২। শ্রীমদ্ভাগবতে (দশম স্কন্ধের) ৮।১৩:

"আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহ্যস্য গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনূঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥"

এর মধ্যে পীতবর্ণই হ'ল শ্রীগৌরাঙ্গ।

৩। মার্কণ্ডেয় পুরাণে:

"গোলোকঞ্চ পরিত্যজ্য লোকানাং ত্রাণকারণাৎ।
কলৌ গৌরাঙ্গরূপেণ লীলালাবণ্যবিগ্রহঃ॥"

৪। বায়ুপুরাণে:

"কলৌ সংকীর্তনারম্ভে ভবিষ্যামি শচীসুতঃ।
স্বর্ণদীতীরমাস্থায় নবদ্বীপে জনাশ্রয়ে।
তত্র দ্বিজকুল শ্রেষ্ঠে শুদ্ধসত্বে দ্বিজালয়ে॥"

৫। দেবীপুরাণে উমা-পার্ব্বতী সংবাদে:

"নাম সিদ্ধান্ত সম্পত্তি প্রকাশন পরায়ণঃ।
কদ্বচিৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামীলোকে ভবিষ্যতি॥"

৬। ব্রহ্মযামল গ্রন্থে:

"জীবনিস্তারণার্থায় নামবিস্তারণায় চ।
যো হি কৃষ্ণঃ স চৈতন্যো মনসা ভাতি সর্ব্বদা॥
ভবিষ্যামি শচীপুত্রঃ কলৌ সংকীর্তনাগমে।
হরিনামপ্রদানেন লোকান্ সংতারয়াম্যহম্॥

৭। ঊর্ধ্বাম্নায় সংহিতায়:

"হরিনাম তদা দত্বা চণ্ডালাং হস্তিকাংস্তথা।
ব্রাহ্মণাং ক্ষত্রিয়ান্ বৈশ্যান্ শতশোঽথ সহস্রশঃ॥"

উদ্ধরিষ্যাম্যহং তপ্ততপ্তস্বর্ণকলেবরঃ।
সন্ন্যাসশ্চ করিষ্যামি কাঞ্চনগ্রামমাশ্রিতঃ॥"

৮। শ্রীবাসুদেব সার্বভৌমকৃত চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের ষষ্ঠ অঙ্কের শ্লোক :

"কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ
প্রাদুস্কর্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা।
আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে গাঢ়ং গাঢ়ং
লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ॥"—ইত্যাদি

উপরোক্ত সমস্ত উদ্ধৃতিগুলি থেকে কয়েকটি বস্তু সুস্পষ্ট হয় যে—(১) চৈতন্যদেব নবদ্বীপের কোন এক বিশিষ্ট ব্রাহ্মণগৃহে জন্মগ্রহণ করবেন ; (২) তিনি বৃন্দাবনের যশোদানন্দন স্বরং শ্রীকৃষ্ণ হলেও শ্রীরাধাভাবে বিভাবিত হয়ে প্রেম-মাধুর্য আস্বাদন করবেন ; (৩) কলির একমাত্র সাধন হিসাবে কীর্তনকে প্রতিষ্ঠিত করবেন ; (৪) চণ্ডাল, হাড়ী, বাগ্দী, ডোম, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য সকলকে সমভাবে আকর্ষণ করে নাম প্রেম বিতরণ করবেন। এর থেকে স্পষ্টই প্রতীমান হয় যে জাতিভেদপ্রথা নির্মূল করে নামাশ্রয়ে সর্বপ্রকার বিভেদ দূর করে সকলকে প্রেমাসক্ত করে পরস্পর পরস্পরের সেবায় নিযুক্ত করাই ছিল আপাত ক্রিয়া। 'কৃষ্ণ' বস্তুত সর্বোত্তম তত্ত্ব আর তাঁর উপদেশ হ'ল—"জীব সেবা কর জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান"। অর্থাৎ কৃষ্ণের অধিষ্ঠান জ্ঞান করলে জীবসেবা একটি আবশ্যকীয় কর্ম হয়ে দাঁড়ায়। তাই তাঁর প্রবর্তিত বৈষ্ণবীয় আচরণের একটি মূল তত্ত্বই হ'ল সেবাবৃত্তি। এই বৃত্তিই মানুষে মানুষে মিলবার ধর্ম, অর্থাৎ মানবিক ঐক্যের মূল চাবিকাঠি। তিনি দেখতে পেলেন রাধাকৃষ্ণ তত্ত্ব বা লীলা বিষয়টি কতিপয় লোকের আস্বাদ্য। সমাজের অবহেলিত, নিপীড়িত এবং নীচু জাতি বলে বর্ণিত কিছু কিছু গৃহস্থের ঘরে অসংস্কৃত বা কুসংস্কৃত অবস্থায় কৃষ্ণকীর্তন সঙ্গীত বা নাট্যরূপে বেঁচে আছে। তিনি সেই সঙ্গীতকে আশ্রয় করলেন, তার সংস্কার করলেন, ভুলত্রুটিগুলি ধরিয়ে দিলেন : 'দিশা দেখান প্রভু হাতে তালি দিয়া'। নিজের পরিকরগণের সঙ্গে সর্বদা কীর্তনরঙ্গে মেতে থেকে নামকীর্তনের দলবদ্ধ একটি স্পষ্ট রীতি প্রবর্তন করলেন। নদীয়ায় কিছু পড়ুয়া ছাত্র ছিল শ্রীচৈতন্যদেবের, তাদের পাঠান্তে তিনি কীর্তনের কথা বলেন, কিন্তু কীর্তন কিভাবে গাইতে হয় তা তারা জানতো না। তখন শ্রীচৈতন্যদেব তাদের শিখিয়েছেন কীর্তনের পদ্ধতি। চৈতন্যভাগবতে উক্ত আছে—

"শিষ্যগণ বলেন প্রভু কেমন সংকীর্তন।
আপনে শিখায় প্রভু শচীর নন্দন॥
হরি হরয়ে নম কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ॥

দিশা দেখান প্রভু হাতে তালি দিয়া।
আপনি কীর্ত্তন করে শিষ্যগণ লইয়া॥"

এ সূচনা থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত নদীয়াবাসী হরিনাম-সংকীর্তনে মেতে ধূলোয় গড়াগড়ি দেন। এত আনন্দ এত সুখ—'গোলকের প্রেমধন হরিনাম সংকীর্তন'—নবদ্বীপের সর্বত্র প্রচারিত হ'ল।

"পরম সন্তোষ সবে হইল অন্তরে।
এবে সংকীর্তন হৈল নদীয়া নগরে॥
এমন দুর্লভ ভক্তি আছয়ে জগতে।
নয়ন সফল হয় যে ভক্তি দেখিতে॥"

নামকীর্ত্তন প্রবর্ত্তন

শিক্ষাষ্টকের একটি শ্লোকে তিনি ঘোষণা করলেন যে স্বয়ং ভগবানের যে শক্তি তাঁর নামেও সেই শক্তি। ভগবানকে সর্বদা পাওয়া যায় না কিন্তু তাঁর নাম সর্বদাই আছে, সুতরাং সে-নাম যে-কোন অবস্থায় যে-কোন লোক কীর্তন করতে পারবে। তাতে কোন বিধি-নিষেধের অপেক্ষা নাই।

"নাম্নামকারী বহুধা নিজ-সর্ব্বশক্তি
স্তত্রার্পিতানিয়মিত স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্ ! মমাপি
দুর্দৈবমীদৃশমহাজনি নানুরাগঃ॥"

বাংলায় বলা হয়—নামাশ্রয় মূল প্রাপ্তির উপায় :

"যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি।
নামের সহিত আছেন আপনি শ্রীহরি॥"

লঘুভাগবত গ্রন্থে আছে :

"নামচিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতনরসংবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধোঃ নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ॥"

অর্থাৎ "কৃষ্ণনাম চিন্তামণি চিদানন্দময়।
নাম নামী ভিন্ন নহে রসের নিলয়॥"

নাম এত শক্তিশালী যে নামাভাসেই মুক্তি সম্ভব, কিন্তু যে-কোন অবস্থায় এ নাম গ্রহণ সম্ভব। এত সহজ পন্থা কোথাও কোন ধর্মে কখনও ছিল না। বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণে আছে—

"ন দেশনিয়মস্তত্র ন কালনিয়মস্তথা।
নোচ্ছিষ্টাদৌ নিষেধোঽস্তি হরের্নামনি লুব্ধক॥"

অর্থাৎ "দেশকাল শুদ্ধাশুদ্ধ না কর বিচার।
অতএব সর্ব্বকাল নাম কর সার॥"

দেশকাল ভেদ নাই, পাত্রাপাত্র ভেদ নাই, হেলা-শ্রদ্ধার অপেক্ষা নাই, খেতে শ্নতে, গৃহে বনে সর্বাবস্থায়

"নাম ভাব নাম চিন্ত নাম কর সার।
নাম বিনা এ জগতে গতি নাহি আর॥"

নগরে নগরে নগর সংকীর্তন' প্রচলন করে বললেন :

"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥"

তা অবশ্য আংশিকভাবে প্রকট হ'তে চলেছে, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বর্তমানে নাম-সংকীর্তনের কিছু কিছু প্রচার হয়েছে। বঙ্গদেশেও গ্রামে গ্রামে শহরে বাজারে, বস্তীতে, এমনকি রাস্তার উপরেও হরিনাম সংকীর্তনের আসর বসেছে। নাম সর্বাবস্থায় যেমন করা সম্ভব তেমন প্রহরব্যাপী সংকল্প করেও নাম করার রীতি প্রবর্তন করলেন শ্রীচৈতন্যদেব। চৈতন্যভাগবত-প্রণেতা বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের একটি পদে পাওয়া যায়—

"শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ বসি দুই ভাই।
হাসি কহে মহাপ্রভু শুন ভাই নিতাই॥
জীবের নিস্তার ভাই করিতে আসিয়া।
ভুলিয়া রহিলি কেনে আউলিয়া হইয়া॥"
সংকীর্তন যজ্ঞ করি জীবের নিস্তার।
সেই লাগি হইল এবে তোমার অবতার॥
অতএব শুভারম্ভ করহ নিতাই।
অধিবাস আরম্ভ করহ ত্বরাই॥"

এই আজ্ঞা পেয়ে নিত্যানন্দপ্রভু স্থানে স্থানে লোক পাঠালেন এবং বিশেষ-ভাবে বৈষ্ণবদের নিমন্ত্রণ করলেন। বৈষ্ণব বলতে যে-কোন জাতির বৈষ্ণব এবং বৈষ্ণব সম্পর্কে অত্যুচ্চ ধারণা প্রকাশ করলেন। বললেন—

"অনেক ভাগ্যের ফলে   বৈষ্ণব আসিয়া মিলে
কালি হবে কীর্তন বিলাস॥"

লক্ষ্য রাখতে বললেন কেউ যেন বাদ থাকে না। যত গায়ক ও বাদক আছেন সকলকে গললগ্নীকৃতবাসে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে নিমন্ত্রণ জানান হ'ল।

"যে বা গায় যে বাজায়   নিমন্ত্রণ করি তায়
পৃথক পৃথক জনে জনে।"

তাই সংকল্পিত কীর্তনের মূল উদ্দেশ্য বৈষ্ণব সম্মেলন এবং কীর্তন আস্বাদন। এ আস্বাদন যখন ঘরোয়া ভাবে হ'ত নিজগণ সঙ্গে নিয়ে তখন হ'ত শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক কীর্তন, আবার যখন খোলা আসরে সকলকে নিয়ে হ'ত তখন হ'ত নাম-সংকীর্তন। তাই বলা হয়—

"বহিরঙ্গ সনে করে নামসংকীর্তন।
অন্তরঙ্গ সনে করে রসাস্বাদন॥"

উভয়ক্ষেত্রে মৌলিক বিধি একই। যা, হোক সকলকে নবদ্বীপে নিমন্ত্রণ করা হ'ল—খোল করতাল নিয়ে সকলেই উপস্থিত, এমন সময়ে মহাপ্রভু আবার আজ্ঞা দিলেন।

"শ্রীধর মুকুন্দ ডাকিয়া তখন
কহিছে গৌরাঙ্গ হরি।
মনোহর বেদি কর নিরমান
স্থান সংস্কার করি॥
দিয়া আম্রসার রচনা করহ
তুলসীর আরাধন।
আপনে নিতাই করহ যতনে
বৈষ্ণবের নিমন্ত্রণ॥"

তখন সেই বেদীর উপর গীতা ভগবত ইত্যাদি গ্রন্থগুলি রাখা হ'ল, আম্রপল্লব দিয়ে নাটমন্দিরের চতুর্দিক সাজানো হ'ল, একটি পূর্ণ মংগলঘট স্থাপন করা হ'ল। তার উপর দেওয়া হ'ল আম্রপল্লব, কলা, ফুল, মালা ইত্যাদি। অগুরু চন্দনমালা সব একত্র করা হ'ল দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু, শর্করা, গোময়, গোমূত্রাদি পঞ্চগব্য, পঞ্চামৃত অভিষেকদ্রব্যাদির আয়োজন করা হ'ল। খোল করতাল ইত্যাদি সব আসরের মাঝখানে রেখে নিত্যানন্দ স্বয়ং বৈষ্ণবদের সম্ভাষণ করলেন। বংশীদাসের পদে আছে—

"আপনি নিতাই ধন দেয় মালা চন্দন
করে প্রিয় বৈষ্ণব সম্ভাষ॥"

তার পরেই হ'ল কীর্তন মহাযজ্ঞের সূচনা। কখনও দেখা যায়:

কীর্তন আনন্দে শ্রীবাস রামানন্দে
মুকুন্দ বাসু গুণ গান॥"

আবার কোন পদে আছে:

"হরিদাস করে গান শ্রীবাস ধরয়ে তান
নাচে গোরা কীর্তন মংগল॥"

অন্য পদে আছে:

"গোবিন্দ মৃদঙ্গ লৈয়া বাজায় তাতা থৈয়া থৈয়া
করতালে অদ্বৈত চপল॥"

অন্যত্র আছে:

"সংকীর্তনের অধিকারী হইলেন নরহরি
বিলসই শ্রীরঘুনন্দন॥"

এইভাবে সমগ্র নদীয়া নগরে কীর্তন মহোৎসবের সূচনা হ'ল। আবার একদিন নিত্যানন্দকে সংগে করে কীর্তনের বিধি প্রচারের নিমিত্ত গেলেন শান্তিপুরে অদ্বৈতের গৃহে। এই গৃহটি ছিল শ্রীমন্মহাপ্রভুর অতি প্রিয়, যদিও অদ্বৈত ছিলেন চৈতন্যদেব অপেক্ষা বাহান্ন বৎসরের বড়, কারণ তাঁর জন্ম হয় ১৩৫৫ শকে অর্থাৎ ১৪৩৩ সালের মাঘ মাসের শুক্লাসপ্তমী তিথিতে। তাঁর পিতার নাম কুবের পণ্ডিত মাতার নাম নাভা দেবী। তাঁদের আদি নিবাস শ্রীহট্ট জেলার 'লাউড়' গ্রামে। তাঁর আদি নাম ছিল কমলাক্ষ পণ্ডিত বা কমলাকান্ত বেদপঞ্চানন। তাঁর দুই স্ত্রী। জ্যেষ্ঠা স্ত্রীর নাম সীতা দেবী, যে পরিচয়ে অদ্বৈতকে সীতানাথ বলা হ'ত। কনিষ্ঠা স্ত্রীর নাম শ্রীদেবী। সীতা দেবীর ছয় পুত্র। তাঁদের নাম যথাক্রমে—১। অচ্যুতানন্দ, ২। কৃষ্ণদাস, ৩। গোপাল, ৪। বলরাম, ৫। স্বরূপ, এবং ৬। জগদীশ; তাছাড়া, কনিষ্ঠা স্ত্রীর একমাত্র পুত্র শ্যামদাস। শ্রীঅদ্বৈতের আহ্বানেই শ্রীচৈতন্যদেব যথাসময়ে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। সেই গৃহেতেই সংকীর্তনের শুভ অধিবাসের আয়োজন করলেন শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ। প্রাচীন একটি পদে প্রসংগটি পাওয়া যায় (পদটি বৃন্দাবনদাস বা পরমেশ্বরদাস যাঁরই লেখা হউক না কেন) পদটি হ'ল—

> "একদিন পঁহু হাসি অদ্বৈত মন্দিরে আসি
> বসিলেন শচীর কুমার।
> নিত্যানন্দ করি সংগে অদ্বৈত বসিয়া রংগে
> মহোৎসবের করিলা বিচার ॥
> শুনিয়া আনন্দে ভাসি সীতা ঠাকুরাণী আসি
> কহিলেন মধুর বচন।
> তা শুনি আনন্দ মনে মহোৎসবের বিধানে
> বলে কিছু শচীর নন্দন ॥"

এখানেও সেই একই পদ্ধতি অর্থাৎ বৈষ্ণব নিমন্ত্রণ, ঘট স্থাপন, আম্রপল্লব দ্বারা সাজানো, মালা চন্দন ইত্যাদির ব্যবহার। লক্ষণীয় বিষয় এই যে, যার নাম 'মহোৎসব' তার উপচার অতি সামান্য, পুজো-অর্চ্চনার বিশেষ উল্লেখই নাই—কেবল কীর্তন আর বৈষ্ণবের প্রতি সম্মান। এত সহজ না হ'লে দলে দলে লোক কি আর যোগদান করে তৃপ্তিলাভ করতে পারত ?

এই কীর্তনই সাধ্য ও সাধন তত্ত্ব। উত্তরবঙ্গে যখন চৈতন্যদেবের সংগে তপন মিশ্র নামক প্রধান শাস্ত্রজ্ঞের সাক্ষাৎ হয় তখন মিশ্র প্রশ্ন করেছিলেন,'সাধ্য ও সাধন তত্ত্ব কি ?' মহাপ্রভু তাঁকে নাম করতে নির্দেশ দিলেন পরে যখন কাশীতে আবার দেখা হ'ল তখন মিশ্র বললেন—'প্রভু, সার বুঝেছি, নামই সাধ্য আর নামই সাধন।' কুষ্ঠরোগাক্রান্ত গোপালকে নাম দিয়ে রোগমুক্ত করেছিলেন, মদ্যপ, দুরাচারী ভ্রাতৃদ্বয় জগাই আর মাধাইকে নাম দিয়ে উদ্ধার করেছিলেন ;

চূড়ান্ত অত্যাচারী কাজীকে নামকীর্তনের অস্ত্রসাহায্যে দলন করেছিলেন। এভাবে কীর্তনের মাহাত্ম্য বাস্তবে প্রকটিত করে কীর্তনকে জনপ্রিয় করেছিলেন। শুধু বঙ্গদেশ নয়, উড়িষ্যায় সর্বপ্রথম কীর্তনের প্রচার করলেন শ্রীচৈতন্যদেব। এই কীর্তনের সূত্রেই উড়িষ্যার সঙ্গে বঙ্গদেশের সাংস্কৃতিক সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হয় এবং উড়িষ্যায় বৌদ্ধধর্মের প্রভাব কমে হিন্দুধর্মের প্রভাব বৃদ্ধি হয়। যে উড়িষ্যার লোক কখনও জানত না কীর্তন কেমন গান, সেই উড়িষ্যায় পরবর্তী কালের প্রধান গানই হ'ল কীর্তন। এসবই হয়েছে শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপায় ও প্রচেষ্টায়। শ্রীচৈতন্যের এমন প্রভাব যুক্ত হওয়াতে কীর্তনের আধ্যাত্মিক গুরুত্ব বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায় এবং আধ্যাত্মিকতাই কীর্তনের প্রধান বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। অধ্যাত্মচেতনার ক্ষেত্রে কার্যকরী হউক আর নাই হউক, কীর্তনের মূল স্বরূপ্ হ'ল বাংলার একপ্রকার নির্দ্দিষ্ট সংগীত এবং সোনার বাংলার মধ্যস্থিত একটি বৈদূর্যমণি—যার আভায় ভারতবর্ষের সমগ্র পূর্বাঞ্চল উদ্ভাসিত।

চতুর্থ অধ্যায়

কীর্তনাঙ্গীয় সাহিত্য

ব্রজবুলি ও আঞ্চলিক ভাষা : কীর্তন গানকে কেন্দ্র করে যে অপূর্ব সাহিত্য-সম্ভার উদ্ভাবিত হয়েছে তাকে মধুর বৈ অন্য কোন বিশেষণে আখ্যায়িত করা যায় না। এ সাহিত্যের প্রতিপদে পূর্ণামৃতের স্বাদ যেন 'সুধা সার স্বাদ বিনিন্দন।' সঙ্গীতের রূপায়ণ যতই সংস্কৃত পর্যায়ে উন্নতমুখী হ'তে শুরু করল, সংগীতাশ্রয়ী কাব্যও তত বিকশিত হ'তে শুরু করল। বলিহারি মাধুর্য, বলিহারি সৌন্দর্য! চতুর্দশ শতক পর্যন্ত প্রবন্ধ ও সংগীতের মধ্যে যে ভাষার প্রাধান্য দেখা যায়, সেগুলি হ'ল সংস্কৃত, মাগধী, অর্ধমাগধী, সৌরসেনী ইত্যাদি। কিন্তু রসসৃষ্টি প্রকরণে সেইসব ভাষার অপ্রতুলতা অনুভূত হ'ল তাই সংগীতস্রষ্টা কবিগণ ব্রজলীলা বৃত্তান্ত অনায়াসে প্রকাশ করবার জন্য মাগধী, সৌরসেনী ভাষার সঙ্গে প্রাচ্য আঞ্চলিক ভাষার মিশ্রণে যে নূতন বুলি সৃষ্টি করলেন তারই নাম 'ব্রজবুলি', আর তাই হ'ল কীর্তন গান রচনার ভাষা। আসাম, বিহার, উড়িষ্যা ও বঙ্গদেশের যে আঞ্চলিক ভাষা পরবর্তীকালে সৃষ্টি হয়, তা প্রধানতঃ মাগধী বা অর্ধমাগধী ভাষারই অপভ্রংশ। মাগধীর তিনটি প্রকরণ কালে কালে সৃষ্টি হ'ল : বাংলা, অসমীয়া এবং ওড়িয়া ; দ্বিতীয়টি মধ্য মাগধী যার সূত্র ধরে সৃষ্টি হ'ল মৈথিলী বা উত্তর বিহারের ভাষা—মগহী বা মগধী অর্থাৎ মধ্য বিহারের ভাষা এবং তৃতীয়টি হ'ল পশ্চিমা মাগধী যার থেকে সৃষ্টি হ'ল পশ্চিম বিহারী বা ভোজপুরী ভাষা। মধ্যযুগীয় বাংলার আদিস্তরে অর্থাৎ ১৩০০ থেকে ১৫০০ সালের মধ্যে ব্রজবুলি সাহিত্যের বিকাশ শুরু হয় প্রধানতঃ তিনটি ভাগে সংগীতের আশ্রয়ে। যাঁরা সৃষ্টি করেছিলেন তাঁরা নিশ্চয়ই ব্রজবুলি নামকরণ করে সৃষ্টি করেননি—তাঁদের সৃষ্টি ছিল কাব্য-প্রয়োজনে, সংগীতের তাগিদে। ঈশ্বর গুপ্তের সূত্রেই 'ব্রজবুলি' নামটি প্রথম পাওয়া গেল ; কিন্তু এ নাম যিনিই দিয়ে থাকুন, সার্থক তাঁর নামকরণ ; কারণ মনে হয় এ ভাষার আশ্রয় না নিলে হয়ত-বা কীর্তন এত সুসমৃদ্ধ হয়ে উঠতে পারত না, চর্যাপদের মতো অবলুপ্ত সংগীতের পর্যায়েই পড়ে থাকত। গবেষকদের সূত্রে পাওয়া যায়, ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীতে নেপাল, তীরহুত, মোরঙ্গ-এর রাজসভায় এ ভাষার সৃষ্টি হয় এবং সেই সময় বঙ্গদেশের কবি ও সাহিত্যিকগণ ঐ অঞ্চলে যেতেন এবং সাদর অভ্যর্থনা পেতেন। সেখানে তাঁরা দেবলীলা বিষয়ক নানা রচনা করে রাজন্যবর্গকে সন্তুষ্ট করতেন। সেই সূত্রেই ব্রজবুলি সমগ্র পূর্ব অঞ্চলে সাহিত্যের ভাষা রূপে আত্মপ্রকাশ করল। ভাষার মধ্যে একটা মাদকতা আছে, অনুরণন আছে এবং ছন্দের ঝংকার আছে—সেজন্যই ব্রজবুলি ভাষায় লিখিত পদগুলি

সহজেই আসর জমিয়ে দেয়। এ ভাষা নিয়ে অবশ্য এখনও অনেক গবেষণা চলছে। তবে যে যাই বলুক, ভাষাটি কৃত্রিম এবং সেজন্য এর ব্যাকরণ-বন্ধনও কিছুটা শিথিল। অবশ্য প্রথমাবস্থায় মৈথিলী ভাষার ধ্বনি, সৌন্দর্যের সঙ্গে এ ভাষাটি মিশ্রিত হওয়ায় আকর্ষণ অনেক বেড়ে গেছে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। তা ছাড়া ব্রজবুলির শব্দঝংকারে যে ধরনের প্রস্বন প্রয়োগ হয়ে থাকে তাতে মৃদঙ্গের তালের ঝোঁকের অপূর্ব সংগতি হয়, আর ন, ম, ং, ঙ, ঞ ইত্যাদি অনুনাসিক বর্ণের প্রয়োগাধিক্য থাকার দরুন সাংগীতিক প্রয়োগে স্বাভাবিক ভাবেই উপযোগী। এতদ্ভিন্ন তৎসম শব্দ বা যে-কোন ধরনের বিদেশী শব্দেরও অবাধ অনুপ্রবেশ ঘটানো সম্ভব হওয়ায়, শব্দ-সম্ভার বৃদ্ধি হয় এবং রচনাশৈলীর পরিবর্তন সম্ভব হয়।

প্রাক্‌চৈতন্যযুগ

অতি প্রাচীন কালে অবহট্‌ঠ ভাষায় শ্রীকৃষ্ণলীলা-বিষয়ক পদ রচিত হয়েছিল, কিন্তু সেগুলি কীর্তনের কতটা উপযুক্ত তা প্রমাণ করা যায় নাই। তবে রাধাকৃষ্ণলীলা-বিষয়ক কোমলকান্ত পদাবলীর প্রথম প্রণেতা কবি জয়দেব বাংলার হ'লেও তাঁর অমর কাব্য গীতগোবিন্দ লিখিত হয় সংস্কৃতে, কিন্তু ভাষা-বৈশিষ্ট্য বিচার করলে তার মধ্যেও প্রাচীন অবহট্‌ঠ ভাষার ছাপ পাওয়া যায়। জয়দেবের পরেও রাধাকৃষ্ণলীলা-বিষয়ক অনেক নাটক ও গান সংস্কৃতে রচিত হয়েছে যেমন, শ্রীরূপ গোস্বামীর বিদগ্ধমাধব, ললিতমাধব নাটক, পদাবলীর গান, দানকেলি-কৌমুদী ইত্যাদি—কবি কর্ণপুরের চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক, গোবিন্দবল্লভ নাটক ইত্যাদি। কিন্তু আঞ্চলিক ভাষার মধ্যে সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক গান রচনা করেন কবি বড়ু চণ্ডীদাস। পুঁথিটি আবিষ্কার করেন বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয় বাঁকুড়া জেলার কাঁকিল্যা গ্রাম থেকে এবং তিনিই গ্রন্থটিকে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নামে প্রথম প্রকাশ করেন। পুঁথি আবিষ্কৃত হয় ১৬৮২ খৃষ্টাব্দে; কিন্তু এটির রচনাকাল সম্পর্কে আজও কোন নির্দিষ্ট মতে পৌছানো সম্ভব হয়নি। তবে এটি যে প্রাক্‌চৈতন্যযুগের এ বিষয়ে সন্দেহ নাই, কারণ শ্রীচৈতন্যদেব এ পদাবলী আস্বাদন করতেন। পুঁথির গীত-প্রকৃতি পরীক্ষা করে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও নির্দ্বিধায় বলেছেন যে, এ গ্রন্থ ১৩৮৫ খৃষ্টাব্দের পূর্বে কোন সময়ে রচিত হয়েছে।

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' গ্রন্থটি কীর্তনগানের জন্যই রচিত, কারণ গানগুলিতে একটা কীর্তনসুলভ ঝংকার আছে—আর এই কাব্যের মধ্যেই পাহাড়ী রাগ, গৌরী রাগ, মালবশ্রী রাগ ইত্যাদি বিভিন্ন রাগেরও উল্লেখ আছে। কাব্যের রচনাশৈলীতে সমকালীন নাট্যসংগীতের ছাপ খুবই সুস্পষ্ট। সমকালীন কৃষ্ণ-বিষয়ক গান বলতে উত্তরবঙ্গের জাগ গান, রাঢ়বঙ্গের ঝুমুর গান,

আসামের কৃষ্ণলগান বা কৃষ্ণযাত্রার বিভিন্ন পালার গান—যেমন কৃষ্ণের মাছ-ধরা, রাধার শাক-তোলা, কৃষ্ণকালী, কলংকভঞ্জন, কালিয়দমন ইত্যাদি। এগুলিতে ছিল লোকসংগীতের প্রভাব এবং নাটকীয়তা। চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন অপেক্ষাকৃত পরিশীলিত, কারণ এ রচনার উপর একদিকে যেমন কবি জয়দেবের রচনার প্রভাব, অন্যদিকে কৃষ্ণবিষয়ক শাস্ত্রগ্রন্থাদির প্রভাব তাছাড়া চণ্ডীদাস নিজেও সংস্কৃত সাহিত্যে পণ্ডিত ছিলেন, কারণ তাঁর রচিত অনেক সংস্কৃতশ্লোক সেই গ্রন্থে আছে। তবে রচনার ছন্দে কতকগুলি নিরর্থক শব্দ প্রয়োগ করেছেন, তা থেকে অনেকসময় যাত্রাগানের মতো অংগভঙ্গির সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। যেমন :

"যবে রাধা গোআলিনী পাতাল কৈল গাএ
হে হে লহে লহে।
তবে হিঅ হিঅ বুলি কাহ্ন বাহে নাত্র
হে হে লহে লহে॥"—ইত্যাদি।

এ কাব্যটিতে প্রধান চরিত্র তিনটি, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধা ও বড়াই। বড়াই হ'লেন বুড়ীমাই স্বরূপত যিনি যোগমায়া, যাঁর আশ্রয় ছাড়া লীলা সম্পাদন হয় না। এঁদের মধ্যে শ্রীরাধার চরিত্র-চিত্রণকে মূল কর্তব্য মনে করে প্রাকৃত জগতের নায়ক-নায়িকার ধারণার ভিত্তিতে অনেকটা সহজ ও সরলভাবে ভাষা-মাধুর্যের আচ্ছাদনে কাব্যটিকে রচনা করেছেন, নিতান্ত কাব্যের জন্যই। ভাগবত-পুরাণাদি থেকে উপকরণ আহরণ করে কবিপ্রতিভার সাহায্যে বিচিত্র আখ্যায়িকার মধ্য দিয়ে রাধাকৃষ্ণ-বিরহের যে রূপক আলেখ্য রচনা করেছেন তা পরবর্তীকালে রসিক শ্রোতা ভক্ত-বৈষ্ণবগণের বিশেষ আস্বাদ্য হয়েছে। পরবর্তীকালের লীলাপ্রসংগ রচনার মধ্যে কবিগণ যে আধ্যাত্মিকতার গুরুত্ব এনে দিয়েছেন, বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যে তার যথেষ্ট অভাব। অবশ্য প্রাক্‌চৈতন্যযুগের কবিদের অনেকের ক্ষেত্রেই এই কথাটি প্রযোজ্য। কাহিনী-প্রকরণ বা ভাষা-সংগঠন যথেষ্ট রসসমৃদ্ধ। গ্রন্থটিকে কয়েকটি খণ্ডে ভাগ করা হয়েছে কয়েকটি ভিন্ন ভিন্ন লীলা বর্ণনা করার জন্যই। জন্মখণ্ডে কৃষ্ণের পূর্বরাগ ও বাসনা সঞ্চার এবং বড়াইকে দিয়ে প্রেমের অভিজ্ঞান-স্বরূপ কর্পূর-তাম্বুল পুষ্প প্রেরণ, রাধা কর্তৃক প্রত্যাখ্যান ও বড়াইর লাঞ্ছনা। দানখণ্ডে—শ্রীকৃষ্ণের দানী সেজে দান অর্থাৎ মাশুল আদায়ের ছল করে শ্রীরাধার যৌবন-সম্ভোগ প্রার্থনা। নৌকাখণ্ডে—কৃষ্ণের নৌকাবিলাস এবং গোপীদের সংকটে নিক্ষেপ ও উদ্ধার। ভারখণ্ডে ও ছত্রখণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক রাধার দধিদুগ্ধের পসরা বহন এবং ছত্রধারণ। বৃন্দাবন খণ্ডে—বড়াইর পরামর্শে কৃষ্ণকে লাভ করার জন্য শ্রীরাধার বৃন্দাবন যাত্রা বা অভিসার। কালিয়দমন খণ্ডে—কৃষ্ণের কালীদহে নিমজ্জন ও রাধার বেদনা। বাণখণ্ডে—পঞ্চশরে বিদ্ধ হয়ে কৃষ্ণকে লাভ করবার জন্য শ্রীরাধার হৃদয়-ব্যাকুলতা। বংশীখণ্ডে কৃষ্ণের দূরাগত বংশীধ্বনি

শুনে চিত্তব্যাকুলতা ও রাধা কর্তৃক কৃষ্ণের বাঁশী হরণ। রাধা-বিরহ খণ্ডে কৃষ্ণোন্মুখী রাধার সঙ্গে দয়িত কৃষ্ণের মিলন, তারপর কৃষ্ণের আকস্মিক অন্তর্ধান —এমন বিচিত্র কাহিনী ইতিপূর্বে আর রচিত হয় নাই। এই সরস কাব্যের সূত্র ধরেই পরবর্তীকালে শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ, শ্রীরাধার পূর্বরাগ, দানলীলা, নৌকা-বিলাস, অভিসার ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য কীর্তনের পালাগুলির সৃষ্টি হয়েছে। চণ্ডীদাসের রচনাই বাংলায় পদাবলী যুগের প্রধান উদ্দীপনা ও উৎকর্ষ হয়ে দাঁড়ায়।

পরবর্তী বা সমসাময়িক শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক শ্রেষ্ঠ কাব্য বর্ধমানের কুলীন গ্রাম নিবাসী মালাধর বসুর রচিত শ্রীকৃষ্ণবিজয় বা গোবিন্দমঙ্গল কাব্য। গ্রন্থ-রচনা শুরু হয় ১৪৭৪ খৃষ্টাব্দে, সমাপ্ত হয় ১৪৮০ খৃষ্টাব্দে। এই মালাধর তৎকালীন গৌড়ের বাদশাহ্ রুকণুদ্দিন বরবক শাহের কাছ থেকে গুণরাজ খান উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধান্তর্গত শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা-বিষয়ক উপাখ্যানগুলির তিনি বর্ণনা করেন। কাব্যটি অন্যান্য শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক কাব্যের মতো আদি রসাত্মক নয়। তিনটি কাহিনীতে সমগ্র গ্রন্থটিকে ভাগ করা হয়েছে :

১। আদি কাহিনী—কৃষ্ণজন্ম থেকে মথুরাগমন পর্যন্ত,

২। মধ্য কাহিনী—কংসবধ থেকে দ্বারকাগমন পর্যন্ত, এবং

৩। অন্ত্য কাহিনী—দ্বারকা ধ্বংস এবং তনুত্যাগ। এটিকেই কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক প্রথম বাংলাকাব্য বলে মনে করা হয় এবং এই মালাধরই ছিলেন মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের পথিকৃৎ। তাঁর এ গ্রন্থ বৈষ্ণবসমাজে যথেষ্ট আদর পেয়েছিল, পরবর্তী সময়ে তাঁরই পুত্র সত্যরাজ খান উড়িষ্যায় গিয়ে চৈতন্যদেবকে গ্রন্থখানি দেখান এবং চৈতন্যদেব খুবই প্রশংসা করেন। কুলীনগ্রাম সম্পর্কে চৈতন্যদেবের বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল ; তিনি বলেছেন—

"কুলীনগ্রামের অধিবাসী যে হয় কুকুর।
সেহো মোর প্রিয় অন্যজনে বহুদূর ॥" —চৈতন্যচরিতামৃত

মালাধরের রচনার মধ্যে একটি সাবলীল ছন্দ ছিল। যেমন—

"যমুনার কূলে যবে বংশীতে দেহ সান।
ফিরিয়া যমুনা নদী বহই উজান ॥
কদম্বের তলে যবে বংশীনাদ দিল।
তা শুনি ময়ূরপক্ষ নাচিতে লাগিল ॥
শুখান যতেক বৃক্ষ ছিল বৃন্দাবনে।
বংশীর নাদে ফুল ধরে তরুগণে ॥"—ইত্যাদি

বঙ্গদেশে বাংলাভাষা প্রভাবিত ব্রজবুলি ভাষার প্রথম রচয়িতা হিসাবে ধরা হয় যশোরাজ খানকে। তিনি শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক, কাটোয়ার নিকট শ্রীখণ্ড

গ্রামে বৈদ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন, অর্থাৎ শ্রীনরহরি সরকার যে পরিবারের লোক সেই পরিবারেই যশোরাজ খানের জন্ম। তাঁর রচিত বেশী পদ পাওয়া যায় না। বাংলার মাটিতে ব্রজবুলিতে রচিত প্রথম পদটি হ'ল—

"এক পয়োধর চন্দনে লেপিত
আরে সহজই গোর।
হিম ধরাধর কনক ভূধর
কোলে মিলল জোর॥
মাধব, তুয়া দরশন কাজে।
আধ পদ চারি করত সুন্দরী
বাহির দেহলি মাঝে॥
ডাহিন লোচন কাজরে রঞ্জিত
ধরল রহল বাম।
নীল ধবল কমল যুগলে
চাঁদ পূজল কাম॥
শ্রীযুত হুসন জগত ভষণ
সোই ইহ রস জান।
পঞ্চ গৌড়েশ্বর ভোগ পুরন্দর
ভনে যশোরাজ খান॥"

—শ্রীরাধার অভিসার পর্যায়ের 'বিভ্রম' অবস্থায় একটি অপূর্ব বৃত্তান্ত।

প্রাক্‌চৈতন্যযুগের শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক সরস কাব্যরচয়িতার মধ্যে ভবানন্দ রায়ের পুত্র রামানন্দ রায়। তিনি ছিলেন উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্রের অধীনে বিদ্যানগর অর্থাৎ দাক্ষিণ ভারতের বিজয়নগরের অধিপতি। তিনি যেমন ছিলেন বিত্তশালী তেমন ছিলেন শাস্ত্র ও সাহিত্য বিষয়ে পণ্ডিত। তাঁর রচিত সংস্কৃত কাব্যাদি রায়ের নাটকগীতি বলে পরিচিত এবং চৈতন্যদেব সে সব গীতি রাত্রিদিন আস্বাদন করতেন। পুরীতে রাজপণ্ডিত সার্বভৌম ভট্টাচার্য, চৈতন্যদেবের শাস্ত্রজ্ঞানের কাছে নতি-স্বীকার করার পরে মহাপ্রভুকে রায় রামানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে অনুরোধ করেন। সেখানে যেয়ে তিনি দেখতে পান যে, পাইক-বরকন্দাজ পরিবৃত হয়ে পাল্কীতে চড়ে রায় রামানন্দ অত্যন্ত অভিমানী পুরুষ গোদাবরী নদীতে স্নান করতে এসেছেন। মহাপ্রভু তাঁর সঙ্গে নানাভাবে অধ্যাত্ম-তত্ত্ব আলোচনা করেন প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে। এটি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে রায় রামানন্দ সংবাদ হিসাবে একটা বিখ্যাত অধ্যায় বলে গণ্য হয়েছে। সর্বশেষে তাঁকেই প্রথম গোদাবরীর তীরে শ্রীচৈতন্যদেব তাঁর ঐশ্বর্যপূর্ণ রূপ প্রকট করে দেখিয়েছিলেন। সেই রূপ দেখে রামানন্দ বলেছিলেন—

"পহিলে দেখিল তোমা সন্ন্যাসী স্বরূপ।

অয়ে তোমা দেখি মুঞি শ্যাম গোপরূপ ॥
তোমার সম্মুখে দেখি কাঞ্চন পঞ্চালিকা।
তার গৌরকান্ত্যে তোমার সর্ব অঙ্গ ঢাকা ॥
তাহাতে প্রকট দেখি সবংশীবদন।
নানা ভাবে চঞ্চল তাহে কমল নয়ন ॥
এই মত তোমা দেখে হয় চমৎকার।
অকপটে কহ প্রভু কারণ ইহার ॥"—চৈতন্যচরিতামৃত

এই রামানন্দ ছিলেন একজন সাহিত্যস্রষ্টা এবং দক্ষিণাঞ্চলে তিনিই প্রথম ব্রজবুলি ভাষায় রাধাকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গের পদ রচনা করেন। এগুলি মহাপ্রভুর আস্বাদ্য পদের মধ্যে প্রধান এবং তার একটিমাত্র ব্রজবুলি পদ পাওয়া যায়। সেটি হ'ল মান পর্যায়ের দূতীর প্রতি শ্রীরাধার উক্তি—

"পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ্যা ভেল।
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল ॥
না সো রমণী না হাম রমণী।
দুঁহু মন মনোভব পেশল জানি ॥
না খোজলুঁ দূতী না খোজলুঁ আন।
দুঁহুঁক মিলনে মধত পাঁচবাণ ॥
এ সখি সে সব প্রেম কাহিনী।
কানুঠাম কহবি বিছুরল জনি ॥
অব সোই বিরাগ তুঁহু ভেলি দূতী।
সুপুরুখ প্রেমকি ঐছন রীতি ॥
বর্দ্ধন রুদ্র নরাধিপ জান।
রামানন্দ রায় কবি ভাণ ॥"

প্রাক্‌চৈতন্যযুগের রাধাকৃষ্ণলীলা-বিষয়ক কাব্যস্রষ্টাদের অন্যতম মিথিলার কবি বিদ্যাপতি। মৈথিলী সংশ্লিষ্ট ব্রজবুলি ভাষায় অনন্যসাধারণ রচনার সূত্রে তিনি রসসাহিত্যের আদি পর্যায়ের শ্রেষ্ঠতম প্রবক্তা হিসাবে নিজেকে স্থাপন করতে পেরেছিলেন। তিনি ছিলেন স্মার্ত ব্রাহ্মণ, স্মৃতিশাস্ত্রে জ্ঞানী। এ ব্যক্তি বৈষ্ণব ছিলেন না, পরন্তু শিব, দুর্গা, সূর্য ইত্যাদি দেবদেবীর পূজক ছিলেন তিনি। কিন্তু এটাই আশ্চর্যের কথা, তাঁরই সূত্রে যে প্রেমসাহিত্যের বিকাশ হ'ল তাদ্বারা সংপৃক্ত হয়ে পরবর্তীকালে বৈষ্ণবের একান্ত সাধনার বিশেষ উপকরণ সৃষ্টি হ'ল এবং প্লাবনের মতো সমস্ত বাংলাদেশকে ভাসিয়ে দিল। সম্ভবতঃ ১৩০৭ শকে অর্থাৎ ১৩৮৫ খৃষ্টাব্দে চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের এক শত বৎসর পূর্বে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। অল্পবয়স থেকেই তিনি কাব্যরচনায় প্রবৃত্ত হন এবং অষ্টাদশ বৎসর বয়সের মধ্যে অনেক রসগীত রচনা করেছেন। তাঁর একটি পদে

পাওয়া যায়—

"বিধুর নিকটে বসি নেত্র পক্ষ বাণ।
নবহু নবহু রসগীতে পরমাণ॥"

অর্থাৎ ১৩২৫ শকের মধ্যেই তিনি নূতন নূতন রসসমৃদ্ধ পদ রচনা করেছেন। তিনি ছিলেন রাজা শিবসিংহের সভাকবি এবং তাঁর কবিত্বশক্তির জন্য ১৩৩০ শকে অর্থাৎ ১৪০৮ খৃষ্টাব্দে 'বিসফী' নামক গ্রামটি উপহারস্বরূপ পান। 'কীর্ত্তিলতা', 'গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী' ইত্যাদি বিভিন্ন গ্রন্থ তিনি রচনা করেছেন। তিনি ছিলেন সঙ্গীততত্ত্ববিদ্; একজন সুগায়ক। মিথিলায় একটি-বিশেষ সঙ্গীত-ধারা তাঁরই সূত্রে প্রবর্ত্তিত হয়, আর তাঁর সঙ্গীতজ্ঞানের জন্যই তাঁর রচিত এবং সুরারোপিত গানগুলি রসোত্তীর্ণ হয়ে জগতের বুকে চিরন্তন হ'য়ে বেঁচে আছে। চৈতন্যপার্ষদ অদ্বৈতাচার্য তীর্থভ্রমণ করে ফিরবার পথে যখন মিথিলায় গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন তখন তাঁর সঙ্গে সম্ভবতঃ ১৩৮০ শকে বিদ্যাপতির সাক্ষাৎ হয়। ঈশান নাগরের অদ্বৈতপ্রকাশ গ্রন্থেই অবশ্য বিদ্যাপতির নামের উল্লেখ আছে এবং অন্যত্র পাওয়া যায় গান শুনে মুগ্ধ হয়ে অদ্বৈতাচার্য গায়ক বিদ্যাপতিকে তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তার উত্তরে তিনি বলেছিলেন—

"বিপ্র কহে মোর নাম দ্বিজ বিদ্যাপতি।
রাজান্ন ভোজনে মোর বিষয়েতে মতি॥
বাতুলতা করি মুঞি রচিনু এগীত।
সারগ্রাহী সাধু তুঁহু তেঁই ইথে প্রীত॥
তোমা আকর্ষিতে শক্তি ধরে কোনজনে।
নিজগুণে হইল মোর উদ্ধার সাধনে॥"

—অদ্বৈতপ্রকাশ

অদ্বৈতাচার্য প্রত্যুত্তরে বলেছিলেন—

"অদ্ভুত তোমার রচিত এ গীতামৃত।
জীব কোন ছাড় কৃষ্ণ হয় আকর্ষিত॥
ভাগ্যে মোর প্রতি কৃষ্ণ দয়া প্রকাশিল।
তেঁই পদকর্তা বিদ্যাপতির সঙ্গ হইল॥" —অদ্বৈতপ্রকাশ

মিথিলার এ রচনা-সম্ভার ক্রমশঃ বঙ্গদেশে ছড়িয়ে পড়ল, কারণ তখন মিথিলা ন্যায়শাস্ত্রের একটি পীঠস্থান। উত্তর বঙ্গ এবং রাঢ় বঙ্গের পড়ুয়াগণ অনেকেই তখন মিথিলায় যেতেন শাস্ত্রশিক্ষা করতে, এবং সেইসূত্রে কৃষ্ণ-বিষয়ক এসব গান শিক্ষা করে আসতেন। পরে বিদ্যাপতির আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বাংলা-দেশে অনেক পদরচয়িতা সৃষ্টি হয়েছেন। তার মধ্যে কেউ কেউ নিজেকে বিদ্যাপতি নামে পরিচিতও করেছেন—যেমন ছিলেন, শ্রীখণ্ডের রঘুনন্দন আচার্যের একজন শিষ্য কবিরঞ্জন; তিনি বিদ্যাপতি নাম নিয়েছিলেন।

"ছোট বিদ্যাপতি বলি যাঁহার খেয়াতি।
যাঁহার কবিতা গানে ঘুচয়ে দুর্গতি ॥"

তা ছাড়া বিদ্যাপতির একজন শ্রেষ্ঠ অনুকারক পরবর্তীকালের শ্রেষ্ঠ পদকর্তা গোবিন্দদাসকে বলা হ'ত দ্বিতীয় বিদ্যাপতি।

"ব্রজের মাধুরী লীলা যা শুনি দরবে শিলা
গাইলেন কবি বিদ্যাপতি।
তাহা হইতে নহে ন্যূন গোবিন্দের কবিত্বগুণ
গোবিন্দ দ্বিতীয় বিদ্যাপতি ॥"

গোবিন্দদাস বিদ্যাপতিকে কেবল অনুকরণই করেন নাই, বিদ্যাপতির অনেক পদের পাদপূরণও তিনি করেছেন। যেমন—

"প্রেমকি অংকুর আত জাত ভেল
ন ভেল যুগল পলাশা।"

এ পদটির শেষ চরণটি হ'ল :

"বিদ্যাপতি কহ নিকরুণ মাধব
গোবিন্দদাস রসপুর ॥"

বিদ্যাপতির রচনাতে প্রাকৃত রসের প্রভাব বেশী—এ কথা সত্য, কিন্তু সমস্ত রচনার মধ্যে অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মতো যে ভক্তিবাদ তথা বৈষ্ণববাদের সংস্কার রয়ে গেছে তা অস্বীকার করা যায় না। ভাবময় তার কাব্য, কিন্তু ভাবের উচ্ছ্বাসকে যথোচিত সংযত করে কি-ভাবে কাব্যসম্পুটে আবদ্ধ রাখা যায় তার যথার্থ নিদর্শন হ'ল বিদ্যাপতির পদাবলী।

শ্রীচৈতন্যযুগ

চৈতন্যদেবের সমসাময়িক পদস্রষ্টাদের মধ্যে একজন ছিলেন মুরারি গুপ্ত। তিনি ছিলেন প্রথম করচাগ্রন্থ-প্রণেতা। তাঁর জন্মভূমি ছিল শ্রীহট্টে; কিন্তু নবদ্বীপে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহপাঠী এবং প্রিয়সখা ছিলেন। তিনি রাধাকৃষ্ণলীলা-বিষয়ক কিছু পদ লিখেছিলেন। সেই দুষ্প্রাপ্য পদগুলির একটি নিম্নরূপ—

"কি ছার পিরিতি কৈলা জীয়ন্তে বধিয়া আইলা
বাচিতে সংশয় ভেল রাই।
সফরি সলিল বিন গোয়াইব কতদিন
শুন শুন নিঠুর মাধাই ॥
ঘৃত দিয়া এক রতি জ্বালি আইলা যুগবাতি
সে কেমনে রহে অযোগানে।
তাহে সে পবনে পুন নিভাইল বাসো হেন
ঝাট আসি রাখহ পরাণে ॥

বুঝিলাম উদ্দেশে　　সাক্ষাতে পিরিতি তোষে
স্থান ছাড়া বন্ধু বৈরী হয়।
তার সাক্ষী পদ্ম ভানু　　জল ছাড়া তার তনু
শুখাইলে পিরিতি না রয়॥
যত সুখে বাড়াইলা　　তত দুখে পোড়াইলা
করিলা কুমুদবন্ধু ভাতি।
গুপ্ত কহে এক মাসে　　দ্বিপক্ষ ছাড়িল দেশে
নিদানে হইল কুহুরাতি॥"

—মাথুরের এটি একটি প্রসিদ্ধ একতালি গান। ফটিক চৌধুরীর মুখে এ গানটি সবচেয়ে ভাল হ'ত বলে শোনা যায়।

চৈতন্যোত্তর যুগের পদাবলী সাহিত্য

শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক বা চৈতন্যোত্তর যুগের পদ-রচয়িতাদের মধ্যে অন্যতম প্রচেষ্টাই ছিল শ্রীচৈতন্যের তৃপ্তি উৎপাদন, সেজন্যই পরবর্তী যুগের গানগুলিতে আধ্যাত্মিক চেতনার প্রতিফলন বেশী। রাধাকৃষ্ণলীলা একটি অপ্রাকৃত প্রকটন, সর্বার্থপ্রেমবিলাস, কেবলমাত্র কৃষ্ণসুখ লালসা নিবৃত্তির উদ্দেশ্যেই রচিত—এমন সত্যগুলি প্রকাশিত হয়েছে চৈতন্যোত্তর যুগের কবিদের লেখনীতে। পরিকরগণের মনে যখন শ্রীচৈতন্যে ভগবত্তা বুদ্ধি এল, তারপর থেকে চৈতন্য-বিষয়ক রচনাতেও সকলে প্রবৃত্ত হলেন। লক্ষণীয় বিষয় এই যে, প্রাক্‌চৈতন্য যুগের মধ্যেও যেমন একটা নাটকীয় সংকল্প ছিল, চৈতন্যোত্তর যুগের লীলাপ্রসঙ্গ রচনাগুলির মধ্যেও অনুরূপ নাটকীয়তা আছে। এমনকি সমগ্র রসশাস্ত্র বিচারের প্রকরণ ক্ষেত্রটিও অনেকটা নাটকের আঙ্গিক বিচারের মতো—নায়ক, নায়িকায় ভাবপ্রকরণ বিশ্লেষণের অনুরূপ। তবে পূর্বে যেমন প্রাকৃত দৃষ্টিভঙ্গী বা লৌকিক আচরণের প্রভাবই বেশী পরিলক্ষিত হ'ত, চৈতন্যোত্তর যুগে তা অন্তর্হিত হ'ল, কারণ এবিষয়ে চৈতন্যদেব স্বয়ং দৃষ্টিপাত করেছিলেন এবং রাধাকৃষ্ণ বিষয়নির্ভর বৈষ্ণব-শাস্ত্রাদি রচনার দায়িত্ব দিয়েছিলেন ছয়জন বিশিষ্ট ব্যক্তির উপর। তাঁদের নাম:

"জয়রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ॥"

অর্থাৎ শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট, শ্রীজীব, শ্রীগোপাল ভট্ট এবং শ্রীরঘুনাথ দাস। পরবর্তীকালে এঁরাই ষড়্‌-গোস্বামী নামে প্রসিদ্ধ হলেন। রসশাস্ত্রের বিভিন্ন গ্রন্থ তাঁরা রচনা করলেন—যেমন উজ্জ্বলনীলমণি, ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু, দানকেলি কৌমুদী, বিদগ্ধমাধব, ললিতমাধব, আনন্দবৃন্দাবন চম্পু, গোপাল চম্পু, গোবিন্দলীলামৃত, বৃহৎভাগবতামৃত, হরিভক্তিবিলাস ইত্যাদি। এসব গোস্বামীগ্রন্থের সূত্রে তত্ত্ব-বিষয়ক ধারণা সুস্পষ্ট হ'ল এবং সকলের

ভজনানুরাগ বৃদ্ধি হ'ল। সে-সূত্রে রচনার সরসতা বৃদ্ধি পেল, নানাবিধ লীলা স্ফুরিত হ'তে শুরু করল এবং গানেরও নূতন ভঙ্গী সংযোজিত হ'ল। রচনাগুলি তৎকালীন সমাজের বিজ্ঞ বৈষ্ণবশ্রোতাগণ শুনে যদি অনুমোদন করতেন, তবে তা প্রচারের জন্য ব্যবহৃত হ'ত এবং পুঁথি আকারে রক্ষিত হ'ত। সে-সূত্রেই কিছু কিছু পুঁথি পরবর্তীকালে আবিষ্কৃত হয়েছে। গোস্বামীদের প্রণীত এসব রসশাস্ত্র বা আচরণবিধিগুলি সবই ছিল সংস্কৃতে লেখা, ফলতঃ নীচু শ্রেণীর জনসাধারণের পক্ষে অনুধাবন করা-অসুবিধা, সেজন্য টীকাকারগণ টীকা প্রবর্তন শুরু করলেন, বক্তৃতার মাধ্যমে বুঝিয়ে দিতে শুরু করলেন এবং আরও পরবর্তীকালে রসকল্পবল্লী-প্রণেতা রামগোপাল দাস প্রমুখের সময় থেকে বাংলায় অনুবাদও শুরু হ'ল। কাব্যরচনার ব্যাপারে সাহিত্যের বা ব্যাকরণের বিধিরক্ষা থেকেও রসের নিয়ম রক্ষা করা একান্ত আবশ্যক বলে গণ্য হ'ল। কারণ রসাভাষদুষ্ট গান বা কাব্য শোনাও অপরাধ, কারণ তাতে কৃষ্ণভক্তি অন্তর্হিত হয়।

নরহরি সরকার

পরবর্তীকালের পদরচয়িতার সংখ্যা বহু, কিন্তু তাদের মধ্যে যে-সব কবির রচিত গানগুলি বহুদিন পর্যন্ত, এমনকি আজ পর্যন্তও প্রচলিত আছে, তাঁরা সকলেই স্মরণযোগ্য—তবে তার মধ্যে ছিলেন নরহরি সরকার, যিনি চৈতন্যদেবের সমসাময়িক। সম্ভবত ১৪৭৮ খৃষ্টাব্দে বর্ধমান জেলার কাটোয়ার নিকটবর্তী শ্রীখণ্ড গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম নারায়ণ সরকার। নরহরি ছিলেন ব্রজলীলার মধুমতী, পরবর্তীকালে তিনি সরকার ঠাকুর বলে পরিচিত। তিনিই হলেন বাংলাভাষায় গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদরচনার আদি প্রবর্তক। তা ছাড়া তিনি 'ভক্তিচন্দ্রিকা পটল' ও 'ভক্তামৃত অষ্টক' নামে দুটি ভক্তিগ্রন্থ প্রকাশ করেন। সরকার ঠাকুরের পদগুলি খুবই রসাল, কিন্তু পদগুলি খুবই লম্বা এবং এগুলি চৈতন্যমঙ্গল গানের জন্যই বেশী উপযুক্ত ছিল বলে মনে হয়। এজন্যই সম্ভবত পরবর্তীকালের পদাবলী গায়কদের মুখে বা কোন পালাপ্রকরণে এসব গানের প্রয়োগ বেশী পাওয়া যায় না। নরহরি চক্রবর্তী প্রণীত ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে যে-কোন বিষয়ে বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে সরকার ঠাকুরের বহু উল্লেখ করা হয়েছে, দীনবন্ধু দাসের পদাবলী সংকলনে বহু পদ আছে, তা ছাড়া 'শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব' গ্রন্থে প্রায় সমস্ত পদাবলী মুদ্রিত হয়েছে। শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক কালে শ্রীখণ্ড ছিল কীর্তনপ্রচারের একটি মূলকেন্দ্র। এখানে একদিকে ছিলেন সরকার ঠাকুর, রঘুনন্দন আচার্য, লোচনদাস, সেইসঙ্গে সংযুক্ত থাকতেন কাঁদড়ার জ্ঞানদাস, জাজীগ্রামের শ্রীনিবাস আচার্য, কাটোয়ার গদাধর দাস প্রমুখ ব্যক্তিগণ। শ্রীপাট শ্রীখণ্ডের এই কীর্তনের সংস্কার কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত, অর্থাৎ গৌর-

গুণানন্দ ঠাকুর মহাশয়ের জীবদ্দশা পর্যন্ত প্রায় বিশেষভাবে ধরে রাখা ছিল। কীর্তন বাদ্য ইত্যাদি অনুশীলনের সুযোগ করে দেওয়া হ'ত। ঠাকুর মহাশয় অর্থাৎ গৌরগুণানন্দ ঠাকুর মহাশয় বিভিন্ন গায়কদের সূত্র থেকে গান সঞ্চয় করতেন এবং নিজে সকলকে গান শেখাতেন, তার সংগে সর্বশেষ বাদক হিসাবে ছিলেন সুরেন কবিরাজ মহাশয়।

বাসুদেব ঘোষ

শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক অন্যান্য গৌরপদরচয়িতাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন বাসু ঘোষ।

"শ্রীবাসুদেব ঘোষে বন্দিব সাবধানে।
গৌরগুণ বিনা সেই অন্য নাহি জানে॥"

বাসুদেব ঘোষের আরেক ভ্রাতা গোবিন্দ ঘোষ শ্রীচৈতন্যদেবের সেবক ছিলেন, কিন্তু মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষের 'অমিয় নিমাই চরিত' গ্রন্থের সূত্রে পাওয়া যায় যে কিঞ্চিৎ হরিতকি সঞ্চয় জনিত অপরাধের দরুন শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁকে পরিত্যাগ করেছিলেন; তাঁকে বিবাহ করে সংসার করতে আদেশ দিলেন এবং সেই কথামতো তিনি অগ্রদ্বীপে বসবাস করেন। এইখানেই গোবিন্দের প্রতিষ্ঠিত গোপীনাথ বিগ্রহ গোবিন্দের শ্রাদ্ধাদিকর্ম প্রতিবছর করে থাকেন। বৈষ্ণব-বন্দনায় উক্ত আছে:

"গোবিন্দ ঘোষ ঠাকুর বন্দো সাবধানে।
যার নাম সার্থক প্রভু করিলা আপনে॥"

বাসুদেব ঘোষের অপর ভ্রাতা মাধব ঘোষ কীর্তনীয়া ছিলেন অত্যন্ত সুমার্জিতকণ্ঠ, উচ্চ সপ্তকের গানে পারদর্শী এবং তাতে কোনদিন তাঁর কণ্ঠ-বিকৃতি হ'ত না।

"বন্দিব মাধব ঘোষ প্রভুর প্রীতিস্থান।
প্রভু যাঁরে করিলা অভংগ স্বরদান॥"

পদাবলী সাহিত্যসূত্রে কয়েকজন মাধবের উল্লেখ পাওয়া যায়; যেমন—১। সংস্কৃত শ্রীকৃষ্ণলীলা-বিষয়ক পদরচয়িতা মাধবেন্দ্র পুরী; ২। চণ্ডীমঙ্গল-প্রণেতা ত্রিবেণীর পরাশর-সুত মাধবনাথ; ২। বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর খুড়তুত ভাই শ্রীকৃষ্ণমংগল-রচয়িতা মাধবাচার্য যাঁর প্রসিদ্ধ একটি পদ হ'ল—ছোট দশকুশী তালের গান:

"সখী কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোই পীরিতি অনুরাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয়॥
কত বিদগধজন রস অনুমগন
অনুভব কাহু না পেখ।

কহ কবিবল্লভ প্রাণ জুড়াইতে
লাখে না মিলল এক ॥"

মাধবাচার্য পরবর্তীকালে কবিবল্লভ নামে বেশ কিছু পদ রচনা করেছেন ; যেমন শ্রীমতী রাধিকার জন্মোৎসব উপলক্ষে লিখিত প্রসিদ্ধ একতালি তালের পদ :

"প্রিয়ার জনম দিবস আবেশে
আনন্দে ভরল তনু।
নদীয়া নগরে বৃষভানুপুরে
উদয় করল জনু ॥"

তিথি-উৎসব উপলক্ষে এ প্রসিদ্ধ গানটি বিভিন্ন ঠাকুরবাড়ীতে আজও একই ভাবে গাওয়া হয়। এমন আরও একটি দাসপ্যারী তালের হোরীলীলা প্রসঙ্গে রচিত গান হ'ল— "সব সখী মেলি ঘেররি
কুঞ্জবনসে' না নিকসে কানাইয়া।"

এই অংশটি গানের ধুয়ার মত। মূল পদটি শুরু হয়- -

"যুথহি যুথ প্রবন্ধ হোয়ল সব
ললিতা বিশাখা আদি করি।
সমুখা সমুখী দুহু ছুটে পিচুকারী মুহু
রঙ্গ গুলাল ভরি ভরি ॥"

অপূর্ব এ গানটিতে বিশেষ ধরনের হোরীর ঠমক পাওয়া যায়। অগ্রদ্বীপের মাধব ঘোষ গায়ক ছিলেন, কিন্তু তাঁর কোন পদ রচনা আছে কিনা সে-বিষয়ে কেউ কেউ সন্দেহ পোষণ করেন। 'রূপাভিসার' পালায় মাধবের ভনিতায় একটি প্রসিদ্ধ গান পাওয়া যায়, অন্য কোন মাধবের রচিত পদের সাহিত্য প্রকৃতির সঙ্গে এ গানটির সামঞ্জস্য নাই, তাই মনে হয় পদটি মাধব ঘোষ বিরচিত। পদটি হ'ল—

সাজল ধনি চন্দ্রবদনী
শ্যাম দরশ আশে।
সঙ্গিনীগণ রঙ্গিণী সব
ঘেরল চারি পাশে ॥
তরুণারুণ চরণ যুগল
মঞ্জীর তাহে শোভে।
ভৃঙ্গাবলী পুঞ্জ পুঞ্জ
গুঞ্জরে মধু লোভে ॥
নবযৌবনী চন্দ্রবদনী
বৃন্দাবন মাঝে।
মাধব চিত রচিত গীত
মিলল নাগর রাজে ॥"

কোন কোন কীর্তনীয়া গানটিকে মাধবেন্দ্রপুরীর পদ বলে পরিচয় দিয়ে থাকেন, কিন্তু পুরী মহারাজের রচিত এমন কোন বাংলা পদ পাওয়া যায় না। এটি তেওট তালের একটি প্রসিদ্ধ গান, তা ছাড়া এ পদটিতে শ্রীমতীর রূপবর্ণনা খুবই অপূর্ব।

বাসুদেব ঘোষের রচনা সবই গৌর-বিষয়ক বলে মনে হয়। শ্রীগৌরাঙ্গের রূপ দেখে তাঁর যে নবানুরাগ হয়েছিল সেই অনুভূতিমূলক বর্ণনা অপূর্ব ভাবে প্রকাশ করেছেন সমতালের দু একটি গানে। যেমন—

১। "গোরা অনুরাগে মোর পরাণ কাতরে।
নিরবধি ছলছল আঁখিজল ঝরে।"

২। "মরমে লেগেছে গোরা না যায় পাসরা।
নয়নে অঞ্জন হয়ে লাগিয়াছে পারা॥
জলের ভিতরে যদি ডুবে দেখি গোরা।
ত্রিভুবনময় গোরাচাঁদ হ'ল পারা॥"

যখন গৌররূপ নয়নের অঞ্জনের মতো হয়ে গেছে তখন চোখ মেলেও গৌর, চোখ বুজেও গৌর, স্থানত্যাগ করেও গৌর, জলে প্রবেশ করেও গৌর। এমন অপূর্ব অনুভূতির সূত্র ধরে প্রায়-সমসাময়িক লেখক যদুনাথ দাস শ্রীকৃষ্ণের রূপানুরক্ত শ্রীমতী রাধিকার অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছেন নীচের পদটিতে :

"অলপ বয়সে মোর শ্যামরসে জরজর
না জানি কি হবে পরিণামে।
যদি নয়ন মুদে থাকি অন্তরে গোবিন্দ দেখি
নয়ন মেলিয়া দেখি শ্যামে॥"

বাহিরে কৃষ্ণরূপ দরশন, অন্তরেও কৃষ্ণরূপ দরশন—তাই স্থানদোষ হয়েছে এমন অনুমান করে শ্রীমতী যখন স্থানত্যাগ করছেন তখন—

"যদি চলে যাই পথে শ্যাম যায় মোর সাথে সাথে
চরণে চরণ ঠেকাইয়া।
ভ্রমেতে ফিরাই আঁখি কেউত সঙ্গে নাহি দেখি
মরে থাকি যেন মুরছিয়া॥"

গানটি মূলতঃ মধ্যম দশকুশী তালের জাতগানের পর্যায়ের একটি গান, বর্তমানে অবশ্য অনেকে ময়ূর-তেওটে গানটি গেয়ে থাকেন। গৌরলীলার অনুভূতি ঢেলে বাসুদেব ঘোষ পয়ার ছন্দে যে সব গান রচনা করেছেন তার বেশীর ভাগ গান এখনও বিশেষ গৌরচন্দ্রিকা হিসাবে গাওয়া হয়ে থাকে। গৌরচন্দ্রিকা গানগুলির সমতালে যে জাতসুরটি আছে তা বাসুদেব ঘোষেরই সৃষ্টি, কারণ তাঁর এই একই ধরনের গানগুলি একই সুরে গাওয়া হয়। লীলা-বর্ণনা-ক্ষেত্রে যা তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন তা-ই নিখুঁতভাবে আতিশয্যমুক্ত হয়ে

সহজ সরল বাংলায় বর্ণনা করেছেন। গানগুলি খুবই সীমিত মাপের আট কিংবা বারোটি চরণে নিবন্ধ, ভাষা-ব্যবহারে কেবল ভাবের ইংগিত দিয়েছেন, যেন পরবর্তী-কালের গায়কগণ ব্যক্তিগত অনুভূতির সাহায্যে বর্ণনাটি বিস্তৃত করতে পারেন।

১। গোষ্ঠলীলার গৌরচন্দ্রিকা :

"আজু রে গৌরাঙ্গের মনে কি ভাব উঠিল।"
ধবলী সাঙলি বলি সঘনে ডাকিল ॥

২। দানলীলার গৌরচন্দ্রিকা :

"আজু রে গৌরাঙ্গের মনে কি ভাব পড়িল।
সুরধুনী তীরে গোরা দান সিরজিল ॥"

৩। রাসলীলার গৌরচন্দ্রিকা :

"বৃন্দাবন লীলা গোরার মনেতে পড়িল।
যমুনার ভাব সুরধুনী যে ধরিল ॥"

৪। মাথুরের গৌরচন্দ্রিকা :

"কহ সখী জীবন উপায়।
ছাড়ি গেল গোরা নটরায় ॥"

৫। শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগের গৌরচন্দ্রিকা :

"আরে মোর আরে মোর গোরা দ্বিজমণি।
রাধা রাধা বলি কান্দে লোটায়ে ধরণী ॥"

এ সমস্ত গানগুলিই সমতালের এবং একই সুরের। অবশ্য এ-ছাড়া বাসু-ঘোষের প্রসিদ্ধ গানের মধ্যে আছে :

১। রূপানুরাগের গৌরচন্দ্রিকা—পদকীর্তনের মধ্যে একটি সুপ্রসিদ্ধ বড় দশকোশী গান, যা কিছুদিন আগেও হয়ত পাওয়া যেত, কিন্তু এখন মনে হয় অবলুপ্ত। পদটি হ'ল :

"কাঁচা কাঞ্চন মণি গোরারূপ তাহে জিনি
ডগমগি প্রেমের তরঙ্গ।
ও নব কুসুমদাম গলে দোলে অনুপাম
হিলন নরহরি অঙ্গ ॥" ইত্যাদি

এগুলি শিহরণ-জাগানো গান—যে-কোন প্রাচীন শ্রোতা বা গায়ক গানটির নাম শুনেই মুগ্ধ হন।

২। বড় দশকোশীর আরও একটি বিশেষ সুরের বিশেষ গান হ'ল :

"গৌরাঙ্গ চাঁদেরে হেরি আঁখি ফিরাইতে নারি
মন অনুগত তাহে ভেল।
পরশ থাকুক দূরে অপরূপে মন হরে
নদীয়া নাগরী কুল গেল ॥" ইত্যাদি

এমন বহু প্রসিদ্ধ গৌরচন্দ্রিকার পদসৃষ্টির মাধ্যমে বাংলাভাষায় রাধাকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ রচনার ক্ষেত্রে বিশেষ প্রেরণা সৃষ্টি করেছেন পদকর্তা বাসু ঘোষ। শ্রীগৌরাঙ্গের বাল্যলীলা প্রসঙ্গে গানরচনার নিপুণতা ও সাবলীলতা দেখে মনে হয় যে বাল্যলীলা তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন, তাই তিনি শ্রীচৈতন্যর সমসাময়িক হ'লেও কিছু বয়োজ্যেষ্ঠ হবেন বলেই মনে হয়।

নাট ও ধামাইল

চৈতন্যদেবের সমসাময়িক কালে রাধাকৃষ্ণলীলা-বিষয়ক প্রধানত দু'রকম গান বিশেষ প্রচলিত ছিল: ১। নাটগান, ২। ধামাইল গান। বীরভূম অঞ্চলের সাধারণ লোকেরা করতেন নাটগান। এ গানের মূল স্রষ্টা যেই হ'ন, এর মূল প্রচারক ছিলেন শ্রীনিত্যানন্দ স্বয়ং। বৈষ্ণব-বন্দনায় পাওয়া যায়:

"দয়ার ঠাকুর বন্দোঁ প্রভু নিত্যানন্দ।
যাহা হৈতে নাটগীত সভার আনন্দ॥"

'নাটগীত' বলতে নাটকগীত, যার সংস্কৃত প্রকরণ হ'ল 'রায়ের নাটকগীতি'। গান যাই থাক, বিষয়টি ছিল সম্পূর্ণ অভিনয়। তারই অপভ্রংশ পরবর্তীকালে পশ্চিম দিনাজপুরের রাজবংশীদের 'নটুয়া'। এই নটুয়াতে রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক ছোটখাটো কিছু উপাখ্যান বা চরিত্র এখনও পাওয়া যায়।

কীর্তনের সঙ্গে অনেক ধামালী গান সংযুক্ত হয়েছে; তা ছাড়া কীর্তনের পালা সংকলনের রীতির মধ্যেও ধামাইল-এর প্রভাব পড়েছে। প্রাথমিক অবস্থায় কীর্তনের পদকর্তাগণ 'পালা' রচনা করতেন না, তাঁরা নায়ক বা নায়িকার বিভিন্ন অবস্থার শাস্ত্রীয় রূপকে নানা ভাবাশ্রিত এবং ভাষাশ্রিত পদ দ্বারা বিন্যাস করতেন। পালাকীর্তনের প্রাথমিক উপভোগ্য যে ঘটনার নাটকীয়তা, তা সৃষ্টি করেন গায়কগণ, এবং এ সৃষ্টির প্রেরণা যোগায় 'নাটগান' এবং 'ধামাইল', অর্থাৎ 'মঙ্গলগানের রীতি'। 'কড়চা' গানও 'ধামাইল'-এর অন্য প্রকরণ—অবশ্য ধামালীতে বিরহসূচক পদের আতিশয্য বিশেষ নাই—প্রায় সবই মিলনাত্মক। কীর্তনে 'ধামাইল'-এর প্রভাব আছে বলেই 'ধামালী' বলে একটি তালও কীর্তনে প্রচলিত হয়েছে এবং তালটির ব্যবহারও খুব বেশী।

বৃন্দাবন দাস

চৈতন্যদেবের সমসাময়িক সঙ্গীত-রচয়িতাদের মধ্যে ছিলেন—

"নারায়ণীসুত বন্দোঁ বৃন্দাবন দাস।
যাহার কবিত্ব গীত জগতে প্রকাশ॥"

এই বৃন্দাবন দাস ছিলেন নবদ্বীপের শ্রীবাস পণ্ডিতের দৌহিত্র, মাতার নাম নারায়ণী। তাঁর প্রধান রচনা "চৈতন্যভাগবত" হ'লেও, 'তত্ত্ববিলাস', 'দধিখণ্ড',

'বৈষ্ণব বন্দনা', 'ভক্তিচিন্তামণি', 'নিত্যানন্দ বংশমালা' ইত্যাদি গ্রন্থও তিনি রচনা করেন। তা ছাড়া কীর্তনগানের বহু পদ তিনি রচনা করেছেন।

বলরাম দাস

অপর সমসাময়িক রচয়িতা ছিলেন শ্রীমন্নিত্যানন্দের বিশেষ অনুগত বলরাম দাস। ইনিই মনে হয় নদীয়ার দোগাছিয়ার বলরাম। তাঁর সম্পর্কে উক্ত আছে :

"সংগীতরচক বন্দোঁ বলরাম দাস।
নিত্যানন্দচন্দ্রে যাঁর সুদৃঢ় বিশ্বাস॥"

অবশ্য অনেকে মনে করেন শ্রীখণ্ড-নিবাসী 'প্রেমবিলাস'-রচয়িতা নিত্যানন্দ দাসই ছিলেন বলরাম দাস। তাঁর পিতার নাম আত্মারাম, মাতার নাম সৌদামিনী, জাতিতে বৈদ্য। নরোত্তমের পরবর্তী যুগেও তাঁর এক শিষ্য ছিলেন পদকর্তা বলরাম দাস। তাঁর বাড়ী ছিল তেলিয়া বুধুরি অর্থাৎ গোবিন্দদাসের বাড়ীর নিকট। এই বলরামের পদে গোবিন্দের প্রভাব পাওয়া যায় অনেক বেশী। বলরাম দাসের রচিত বহু প্রসিদ্ধ গানের মধ্যে যেগুলি বর্তমানেও কীর্তনীয়াদের মুখে প্রচলিত আছে সেগুলি হ'ল :

১। গৌরচন্দ্রিকার পদ :

(ক) রূপের—"গৌর বরণ মণি আভরণ
নটুয়া মোহন বেশ।
দেখিতে দেখিতে ভুবন ভুলল
টলিল সকল দেশ॥" ইত্যাদি

এটি লোফা গান বলেই পরিচিত।

(খ) রাসের—"গোরা নাচে প্রেম বিনোদিয়া।
অখিল ভুবনপতি বিহরে নদীয়া॥" ইত্যাদি

এটি প্রসিদ্ধ মধ্যম দশকোশী তালের গান, গরাণহাটি গান বলেও এটির পরিচয়।

২। গোষ্ঠের পদ :

(ক) গমন গোষ্ঠ—"নটবর নব কিশোর রায়
রহিয়া রহিয়া যায় গো।"

তেওট তালের এ গানটি খুবই প্রসিদ্ধ।

(খ) উত্তর গোষ্ঠ—"চাঁদমুখে বেণু দিয়া সব ধেনুর নাম লইয়া
ডাকিতে লাগিল উচ্চৈঃস্বরে।
শুনিয়া কানুর বেণু ঊর্ধ্বমুখে ধায় ধেনু
পুচ্ছ ফেলি পিঠের উপরে॥" ইত্যাদি

এ গানটি মধ্যম দশকোশী তালের প্রসিদ্ধ জাতগান। উত্তর গোষ্ঠ প্রকরণে

এখনও অনেকে গেয়ে থাকেন। হরিদাস কর মহাশয় গানটির চলন একটু ছোট করে মধ্যমের পরিবর্তে ছোট দশকুশী তালে অপূর্ব বিন্যাস করতেন। এ ছাড়া, সে-সময়ের আর-একজন সংগীত-রচয়িতা ছিলেন জগন্নাথ দাস। ইনি ওড়িয়া ছিলেন এবং তাঁরও আর-এক ভ্রাতার নাম ছিল বলরাম। তাঁদের পিতা ছিলেন শ্রীচৈতন্যের কৃপাপ্রাপ্ত কানাই খুটিয়া মহাশয়।

"কানাই খুটিয়া বন্দোঁ বিশ্ব পরচার।
জগন্নাথ বলরাম দুই পুত্র যার॥
জগন্নাথ দাস বন্দোঁ সংগীত পণ্ডিত।
যার গানরসে জগন্নাথ বিমোহিত॥"

জগন্নাথ দাসের রচিত অন্যান্য গানের মধ্যে সবচেয়ে পরিচিত গানটি হ'ল 'নৌকাবিলাস' পালার গান :

"বড়াই ঐকি ঘাটের নেয়ে।
কোথা হতে আসি দিল দরশন
বিনোদ তরণী বেয়ে॥" ইত্যাদি

দুঠুকী তালের এ গানটি সকলেই গেয়ে থাকেন। জগন্নাথ দাসের এ পর্যায়ের গানগুলি খুবই রসিকতাপূর্ণ, তবে ভাবে একটু চটুল। নৌকা-বিলাসের আরও একটি দাসপ্যারী তালের গান :

"শুন বিনোদিনি ধনি আমার কাণ্ডারী তুমি
তোমার কাণ্ডারী কহ কারে।
তুয়া অনুরাগে প্রেম সমুদ্রে ডুব্যাছি আমি
আমারে তুলিয়া কর পারে॥
যোগী ভোগী নাপিতানী তোমার লাগিয়া দানী
ওঝা হইলাম তোমারি কারণে।
তুয়া অনুরাগে মোরে লৈয়া ফিরে ঘরে ঘরে
তুয়া লাগি করিনু দোকানে॥
রাখাল লইয়া বনে সদা ফিরি ধেনু সনে
তুয়া লাগি বনে বনচারী।
তোমার পীরিতি পায়্যা এ ভাংগা তরণী বায়্যা
তুয়া লাগি হইলু কাণ্ডারী॥
না বোল কুবোল ধনি রমণীর শিরোমণি
তুয়া প্রেমে কিনা করি আমি।
দাস জগন্নাথে কয় না ঠেলিহ রাংগা পায়
জাতি জীবন ধন তুমি॥"

জগদানন্দ দাস

এ ছাড়া ছিলেন জগদানন্দ পণ্ডিত, যেমন ছিলেন শাস্ত্রজ্ঞ তেমন ছিলেন সংগীতজ্ঞ। শ্রীচৈতন্যের সাক্ষাৎ কৃপাপ্রাপ্ত এই পণ্ডিতের রচিত কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক অপূর্ব কতকগুলি গান এখনও প্রচলিত আছে।

"জগদানন্দ পণ্ডিত বন্দোঁ সাক্ষাৎ সরস্বতী।
প্রভু যাঁরে করিলেন পরম পিরীতি॥"

অবশ্য জগদানন্দ নামে একজনের পরিচয় পাওয়া যায়, যিনি ছিলেন শ্রীখণ্ডের বৈদ্যবংশজাত নিত্যানন্দের পুত্র; পরে বীরভূমের দুবরাজপুরেই তিনি বাস করতেন। তবে তিনি যেহেতু পরমানন্দের পৌত্র, সেহেতু শ্রীচৈতন্যের সংগে তাঁর সাক্ষাৎ হওয়ার সম্ভাবনা নাই। ফলে 'প্রভু যারে করিলেন পরম পিরীতি' উক্তির যথার্থতা থাকে না। সে-হিসাবে বলা যায় জগদানন্দ পণ্ডিত মহাপ্রভুর সমসাময়িক এবং তাঁর গান-রচনার বৈশিষ্ট্য হ'ল—তা যুক্তাক্ষরের অনুপ্রাস বাহুল্যে এবং কাব্যালংকারে পরিপূর্ণ; যেমন—শ্রীমন্মহাপ্রভুর রূপ-প্রকরণের বিখ্যাত পদ, বড় দশকোশী তালের গান :

"দামিনী দাম দমন রুচি দরশনে
দূরে গেও দরপকি দাপ।
শোন কুসুম কিয়ে কিয়ে গনিয়ারে
প্রাতর অরুণ সন্তাপ॥
সুবরণ বরণ হেরি নিজ কুবরণ
মানি আপন মনস্তাপে।
নিজ তনু জারি ভষম সম করইতে
পৈঠল অনল সন্তাপে॥" ইত্যাদি

'দ'-এর এমন অনুপ্রাস অন্য কোন পদে পাওয়া যায় না; তা ছাড়া 'শোন কুসুম-এর সংগে গৌর অংগকান্তির তুলনা এই একটিমাত্র গানেই পাওয়া যায়। গানটি সুপ্রসিদ্ধ গরাণহাটি ঘরের বড় দশকোশী তালের গান। অবশ্য বর্তমানে প্রচলিত বড় দশকোশী তালের এ গানের সুরটি অনেক হাল্কা এবং 'নিরমল গোরা তনু' গানের সুরে রচিত। জগদানন্দের রচিত অন্যান্য গানের মধ্যে শশিশেখর তালে রচিত 'কুঞ্জভংগ' পালার প্রসিদ্ধ গান :

"জাগহু বৃষভানু নন্দিনী মোহন যুবরাজে।
রতির আলিসে নিশি জাগরণে ঘুমাওল ব্রজরাজে॥
অকরুণ পুন বাল অরুণ উদিত মুদিত কুমুদ বদন
চমকি চুম্বি চঞ্চুরি পদ্মিনিক সদন সাজে।
কি জানি সজনী রজনী থোর ঘুঘু ঘন ঘোষত ঘোর
গর্তহি যামিনী জিতদামিনী কামিনী কুল লাজে॥" ইত্যাদি

অনুপ্রাসযুক্ত এ গানটি আজও কুঞ্জভঙ্গ পালায় অবশ্যই গাইতে হয়। অবশ্য বেশীর ভাগ গায়কই লোফা তালে গানটি গেয়ে থাকেন। পদটির দ্বিতীয় চরণ, অর্থাৎ 'রতির আলিসে নিশি জাগরণে ঘুমাওল ব্রজরাজে' অংশটি কোন গ্রন্থে মুদ্রিত হয় নাই। এ অংশটি বৃন্দাবনের একজন নারায়ণ-বিশেষজ্ঞ বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের সূত্রে প্রাপ্ত। জগদানন্দের রচিত "চূড়াটি বাঁধিয়া উচ্চ কে দিলে ময়ূরপুচ্ছ"—আরও একটি সুপ্রসিদ্ধ গরাণহাটি মধ্যম দশকোশী গান। তা ছাড়া অনেক সাধারণ গানও তাঁর রচিত যেমন—

"আরতি করু নন্দরাণী বালক মুখ হেরি।
গায়ত নব নাগরীগণ রাখাল সব ঘেরি॥" ইত্যাদি

লোফা তালের এ গানটি নন্দরাণীর আরতি গীতি। জগদানন্দ ছাড়াও বংশীদাস, পরমেশ্বর দাস প্রমুখ অনেক সংগীত-রচয়িতা শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক কালে আবির্ভূত হয়েছিলেন। সেই সময়ের একজন শ্রেষ্ঠ গায়ক ছিলেন মুকুন্দ দত্ত।

"মুকুন্দ দত্ত শাখা প্রভুর সমাধ্যায়ী।
যার কীর্তনে নাচেন চৈতন্য গোঁসাই॥" (চৈতন্য চরিতামৃত)

এই মুকুন্দ দত্ত তৎকালীন রাগসংগীতেও অভিজ্ঞ ছিলেন এবং রাগসংগীতে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণকে তখন 'গন্ধর্ব' বলা হ'ত। উল্লেখ আছে :

"বন্দিব অম্বষ্ঠ নাম শ্রীমুকুন্দ দত্ত।
গন্ধর্ব জিনিয়া যাঁর গানের মহত্ত্ব॥"

গায়ক বাসুঘোষ সংগীতক্ষেত্রে তাঁরই অনুচর ছিলেন। সেজন্য বলা হয়েছে 'মুকুন্দ বাসু গুণগান'—আগে মুকুন্দ, পরে বাসু।

জ্ঞানদাস

চৈতন্যদেবের কালে অর্থাৎ চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের প্রথম শতকের মধ্যে পাঁচটি স্থানকে মূল কেন্দ্র করে কীর্তনের নানাবিধ বিকাশ হ'তে শুরু করল।

এ স্থানগুলি হ'ল : ১। বর্ধমানের শ্রীখণ্ড, ২। মুর্শিদাবাদের কাঁদরা, ৩। মুর্শিদাবাদের বুধুরি, ৪। নদীয়ার নবদ্বীপ এবং ৫। রাজশাহী জিলার খেতুরি। শ্রীখণ্ডে কীর্তন-বিকাশ শুরু হয় নরহরি সরকার, শ্রীনিবাস আচার্য, রঘুনন্দন প্রমুখের সূত্রে। তাঁদের গীতিকাব্যের ধারা ছিল মঙ্গল-আশ্রিত—বড় বড় বর্ণনামূলক পদ, সহজ ও সুবোধ্য ভাষায় লিখিত। কাঁদরায় ছিলেন জ্ঞানদাস। তাঁর অসংখ্য পদাবলী গান আছে ; এমনকি প্রতিটি পালা গাইতে গেলেই জ্ঞানদাসের পদ গাইতে হয়। তাঁর লিখিত রূপের প্রসিদ্ধ গৌরচন্দ্রিকা :

"(ও মোর ও মোর) লাখবাণ কাঞ্চন জিনি।
প্রেমে অঙ্গ ঢর ঢর মুজাউ নিছনি॥"

—সমতালের এ গানটি অভিনব—আজও অবধি কোন কোন গায়কের কাছে শোনা যায়। তা ছাড়া 'রূপানুরাগের' প্রসিদ্ধ গান গৌরী তেওট :

"চিকন কালিয়া রূপ মরমে লাগিল
ধরণে না যায় মোর হিয়া।" ইত্যাদি

প্রসিদ্ধ দাসপ্যারী গান :

"রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর॥"

গুঞ্জন তালের গান 'চাহ মুখ তুলি রাই চাহ মুখ তুলি", দুঠুকি তালের গান 'কি রূপ হেরিনু কালিন্দীর কূলে। অতি অপরূপ কদম্বমূলে॥' তেওট তালের প্রসিদ্ধ গান :

"দেখে এলাম তারে সখী দেখে এলাম তারে।
একই অঙ্গে কত রূপ নয়নে না ধরে॥" ইত্যাদি

দাসপ্যারী তালের গান :

"আবেশে সখীর অঙ্গে অঙ্গ এলাইয়া।
বৃন্দাবনে প্রবেশিলা শ্যাম জয় জয় দিয়া॥" ইত্যাদি

তা ছাড়া দানলীলার আড় তালের প্রসিদ্ধ গান :

"দানী দেখি কাঁপিছে শরীর ;
মো যদি জানিতাম আগে এ পথে কণ্টক আছে
তবে ঘরের না হইতাম বাহির॥" ইত্যাদি

নৌকাবিলাসের আড় তালের গান :

"বিনোদিনী পহিলে চাপিলা গিযা নায়।"

তা ছাড়া তাঁর রাসের গান, পরবের গান বহুবিধ প্রসিদ্ধ গান এখনও গাওয়া হয়ে থাকে।

গোবিন্দদাস

তেলিয়া বুধুরি গ্রামটি পদ্মার এ-পার অর্থাৎ মুর্শিদাবাদ জেলার ভগবানগোলার কাছে। ও-পারে রাজশাহী জেলার খেতুরী উৎসবে যাতায়াতের পথই হ'ল বুধুরী দিয়ে। এই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন রামচন্দ্র কবিরাজ, যাঁর অত্যন্ত অনুগত ছিলেন খেতুরীর নরোত্তমদাস। বহুভাবে বিভিন্ন রচনার মধ্যে নরোত্তম এই রামচন্দ্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করেছেন এবং একটি পদে বলেছেন :

"রামচন্দ্র সঙ্গ মাগে নরোত্তম দাস।"

রামচন্দ্র ছিলেন নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব। তাঁর গৃহে ছিল শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা। তাঁরই কনিষ্ঠ সহোদর গোবিন্দ ছিলেন শক্তির উপাসক, তাঁর ছিল কালীমন্দির।

একদিন গোবিন্দের অসুস্থতা হেতু মায়ের সেবাকার্য চালাতে অক্ষম হয়ে সহোদর রামচন্দ্রকে পূজো ও ভোগ নিবেদনের জন্য অনুরোধ করায়, গোবিন্দ লক্ষ্য করলেন—প্রসাদের অমৃতবৎ স্বাদ এবং রাত্রিতে স্বপ্নাবেশে জানতে পারলেন যে রামচন্দ্র কৃষ্ণে অর্পিত ভোগ মা-কালীকে নিবেদন করায়, মা সেদিন প্রসাদ পেয়েছেন। মাকে সকলেই ভোগ দিয়ে থাকে কিন্তু মায়ের সর্বাধিক আনন্দ হয় প্রসাদে। আজ সেই প্রসাদ পেয়ে মা অত্যন্ত সুখী এবং সেজন্যই প্রসাদের এত স্বাদ। গোবিন্দ সমগ্র তত্ত্বটি এবার বুঝতে পেরে গান রচনা করলেন—

"ভজহু রে মন শ্রীনন্দনন্দন
অভয় চরণারবিন্দ রে।
মনুষ্য দুর্লভ জনম সৎসঙ্গে
তরহ এ ভব সিন্ধু রে॥
শীত আতপ বাত বরিখন
এ দিন যামিনী যাপি রে।
বৃথায় সেবিনু কৃপণ দুরুজন
চপল সুখলব লাগি রে॥
এ ধন যৌবন পুত্র পরিজন
ইথে কি আছে পরতীত রে।
কমলদল জল জীবন টলমল
ভজহু হরিপদ নিত রে॥
শ্রবণ কীর্তন স্মরণ বন্দন
পাদ সেবন দাসী রে।
পূজন সখীগণ আত্মনিবেদন
গোবিন্দদাস অভিলাষী রে॥"

পদটি অপূর্ব। দুঠুকী তালের প্রার্থনাগান হিসাবে গানটির পরিচিতি সর্বজনবিদিত। একটি গানেই তিনটি তত্ত্বের অপূর্ব সমন্বয়। প্রথম অংশে কৃষ্ণের সর্বেশ্বরত্ব :

'যথাতরুমূর্ল নিসেচনেন
তৃপ্যন্তি তৎ স্কন্ধভুজোপশাখা।
প্রাণোপহারাশ্চ যথেন্দ্রীয়ানাম্
তথৈব সর্বার্হনমচ্যুতেজ্যা॥"

চরিতামৃতকার আরও দৃঢ়ভাষায় যেমন সিদ্ধান্ত করেছেন :

"একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সবই ভৃত্য।
যারে যৈছে নাচায় সে তৈছে করে নৃত্য॥"

এই তত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গে শঙ্করাচার্যের মোহমুদ্গর স্তবের কিছু তত্ত্ব তুলে

ধরেছেন ; যেমন—

"কা তব কান্তা কস্তে পুত্র।
সংসারোঽয়মতীব বিচিত্র॥"
… … …
নলিনীদলগতজলমতিতরলম্।
তদ্বজ্জীবনমতিশয়চপলম্॥
ক্ষণমিহ সজ্জন সংগতিরেকা।
ভবতিভবার্ণব তরণে নৌকা॥"

এ ছাড়া, প্রহ্লাদোক্ত নববিধা ভক্তির মূল সূত্রটিও তিনি বাংলা কবিতায় প্রকাশ করেছেন। এরপর থেকেই গোবিন্দদাস কীর্তন-রচয়িতা এবং কীর্তনগায়ক হিসাবে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তিনি ছিলেন চৈতন্যপার্ষদ চিরঞ্জীব সেনের পুত্র। কবি দামোদর সেনের কন্যা সুনন্দা ছিলেন তাঁর মাতা। দামোদর শাস্ত্রে যেমন পণ্ডিত ছিলেন তেমন সংগীতেও পারদর্শী ছিলেন। কারও কারও মতে, এই দামোদর সেন সংগীতের তত্ত্ব সম্পর্কে একটি গ্রন্থ লিখেছিলেন এবং সেটির নাম ছিল 'সংগীত দামোদর'। অবশ্য শুভংকর মুখোপাধ্যায় কৃত 'সংগীত দামোদর' ভিন্ন গ্রন্থ। মাতুল-সূত্রেই তাঁর সংগীত-শিক্ষা শুরু হয়। শ্রীনিবাস আচার্যের কৃপাগুণে তিনি বৈষ্ণবশাস্ত্রজ্ঞ হন এবং সর্বশেষ নরোত্তমদাস-আয়োজিত খেতুরী মহোৎসবে যোগদান করে কীর্তনগান সম্পর্কে তাঁর যথেষ্ট ব্যুৎপত্তিলাভ হয়। তিনি 'সংগীতমাধব' নামে একটি সংস্কৃত নাটক ও 'কৃষ্ণ-কর্ণামৃত' নামক একটি কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক কাব্যও রচনা করেন। গোবিন্দদাস প্রায় ছয়শত পদ রচনা করেছেন ; অবশ্য সব পদের গানের রূপ বর্তমানে নাই। অলংকারের সাহায্যে প্রতিটি পদে ঝংকার সৃষ্টি করেছেন। একদিকে অনুপ্রাস, অন্যদিকে উপমা। ভাষাপ্রকরণে একদিকে বিদ্যাপতির ও জগদানন্দের প্রভাব, অন্যদিকে আঞ্চলিক বাংলাভাষার প্রভাব। সর্বোপরি রসমিশ্রিত সাংগীতিক তাৎপর্য নিয়ে প্রতিটি রচনা অপূর্বরূপে প্রতিফলিত হয়েছে। প্রতিটি পালায় গোবিন্দ-দাসের কিছু পদ গাইতেই হয়, আবার অনেক পালা কেবল গোবিন্দদাসের পদ দিয়েই গাওয়া যায়। গোবিন্দদাস যেহেতু খেতুরী প্রকরণের গায়ক, সেহেতু তাঁর গানগুলির বেশীর ভাগই 'গরাণহাটি' গান বলে পরিচিত। সবচেয়ে বেশী জাতগান এবং দাগীগান আছে তাঁরই রচনায়। তাঁর রচিত অসংখ্য গানের মধ্যে নিম্নলিখিত কিছু গান খুবই উল্লেখযোগ্য :

(ক) রূপানুরাগ পালায়—

১। "অরুণিত চরণে রণিত মণিমঞ্জীর
আধ আধ পদ চলনি রসাল।"

—মধ্যম দশকুশী তালের দাগীগান।

২। "নীল রতন কিয়ে নবঘন ঘটা।
লখিলে লখিল নহে কিনা অংগের ছটা॥"

—মল্লার তেওট বলে পরিচিত এ গানটি গরাণহাটি ঘরের।

৩। "মুখমণ্ডল জিতি শারদ সুধাকর
তনুরুচি তরুণ তমাল॥"

—ধরা তালের এ গানটি চব্বিশ চাপড়ে এখনও বিশেষ গায়কগণ সকলেই গেয়ে থাকেন। অবশ্য 'তনুরুচি তরুণ তমাল' মধ্যম দশকোশী অংশটির কাটানে আখর সংকলন একটি অপূর্ব বিন্যাস—নন্দকিশোর দাস প্রমুখ প্রবীণ গায়কগণ এখনও করে থাকেন।

৪। "অঞ্জন গঞ্জন জগজন রঞ্জন
জলদপুঞ্জ জিনি বরণা।
তরুণারুণ থল কমলদলারুণ
মঞ্জির রঞ্জিত চরণা॥" ইত্যাদি

—এটি সুপ্রসিদ্ধ মধ্যম দশকোশী গান। এটি গরাণহাটি গান বলে পরিচিত এবং বৃন্দাবনের ভক্তিচরণদাসজী এ গানটি সবচেয়ে ভালো গাইতেন। গানটি এখন আর কেহ জানেন বলে মনে হয় না।

৫। "রূপে ভরল দিঠি সোঙরি পরশ মিঠি
পুলক না তেজই অংগ।
মোহন মুরলীরবে শ্রুতি পরিপূরিত
না শুনে আন পরসংগ॥" ইত্যাদি

—গানটি পূর্বে ধরা তালে গাওয়া হ'ত; পরে অবশ্য মধ্যম দশকোশী তালে গাওয়া হয়।

৬। "ওনা কালা কেলিকদম্ব তলে নবমেঘের কোড়া।
মেঘের উপরে চাঁদ তাহে কমল জড়া॥" ইত্যাদি

—এটি প্রসিদ্ধ বড় দাসপ্যারী গান। রসিক দাস এ গানটি খুব ভালো গাইতেন বলে শোনা যায়।

৭। "কি খেনে হেরিলাম শ্যামরায়।
মল্লিকা কলিকা কানে রহই ত্রিভংগ ঠামে
করে ধরি মুরলী বাজায়॥"

—গানটির এক চরণ মধ্যম দশকোশী আর এক চরণ দাসপ্যারী এইভাবে গাওয়া হ'ত বলে শোনা যায়। এখন অবশ্য দাসপ্যারী তালেই গাওয়া হয়।

৮। "মরকত মঞ্জু মুকুর মুখ মণ্ডল
মুখরিত মুরলী সুতান।

শুনি পশুপাখী শিখিকুল আকুল
কালিন্দী বহত উজান ॥"

—গানটি গরাণহাটি ঘরের মধ্যম দশকোশী বলে পরিচিত, তবে বর্তমানে এ গানটি ময়ূর তেওটেই সর্বত্র গাওয়া হয়। গানটি গোবিন্দদাসের লেখা হ'লেও একটু বিশেষ তাৎপর্য আছে এই যে, ভনিতার স্তবকে সন্তোষ রায়ের নাম উল্লেখ আছে।

"অতি সুকুমার চরণতল শীতল
জিতল পদারবিন্দ।
রায় সন্তোষ মধুপ অনুসন্ধিত
নন্দিত দাস গোবিন্দ ॥"

খেতুরীর রাজা সন্তোষের প্রশস্তির প্রয়োজনেই হয়ত এ গানটি রচিত হয়েছিল। গানটি বর্তমানেও খুব জনপ্রিয়।

গোবিন্দদাসের নিত্যানন্দ-বিষয়ক গানগুলির মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত গানটি হল :

"জয় জগতারণ কারণ ধাম।
আনন্দ কন্দ নিত্যানন্দ রাম ॥" ইত্যাদি

প্রসিদ্ধ বড় দশকোশী গান, যার শেষে আঠারো কাটানের ঝুমরা বাজে শেষ চরণে :

"প্রেম সুধারস জগভরি বরিখল
গোবিন্দদাস উপেখি ॥"

গৌর-বিষয়ক প্রসিদ্ধ গানগুলির অন্যতম হ'ল :

"চম্পক শোন কুসুম কনকাচল
জিতল গৌরতনু লাবণিরে।
উন্নত গীম সীম নাহি অনুভব
জগমনোমোহন ভাঙনীরে ॥"

—গানটির এ অংশটি বড় দশকোশী তালে গাইতে হয়; পরে সম্পূর্ণ গানটিই মধ্যম দশকোশী তালে।

তা ছাড়া অন্যান্য পালার প্রসিদ্ধ গানের মধ্যে কলহান্তরিতা :

১। "আধল প্রেম পহিলে নাহি হেরনু
সো বহুবল্লভ কান।"

—ধরা তালের প্রসিদ্ধ গান—এখনও গাওয়া হয়ে থাকে।

২। "চরণ লাগি হরি হার পিধাওল
যতনে গাথি নিজহাতে।"

৩। তিল এক শয়নে স্বপনে যো মঝু বিনে
চমকি চমকি করু কোর।

—এগুলিও ধরা তালের প্রসিদ্ধ গান।

৪। "কি কহিলি কঠিনি কালিদহে পৈঠবি
শুনইতে কাঁপই দেহা।
ঐছন বচন কানু যব শুনব
জীবনে না বান্ধব থেহা॥"

—মধ্যম দশকোশীর প্রসিদ্ধ গান।

৫। "শুনইতে কানু মুরলীরব মাধুরী
শ্রবণে নিবারলু তোয়।" ইত্যাদি

মধ্যম দশকোশীর প্রসিদ্ধ পদ, 'চূড়াটি বাঁধিয়া'র জোড়া গান। বর্তমানে অবশ্য মায়ুর তেওটে গানটি গাওয়া হয়।

৬। "রাইক হৃদয় ভাব ভাব বুঝি মাধব
পদতলে ধরণী লোটায়।" ইত্যাদি

—ধরা তালের গান।

৭। "নখপদ হৃদয়ে তোহারি।
অন্তর জ্বলত হামারি॥" ইত্যাদি

—মধ্যম দশকোশীর প্রসিদ্ধ গান।

দানলীলা প্রসঙ্গে প্রসিদ্ধ গানগুলি :

১। "ছুইওনা ছুইওনা নিলাজ কানাই
আমরা পরের নারী।
পরপুরুষের পবন পরশে
সচেল সিনান করি॥" ইত্যাদি

—মধ্যম দশকোশীর প্রসিদ্ধ গান। এ গানটির প্রত্যুত্তর হিসাবে গাওয়া হয়—

২। "তোহারিক হৃদয় বেণী বদরিকাশ্রম
উন্নত কুচগিরি জোড়।
তোহারি বদন ছবি কনক ধূম পিবি
ততহি তপত জীউ মোর॥

—মধ্যম দশকোশী তালের প্রসিদ্ধ গান।

মাথুরের প্রসিদ্ধ গান :

১। "প্রেমিক অঙ্কুর আত জাত ভেল
ন ভেল যুগল পলাশা।"

—তেওট তালের এ গানটি খুবই প্রচলিত।

২। "তুহু সে রহলি মধুপুরে"

সম তালের এ গানটি বর্তমানে বিভাস তেওটে গাওয়া হয়।

এমন 'রূপাভিসার', 'উত্তর গোষ্ঠ', 'রাসলীলা' ইত্যাদি পর্যায়ের বহু প্রসিদ্ধ গান আছে। সাহিত্য হিসাবে গানের সংখ্যা যতই হউক না কেন গান হিসাবে যে পদগুলি প্রসিদ্ধিলাভ করেছে সেগুলিই উল্লিখিত হ'ল। গোবিন্দদাস যেমন বিদ্যাপতির কয়েকটি অসম্পূর্ণ পদকে সম্পূর্ণ করেছেন তেমনি আবার গোবিন্দদাসেরও কিছু কিছু পদ শ্রীবল্লভ নামক একজন কবি সম্পূর্ণ করে ভনিতায় উভয়েরই নাম উল্লেখ করেছেন। যেমন—'রসোদ্গার' পর্যায়ের একটি গৌরচন্দ্রিকা গান—

"পুলক বলিত অতি ললিত হেম তনু
অনুখন নটন বিভোর।
কত অনুভাব অবধি নাহি পাইয়ে
প্রেমসিন্ধু বহ নয়নহি লোর॥
... ...
ইহ রস সায়রে মগন সুরাসুর
দিন রজনী নাহি জান।
গোবিন্দ দাস বিন্দু লাগি রোয়ই
শ্রীবল্লভ পরমান॥"

শ্রীরাধার পূর্বরাগ পর্যায়ের মধ্যম দশকোশী তালের একটি বিশেষ গান—

"আধক আধ আধ দিঠি অঞ্চল
যব ধরি পেখলু কান।
... ...
গোবিন্দদাস ভণে শ্রীবল্লভ জানে
রসবতি রস মরিবাদ।"

চৈতন্যোত্তর যুগে গীত-সাহিত্যের প্লাবন সৃষ্টি করেন গোবিন্দদাস এবং সেই সূত্রেই কীর্তনের গড়াণহাটি গানের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হতে থাকে। তাঁরই সূত্রে তাই বুধুরি গ্রাম একটি সার্থক কেন্দ্র হয়ে ওঠে।

শ্রীধাম নবদ্বীপ সংকীর্তনের পীঠস্থান। চৈতন্যোত্তর যুগেও অসংখ্য কীর্তন-স্রষ্টা এখানে ছিলেন যেমন বংশীদাস, চন্দ্রশেখর আচার্য প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। শ্রীবাস অংগনই কীর্তনের শ্রেষ্ঠ নাটমন্দির ফলতঃ সর্ববিধ গায়ক-বাদকের সমাবেশ হ'ত সেখানে। কীর্তনের সমবেত চর্চা বলতে যা বোঝা' যায় তার পূর্ণাংগ পরিবেশ ছিল নবদ্বীপে।

নরোত্তম দাস

চৈতন্যোত্তর যুগে কীর্তনের নবরূপায়ণ তথা পূর্ণাংগীকরণ ব্যাপারে সর্বাধিক

উল্লেখযোগ্য ছিলেন নরোত্তম দাস। চৈতন্য শতক পূর্ণ হবার পূর্বেই নরোত্তমের জন্ম হয় রাজশাহী জেলায় খেতুরী গ্রামে। নরোত্তমের জন্ম সম্পর্কে জানা যায় যে শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণের পর নীলাচল থেকে বৃন্দাবন যাবার পথে যখন রামকেলিতে যান সেখান খেতুরী গ্রামের দিকে দৃষ্টি দিয়ে 'নরোত্তম' বলে ডেকেছিলেন। নরহরি চক্রবর্তী বিরচিত 'নরোত্তমবিলাস' গ্রন্থের প্রথম বিলাসে উক্ত আছে—

"একদিন প্রভু নিজ গণ লৈয়া।
নাচে সংকীর্ত্তনে মহা প্রেমে মত্ত হৈয়া॥
নিরখিয়া শ্রীখেতরি গ্রাম দিশাপানে।
অদ্ভুত আনন্দধারা বহে দু নয়নে॥
নরোত্তম বলিয়া ডাকয়ে বারে বারে।
ভক্ত বাৎসল্যেতে স্থির হইতে না পারে॥"

এমন ডাক শুনে নিত্যানন্দ প্রমুখ অন্যান্য সঙ্গিগণ ভাবলেন যে সন্নিকটেই কোথাও নরোত্তম নামে কোন ব্যক্তির জন্ম হবে।

"নরোত্তম নাম প্রভু লয় বার বার।
ইথে বুঝিলাম কিছু কারণ ইহার॥
প্রভু প্রেমপাত্র কেহ নরোত্তম নামে।
ঞিহার প্রকট এই দেশে কোন গ্রামে॥"

তখন থেকে কিছুকাল পরে জন্ম হয় নরোত্তমের, যাঁর পিতা হ'লেন কৃষ্ণানন্দ দত্ত এবং মাতা নারায়ণী।

"এথা কতদিন পরে প্রভু ইচ্ছামতে।
জন্মিলেন নরোত্তম ভক্তি প্রকাশিতে॥
কিবা মাঘী পূর্ণিমা দিবস দণ্ড ছয়।
সর্ব্বসুলক্ষণ হইল প্রকট সময়॥
... ...
শ্রীখেতরি গ্রাম হইল পরমমঙ্গল।
ঘুচিল দুর্বুদ্ধি লোক আনন্দে বিহ্বল॥
... ...
ভক্তিদেবী প্রবেশিলা সবার অন্তরে।
সবে ধাওয়াধাই করে কৃষ্ণানন্দ ঘরে॥
বিবিধ সামগ্রী ভেট দেন সর্ব্বজন।
সবারে সম্মানে দত্ত মহা বিচক্ষণ॥

ঐছে ভাগ্যবতী নাহি নারায়ণী সম।
যাঁর গর্ভে জন্মিলা ঠাকুর নরোত্তম ॥"

গড়েরহাট পরগণার গোপালপুর অঞ্চলে খেতুরী গ্রাম। এ অঞ্চলের রাজা বলে খ্যাত দত্ত পরিবার। তারই প্রকৃত উত্তরাধিকারী ছিলেন নরোত্তম, কিন্তু তাঁর ভক্তিবিগলিত অন্তর ছিল বিষয়বাসনার ঊর্ধ্বে। তা ছাড়া গৌর-নিত্যানন্দের কৃপাশক্তিতে নরোত্তমের মনে বৈরাগ্যের সৃষ্টি হয়। তাঁর খুল্লতাত-পুত্র সন্তোষ দত্তকে রাজ ঐশ্বর্যের অধিকার দিয়ে তিনি বৃন্দাবনে চলে যান, এবং সেখানে লোকনাথ গোস্বামীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুর সান্নিধ্যে, নানাবিধ শাস্ত্রগ্রন্থাদি অধ্যয়নের সূত্রে, নরোত্তমের অন্তঃস্থ ভক্তি প্রস্রবণ রূপে সাহিত্য ও সংগীতের ধারায় প্রবাহিত হয়। গুরুদেব শ্রীলোকনাথ গোস্বামী তাঁকে 'ঠাকুর মহাশয়' উপাধিতে ভূষিত করেন। তদবধি বৈষ্ণবকুলে ঠাকুর মহাশয়ের পরিবার বলে একটি বিশেষ গুরুপ্রণালী সৃষ্টি হয়। তাঁর সমসাময়িক আরও একজন বৈষ্ণব ছিলেন যাঁর নাম ছিল নরোত্তম মজুমদার কিন্তু তাঁকে শুধু মজুমদার বলে ডাকা হ'ত, কারণ লোকেরা বিশ্বাস করতেন নরোত্তম নামে একজনই হয় যাঁর জন্ম শ্রীচৈতন্যদেবের ইচ্ছায়। এই ইচ্ছার অন্য কারণ যাই থাকুক, একটি কারণ সুস্পষ্ট। নরহরি চক্রবর্তী-কৃত ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থের দশম তরঙ্গে আছে—

"গীত প্রথা রক্ষা ক্ষোভ নিবৃত্ত নিমিত্তে।
প্রচারিতে সম্যক বিচার কৈল চিতে ॥
সে সময়ে তাহা প্রেমসম্পুটে রাখিল।
নরোত্তম দ্বারে প্রভু তবে উঘাড়িল ॥"

অর্থাৎ গীতপ্রথাকে যথার্থভাবে রক্ষা করার জন্যই নরোত্তমের প্রয়োজন ছিল। প্রকৃতপক্ষেও তাই। নরোত্তমের সমস্ত প্রচেষ্টাই ছিল কীর্তন সংগীতের উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্ত।

নরোত্তম যে পদাবলী সৃষ্টি করেছেন সেগুলি হ'ল সর্বসাধারণের আস্বাদন-যোগ্য গান। গোবিন্দদাসের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এবং সমসাময়িক পদকর্তা হয়েও ভাষার পাণ্ডিত্যের দিকে নজর না দিয়ে ভক্তির গভীরতার দিকেই তিনি নজর দিয়েছেন এবং সেইসঙ্গে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত বিভিন্ন বৈষ্ণবতত্ত্বের বাংলা প্রকরণ সৃষ্টি করেছেন। বৈষ্ণবের দৈন্যবোধ, বৃন্দাবন লালসা, গুরুবন্দনা, গৌর-বন্দনা, বৈষ্ণব বন্দনা ইত্যাদি বিষয়গুলিকে ভাবের রূপ দিয়ে প্রকাশ করতে পারাই হ'ল নরোত্তম পদাবলীর বৈশিষ্ট্য।

ভক্তের অন্তরের নিগূঢ়তম অভিব্যক্তিগুলিকে সহজ ভাষায় এমন অপূর্বভাবে প্রকাশ করতে পেরেছেন বলেই 'ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা'-গান বৈষ্ণবদের তথা হরিসাধকদের কণ্ঠহার হয়ে আছে। গুরুতত্ত্বকে সুস্পষ্ট করে বিশ্লেষণ করেছেন

'প্রেমভক্তি চন্দ্রিকায়'।

"আশ্রয় করিয়া বন্দো শ্রীগুরু চরণ।
যাহা হৈতে মিলে ভাই কৃষ্ণ প্রেমধন॥
জীবের নিস্তার লাগি নন্দসুত হরি।
ভুবনে প্রকাশ হয়েন গুরুরূপ ধরি॥"

তত্ত্বত গুরু ও কৃষ্ণ এক কিন্তু গুরুকে মনুষ্য আকারে দেখে নানাবিধ চিন্তা মানুষের মধ্যে আসতে পারে তাই তিনি বলেছেন—

"গুরুর বিক্রিয়া যদি দেখহ কখন।
তথাপি অবজ্ঞা নাহি কর কদাচন॥
গুরুকে মনুষ্য জ্ঞান না কর কখন।
গুরু নিন্দা কভু কর্ণে না কর শ্রবণ॥
গুরু নিন্দুকের মুখ কভু না হেরিবে।
যথা হয় গুরু নিন্দা তথা না যাইবে॥"

তা ছাড়া গুরুতত্ত্ব ও কৃষ্ণতত্ত্বের মধ্যে তুলনামূলক সমীক্ষা সূত্রে তিনি বলেছেন—

"কৃষ্ণ রুষ্ট হ'লে গুরু রাখিবারে পারে।
গুরু রুষ্ট হ'লে কৃষ্ণ রাখিবারে নারে॥"

প্রাচীন সংস্কৃত শ্লোকাদির সূত্রানুসারে লিখিত এই পয়ারগুলিই বৈষ্ণব-সাধনার মূলতত্ত্ব গুরুবাদকে সহজ সরল এবং জনপ্রিয় করেছে। নিজের গুরু লোকনাথ গোস্বামীর উদ্দেশ্যে রচিত প্রার্থনায় তিনি লিখেছেন—

"হা হা প্রভু লোকনাথ রাখ পাদদ্বন্দ্বে।
কৃপাদৃষ্টে চাহ যদি হইয়া আনন্দে॥
মনোবাঞ্ছা সিদ্ধি তবে হও পূর্ণতৃষ্ণ।
হেথায় চৈতন্য মিলে সেথা রাধাকৃষ্ণ॥
তুমি না করিলে দয়া কে করিবে আর।
মনের বাসনা পূর্ণ কর এইবার॥"

সমগ্র বৈষ্ণব সাধনার সারতত্ত্বটি ফুটিয়ে তুলেছেন এই গানটিতে অর্থাৎ গুরুপদাশ্রয় সূত্রে শ্রীচৈতন্যের সেবালাভ, যার পরিণত অবস্থায় বৃন্দাবনে রাধা-কৃষ্ণের সেবার সুযোগ প্রাপ্ত হওয়া যায়। বৈষ্ণব তত্ত্বের উৎকর্ষ স্থাপন করতে গিয়ে তিনি বলেছেন—

"বৈষ্ণবের পদধূলি তাহে মোর স্নান কেলি
তর্পণ মোর বৈষ্ণবের নাম।
বিচার করিয়া মনে ভক্তিরস আস্বাদনে
মধ্যস্থ শ্রীভাগবত পুরাণ॥

বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট　　তাহে মোর মননিষ্ঠ
বৈষ্ণবের নামেতে উল্লাস।
বৃন্দাবনের চৌতারা　　তাহে মোর মন ঘেরা
কহে দীন নরোত্তম দাস ॥"

অন্যত্র বলেছেন—

"ঠাকুর বৈষ্ণবপদ　　অবনীর সম্পদ
শুন ভাই হয়ে একমন।
আশ্রয় লইয়া ভজে　　তবে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে
আর সব মরে অকারণ ॥"

মূলকথা, নরোত্তমের পদাবলীর আসল বিষয়ই হ'ল বৈষ্ণব সাধনার গোড়ার কথাগুলিকে স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেওয়া। এর মধ্যে কাব্যিক অলঙ্করণ তেমন না থাকলেও পরিচিত ভাবপ্রকাশের আধিক্য থাকায় তাঁর পদগুলি মধুময় হয়ে উঠেছে। সর্বোপরি সাঙ্গীতিক দিক থেকে এগুলি খুবই সুগেয় এবং সুশ্রাব্য। অবশ্য নরোত্তমের কাব্যিক কল্পনার বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে তাঁর অন্যান্য দু'-একটি রাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়ক পদরচনায়।

যেমন—১। "শ্যাম মন বরিখয়ে কত রসধার।
কোরে রঙ্গিণী রাধা বিজুরী সঞ্চার।
ভাবে পিছল পথ গমন সুবঙ্ক।
মৃগমদ চন্দন পরিমল পঙ্ক ॥"

২। "কদম্ব তরুর ডাল　　ভূমে নামিয়াছে ভাল
ফুল ফুটিয়াছে সারি সারি।
পরিমলে ভরল　　সকল বৃন্দাবন
কেলি করে ভ্রমরা ভ্রমরী ॥" ইত্যাদি।

৩। "চলিলা রসিকরাজ　　ধনী ভেটিবারে।
অথির চরণ যুগ আরতি বিথারে ॥"

নরোত্তমের পদসাহিত্যের ধারার প্রেরণাতেই পরবর্তীকালের গায়কমাত্রেই পদরচনার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করেছেন। আরও পরবর্তীকালে মূলপদকে নির্দিষ্ট রেখে গানে আখর সংযোজনের রীতি প্রবর্তন করেছেন।

রাধামোহন

নরোত্তম দাসের সমসাময়িক বা পরবর্তীকালের আরও বহু পদকর্তা আছেন যাঁদের পদগুলি বিভিন্ন পালা প্রকরণে বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করেছে। এ'দের মধ্যে বিশেষ করে প্রসিদ্ধ গৌরচন্দ্রিকা রচয়িতা শ্রীরাধামোহন ঠাকুর। তিনি ছিলেন অষ্টাদশ শতকের কবি। শ্রীনিবাস আচার্য ঠাকুরের তিনি ছিলেন

বৃদ্ধ প্রপৌত্র। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ মহারাজা নন্দকুমার ছিলেন তাঁর শিষ্য। তাঁর রচিত গৌরচন্দ্রিকা বিষয়ক গানগুলির মধ্যে—

১। "মধুকর রঞ্জিত মালতী মণ্ডিত
জিতঘন কুঞ্চিত কেশমু॥"
২। "আজু হাম কি পেখলু নবদ্বীপচন্দ্র।"
৩। "মান বিরহ জ্বরে পহু ভেল ভোর।"
ও রাঙ্গা নয়নে বহে তপত হিলোর॥"
৪। "হের দেখ নব নব গৌরাঙ্গ মাধুরী।"
৫। "সুরধুনী তীরে আজু গৌরকিশোর।"
৬। "নাচত গৌর রাসরস অন্তর।"
৭। "পুরব জনম দিবস দেখিয়া আবেশে গৌর রায়।"

এ গানগুলি গাওয়া হয় যথাক্রমে মদনদোলা, যোতসোম, রূপক, তেওট, সমতাল, মধ্যম দশকোশী, একতালি তালে। পদরচনা ছাড়াও রাধামোহন ঠাকুরের প্রধান কাজটিই ছিল প্রাচীন পদকর্তাদের রচনা সংগ্রহ এবং এটির নাম 'পদামৃত সমুদ্র'—৭৪৬টি পদের সংকলন। এমন রচনা সংগ্রহের মধ্যে আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য—যেমন 'ক্ষণদা গীতচিন্তামণি' এটিতে ৪৫ জন পদকর্তার রচিত ৩০০টি পদ আছে, মুর্শিদাবাদ জিলার টেঞা বিষ্ণুপুর নিবাসী গোকুলানন্দ সেনের সংকলন গ্রন্থ 'পদকল্পতরু'—১৪০ জন পদকর্তার ৩১০০-এর বেশী পদ আছে। তাছাড়া গৌরসুন্দর দাসের 'কীর্ত্তনানন্দ', দীনবন্ধু দাসের 'সংকীর্ত্তনামৃত' ইত্যাদি গ্রন্থগুলি উল্লেখযোগ্য।

সমসাময়িক অন্যান্য প্রসিদ্ধ গায়ক পদকর্তাদের মধ্যে কাঁদরার শশিশেখর ও চন্দ্রশেখর দুই ভাই, ঘনশ্যাম দাস, যাঁর অপর পরিচয় ভক্তিরত্নাকর প্রণেতা নরহরি চক্রবর্তীরূপে। দ্বিজ ভীম, দ্বিজ চণ্ডীদাস, দীন চণ্ডীদাস, রামানন্দ বসু, শিবরাম দাস, উদ্ধবদাস, গোপালদাস, মনোহর দাস, দুখিনী, কৃষ্ণদাস প্রমুখ অনেকে।

মুসলমান কবি

এসব পদকর্তাদের বলা হয় 'মহাজন' কারণ এ'রা সকলেই শ্রীচৈতন্যদেবের পার্ষদদের বংশাবতংস। তা ছাড়া এঁরা যেমন কবি বা গায়ক ছিলেন তেমন এঁরাই ছিলেন বৈষ্ণবকুলচূড়ামণি ভক্তবিশেষ। এসব পদকর্তা ছাড়াও কতিপয় মুসলমান কবি ছিলেন যাঁদের গান বৈষ্ণব সমাজে অতিশয় আদরণীয় হয়েছিল। এদের মধ্যে নসীর মামুদের পদটির উল্লেখ আগেই করা হয়েছে। তা ছাড়া ছিলেন সৈয়দ মর্তুজা, সম্ভবত ষোড়শ শতকের রচয়িতা যাঁর আবেগপূর্ণ পদটি হ'ল—

"শ্যামবধু আমার পরাণ তুমি।
কোন শুভদিনে দেখা তোমা সনে
পাসরিতে নারি আমি ॥
যখন দেখিয়ে ও চাঁদ বদনে
ধৈরজ ধরিতে নারি।
অভাগার প্রাণ করে আনচান
দণ্ডে দশবার মরি ॥
মোরে কর দয়া দেহ পদ ছায়া
শুন শুন পরাণ কানু।
কুলশীল সব ভাসাইনু জলে
না জীয়ব তুয়া বিনু ॥
সৈয়দ মর্ত্তুজা ভণে কানুর চরণে
নিবেদন শুন হরি।
সকল ছাড়িয়া রহিনু তুয়া-পায়
জীবন মরণ ভরি ॥"

এমন অন্যান্য রচয়িতাদের মধ্যে আছে গরীব্-খা। ইনি পূর্ববঙ্গের রচয়িতা। তাঁর যে দুটি পদের সন্ধান পাওয়া যায় তার একটি হ'ল গৌর বিষয়ক অপরটি রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক কিন্তু পদের সংগঠন ও ভাষা দেখে বোঝা যায় এগুলি লোক-সংগীত পর্যায়েরই গান। যেমন—

"জানি কার রূপ পাথারে ডুইবা চাঁদ গৌর হইয়াছে।
য্যামন কইরে বাসত ভাল সে ওর মনমত আছিল
অমন আছিল সে রূপের কামে ॥
গরিব কয় ধরমু বলে ডুইবা পালে না
তাই খ্যাপি নইদায় এয়েছে।"

ভীখা সাহেব নামে একজন মুসলমান কবির একটি পদ পাওয়া যায়। পদটিতে মৈথিল প্রভাব, ভজন গানের মত সুরেই গাওয়া হয়, প্রার্থনাত্মিকা কীর্ত্তনেও গানটির ব্যবহার আছে। গানটি হ'ল—

"যা জগমে রহনা দিন চারি।
তাতে হরিচরণ চিত্ত বারী ॥
শীর পর কাল সদা যাক সাজে ॥
অবসর পাওয় তুরত হমারি ॥
ভীখ কেবল কহে নাম ভজে বিনু
প্রাপ্তি কষ্ট নরক ভারী ॥

ফরিদপুরের কবি আলাওলেরও রাধাকৃষ্ণ বিষয়ে কিছু পদ আছে। অনু-

বাদক কবি হিসাবেই অবশ্য তাঁর বিশেষ খ্যাতি ছিল, তবে কিছু কিছু পদে কল্পনামাধুর্য বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়েছে। ইনি সপ্তদশ শতকের কবি, তাঁর পূর্ণ পরিচয় পাওয়া গেছে। তাঁর রচিত পদগুলির মধ্যে প্রাকৃত চেতনার প্রভাবই ছিল বেশী। শ্রীমতী রাধা সারাদিন কৃষ্ণের সঙ্গে বিহার করে বাড়ী ফিরেছেন, ননদিনী কুটিলা নানাভাবে প্রশ্ন করাতে তিনি তার উত্তর দিচ্ছেন। পদটি হ'ল—

"ননদিনী ওগো রস বিনোদিনী,
তোর কুবোল সইতাম নারি ॥
ঘরের ঘরণী জগতমোহিনী
প্রত্যুষে যমুনায় গেলি।
বেলা অবশেষ নিশি পরবেশ
কিসে বিলম্ব করিলি ॥
প্রত্যুষ বেহানে কমল দেখিয়া
পুষ্প তুলিবারে গেলুম।
বেলা উদনে কমল মুদনে
ভ্রমর দংশনে মৈলুম ॥
কমল কণ্টকে বিষম সংকটে
করের কংকণ গেল।
কংকণ হেরিতে ডুব দিতে দিতে
দিন অবশেষ ভেল ॥
সীথের সিঁদুর নয়নের কাজর
সব ভাসি গেল জলে।
হের দেখ মোর অঙ্গ জরজর
দারুণ পদ্মের নালে ॥
কুলের কামিনী ফুলের নিছনি
কুলে নাহিক সীমা।
আরতি মগনে আলাওল ভণে ॥
জগৎ মোহিনী রামা ॥

সমকালীন সাহিত্যের প্রভাব এ রচনাটিতে সুস্পষ্ট। যেমন পাওয়া যায় খণ্ডিতা পর্যায়ের শশিশেখরের একটি পদে। রাধারাণী ও শ্রীকৃষ্ণের উক্তি-প্রত্যুক্তি বিষয়ে পদটি হ'ল—

"ছিল নীলোৎপল শ্রীমুখ মণ্ডল
ঝামরু কাহে ভেল।
মদন জ্বরে তনু তাতল জাগরে নিশি গেল।"

নবদ্বীপের বিশিষ্ট বৈষ্ণব, 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান' প্রণেতা হরিদাস দাসজীর সূত্রে আকবর শাহ নামাঙ্কিত একটি গৌর বিষয়ক পদ পাওয়া যায়। পদটি দেখে মনে হয় চৈতন্যদেব অপ্রকট হবার কিছু দিনের মধ্যেই রচিত, কারণ তখনই ভক্তদের মধ্যে একটি বিশেষ আবেগপূর্ণ পরিবেশের সঞ্চার হয়েছিল। এই আকবরের নাম সমসাময়িক কোন বৈষ্ণবগ্রন্থে পাওয়া যায় না, তবে ইতিহাস সূত্রে আকবর বাদশাহ ছাড়া সায়েস্তাখাঁর ফৌজদার একজন আলি আকবরের নাম পাওয়া যায়। তিনি বিদ্রোহ করেছিলেন কিন্তু তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির কোন প্রমাণ নাই। পরন্তু আকবর বাদশাহ কিছু ধ্রুপদ গান রচনা করেছিলেন যা তানসেন দরবারে গাইতেন, তাছাড়া ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তা আকবরের জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য দর্শন। বাদশাহ ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে গৌড়বিজয় করার পর আগ্রা থেকে বজরা করে পাটনা হয়ে ছয় মাসে গৌড়ে এসে পেঁছে কিছুদিন ছিলেন এর প্রমাণ আছে। তখন গৌড়ে চলছে চৈতন্য প্রবাহ তাই আকবর নিজে বা তাঁর ইচ্ছায় এমন দু'একটি গৌড় বিষয়ক পদ রচনা হওয়া অস্বাভাবিক নয়। তাছাড়া তখন অন্য কোন আকবর 'শাহ' উপাধি প্রয়োগ করে আত্মপ্রচার করতে পারতেন কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। আকবরের 'দীনইলাহি' ধর্মে যে অন্য ধর্মগুরুর প্রভাব ছিল তা স্পষ্টই বোঝা যায়, কারণ ইসলামের চূড়ান্ত প্রভাবের মুখে এমন আকস্মিক উদারতা বহিরাগত প্রভাব ভিন্ন কি করে সম্ভব তা গবেষণার বিষয়। পদটি গানের জন্যই রচিত তা সংগঠন দেখেই বোঝা যায়। এটি হ'ল—

"জীউ জীউ মেরে মনচোরা গোরা।
আপহি নাচত আপন রসে ভোরা॥
খোল করতাল বাজে ঝিঁকি ঝিঁকি ঝিঁকিয়া।
ভকত আনন্দে নাচে লিকি লিকি লিকিয়া॥
পদ দুই চারি চলু নট নট নটিয়া।
থির নাহি হোয়ত আনন্দে মাতুলিয়া॥
ঐছন পহুকে যাউ বলিহারি।
শাহ আকবর তেরে প্রেম ভিখারী॥

সঙ্গীতকাব্যের বৈশিষ্ট্য

বৈষ্ণব মহাজন কৃত এসব সাংগীতিক কাব্যগুলিতে একদিকে যেমন বর্ণের ঝংকার অন্যদিকে শব্দচয়নের চাতুর্য অদ্ভুতভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। কাব্যগুলি মূলতঃ সংস্কৃত কাব্যাশ্রয়ী হ'লেও কোন কোন ক্ষেত্রে নান্দনিক সৌন্দর্যে মূলকেও অতিক্রম করেছে। কাব্যগুলির মৌলিক তাৎপর্য হ'ল ভাবসঞ্চার পরিকল্পনা। কাব্যিক সার্থকতার জন্য সঙ্গীতের মাধ্যমে নির্দিষ্ট ভাবকেও পরিবহণ করে নিয়ে যায়।

নারীসুলভ আকৃতি

এ ভাবপ্রকাশের মধ্যে নারীসুলভ অভিব্যক্তিই বেশী কারণ সমগ্র সৃষ্টির মধ্যেই রাধাভাবের প্রাধান্য। তা ছাড়া গোপীভাবাশ্রিত ভজনই বৈষ্ণবীয় পদ্ধতি, তাই সমগ্র সাহিত্যে যেন একটি নারী স্বভাব প্রকটিত হয়েছে। রাধারাণী হেসে হেসে বলছেন—'সই তোরে বলিগো বিনোদ নাগর বড় রসিয়া', আবার বলছেন—"আলো সই কিনা জ্বালা কালা কানুর পীরিতে", "মরি মরি আলো সই শ্যাম রূপের বালাই লই", "সখা ফিরিয়া আপন ঘরে যাও। জীয়ন্তে মরিয়া যে আপন, খাইয়াছে সে, তারে তুমি কি আর বোলাও।' এসব গানগুলিতে প্রেমের অভিব্যক্তির মধ্যে অপূর্ব নারীসুলভ আকৃতি। এই আকৃতিগুলিই হ'ল মূলতঃ এসব সাংগীতিক সাহিত্যগুলির নান্দনিক আভা।

নাটকীয়তা

দ্বিতীয়তঃ এসব সংগীত সাহিত্যের মধ্যে আকর্ষণীয় নাটকীয়তা দেখে মনে হয় যেন নাটকের জন্যই এ গানগুলির সৃষ্টি হয়েছে। উক্তি-প্রত্যুক্তির মাধ্যমে পালার গানগুলিকে অত্যন্ত সহজ সরল ভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এবং নাটকীয়তা একদিকে যেমন সংগীতকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে অন্যদিকে সাহিত্যের উৎকর্ষও স্থাপন করেছে। পরবর্তী যুগে ছন্দাশ্রয়ী কাব্যের মাধ্যমে কথোপকথনের সাহায্যে যে নাটক সৃষ্টি হয়েছে তারও প্রেরণা এই সাহিত্যের মধ্যেই পাওয়া যায়। কোথাও দেখা যায় একই গানে উত্তর-প্রত্যুত্তর, যেমন—খণ্ডিতা পর্যায়ের কবি শশিশেখর রচিত একটি গান—

প্রশ্ন : "ছিল নীলোৎপল শ্রীমুখমণ্ডল
ঝামরু কাহে ভেল।"
উত্তর : "মদন জ্বরে তনু তাতল
জাগরে নিশি গেল॥"
প্রশ্ন : "সিন্দুর কাহে অলকা পরি
চন্দন কাহা গেল।"
উত্তর : "গিরি গোবর্ধনে গৌরীক সেবি
সিন্দুর করি মাল॥"
প্রশ্ন : "নখ নির্ঘাত ক্ষত বক্ষসি
দেওয়ল কোন নারী।"
উত্তর : "কণ্টকেতে তনু ক্ষত বিক্ষত
তুহু ঢুরইতে গোরী॥"

এমন আরও অনেক গান আছে, বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন পদকর্তার লেখা। আবার একই পদকর্তার দু'টি গানের একটিতে সমস্যার উদ্ভাবন, অপরটিতে তার সমাধান।

যেমন আছে গোবিন্দদাসের একটি পদে। পদটির শুরুতে দুটি চরণ আছে—

"এই মনে বনে দানী হইয়াছ ছুইতে রাধার অংগ।
পুরুষ হইয়া রমণীর সনে না কর এতেক রংগ॥"

অবশ্য বড় গানটি প্রসিদ্ধ মধ্যম দশকোশী গান, শুরু হয় এর পর থেকে—

"ছুইওনা ছুইওনা নিলাজ কানাই
আমরা পরের নারী।
পরপুরুষের পবন পরশে
সচেল সিনান করি॥"

এই উক্তিটিতে দ্ব্যর্থবোধক বক্রোক্তির প্রকাশ গায়কগণ উপস্থাপিত করেন। স্তবকটির আপাত অর্থ হ'ল—"দানী বেশে কৃষ্ণ! তুমি নিলাজ, তুমি আমাদের অংগ স্পর্শ করো না কারণ আমরা হ'লাম পররমণী আর তুমি হ'লে পরপুরুষ, তাই তোমার অংগের বাতাস যদি আমাদের অংগে লাগে তবে আমাদের সবস্ত্র যমুনা স্নান করতে হয়।" অপর অর্থটি কীর্তনীয়াগণ করে থাকেন ভিন্ন প্রকারে, ঠিক বিপরীত অর্থে। নিম্নরূপে ছেদ টেনে যদি বিশ্লেষণ করা যায় তবেই অর্থটি প্রকটিত হয়ে উঠে।

ছুইও | না ছুইও না | = ছুইও
আমরা পরের না | রী = দৃঢ় প্রত্যয়ের জন্য রী।

'পরপুরুষ' অর্থে পরমপুরুষ; যার অংগের বাতাস লাগা মাত্র আমরা যমুনায় স্নানরূপ পবিত্রতা প্রাপ্ত হয়ে থাকি। এই প্রবচনটির পর সখী উক্তিতে সমস্যার উদয় করে বললেন—

"গিরি গিরা যদি গৌরী আরাধহ
পান কর কনক ধূমে।
কাম সাগরে কামনা করহ
বেণী বদরিকাশ্রমে॥
সুরজ পরাগে সহস্র সুন্দরী
ব্রাহ্মণে করয়ে সাথ।
তথাপি তোমার না হবে শকতি
রাই অংগে দিতে হাত॥"

সুতরাং রাই অংগ স্পর্শ করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার; কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্র অত্যন্ত চাতুর্যের সংগে যে প্রত্যুত্তরটি দিলেন তা একান্ত নাটকীয়ভাবে গোবিন্দদাস ফুটিয়ে তুললেন তাঁর অপর একটি পদে। মধ্যম দশকোশী তালের এ গানটিও খুবই প্রসিদ্ধ এবং দুটি গানই পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত বলে একটি গাইলেই অপরটি গাইতে হয়। গানটি হ'ল—

"তোহারিক হৃদয় বেণীবদরিকাশ্রম
উন্নত কুচাগিরি জোড়।
তোহারি বদন ছবি কনক ধুম পিবি
তর্হি তপত জীউ মোর॥
মৃগমদ বিন্দু সিন্দুর গরাসল
তঁহি সে সুরজগ্রহ জানি।
তুয়া পদ নখ দ্বিজরাজ হি সোপলু
সুন্দরী সহস্র পরাণী।"

উত্তরটিতে যেমন চাতুর্যের প্রকাশ তেমন মাধুর্যের বিকাশ, সেই সূত্রে সমস্যার এমন সমাধান হ'ল যে রাধারাণী ব্যক্ত করতে বাধ্য হলেন যে—'আমি আর ঘরে ফিরে যাব না।'

সখীদের বলে দিলেন :

"তোরা ঘরে গিয়ে ইহাই বল
দান ঘাটে রাই বিকাল
যাঁহার রাধা হইল তাহার।"

নাটকীয়তা সবচেয়ে বেশী লক্ষ্য করা যায়—মান পর্যায়ের 'খণ্ডিতা', 'কলহান্তরিতা' ও 'দানলীলা', 'নৌকাবিলাস', 'মাথুর' ইত্যাদি লীলাপর্যায় প্রসঙ্গে। যে কোন একটি পদ পড়তে গেলেই মনে হয় এর আগে একটি পদ আছে, আবার শেষ হ'লেও মনে হয় পরেও একটি আছে। সাহিত্যের আশ্রয়ে এই যে কৌতূহলের উদ্দীপনা এটাই কীর্তনাঙ্গীয় সাহিত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এর শুরুও নাই শেষও নাই। যদুনাথ দাসের একটি পদ হ'ল—

"কি কহিলী সুধামুখী আমি মাঠে ধেনু রাখি
পুরুষের সকলি শোভা পায়।
রাজার নন্দিনী হয়ে দধির পশরা লয়ে
ঘাটে মাঠে কে ধেয়ে বেড়ায়॥
পদ্মগন্ধ উড়ে গায় মধুলোভে অলি ধায়
অপরূপ শোভা আহিরিণী।
দেখিতে মনের সাধ কোটি কাম উনমাদ
নিরুপম অমিয়া নিছনি॥
তোমার নিজ পতি যে কেমনে ধরেছে দে
তোমারে পাঠিয়ে দিয়ে মাঠে।
এ হেন সুন্দরী যদি মোরে মিলাইত বিধি
বসায়ে রাখিতাম সোনার খাটে।"

এমন নাটকীয় রহস্য বহু মঙ্গ পদের মধ্যেই আছে, আবার এ নাটকীয়তাকে

পূর্ণায়িত রূপ দেওয়া হয় গায়কের 'ঘটকালি', 'আখর' ইত্যাদির সাহায্যে। অর্থাৎ কীর্তনগানের সাহিত্য নাটকীয় সাহিত্য নয় কিন্তু এর মধ্যে সাহিত্যের নাটকীয়তা সুস্পষ্ট।

অলঙ্কার

তৃতীয়তঃ এসব সাহিত্যের মধ্যে বর্ণালংকার মাধুর্য অতুলনীয়। অনুপ্রাস প্রয়োগে কোন কোন পদকর্তার লেখনীতে অপরিসীম পাণ্ডিত্যের প্রকাশ দেখা যায়। বিশেষতঃ পণ্ডিত জগদানন্দ, গোবিন্দদাস প্রমুখ কয়েকজন কবির রচনায়। যেমন—

১। ক-এর অনুপ্রাস :

(ক) "কাননে কামিনী কোই না যায়।
কালিন্দী কূলে কল্পতরু ছায়॥
কুঞ্জ কুটীর মাহা কান্দই কোই।
করে শীর হানই কুন্তল ফোই॥" (গোবিন্দদাস)

(খ) "কুঞ্জরকরভ করহি কর বন্ধন
মলয়জ কঙ্কণ বলয়বিরাজ॥"

২। গ-এর অনুপ্রাস :

(ক) "গিরিক গৈরিক গোরজ গোরচন
গন্ধ গরবিত বাস।
গোপ গোপন গরিম গুণগণ
গাওত গোবিন্দদাস॥"

(খ) "গলত গাত গীরত মহীমাহ।
গুরুতর গিরী অধিক ভেল দাহ॥
গোকুলে গোপরমণী অছু ভেল।
গরল গরাসনে গোবিন্দ গেল॥"

৩। চ-এর অনুপ্রাস :

"চিকন চাঁচর চিকুর চুম্বিত
চারুচন্দ্রক পাতি।
চপল চমকিত চকিত চাহনী
চিত চোরক ভাতি॥"

৪। ট-এর অনুপ্রাস :

"নিপটি কটুনাদী কোটী কঠিন বজরাবুকি
নাহে তব সপদি ভেল দেল।"

৫। ন-এর অনুপ্রাস :

"নলিনী নারীগণ নাশল নেহ।
নবীন নিদাঘে না জীবই কেহ ॥
নবীন নিন্দিত নব নব বালা।
নাগল বিরহ হুতাসন জ্বলা ॥"

৬। দ-এর অনুপ্রাস :

"দামিনী দাম দমন রুচি দরশনে
দূরে গেয় দরপকি দাপ।"

৭। স-এর অনুপ্রাস :

"শ্যাম সুন্দর সুঘর শেখর
শরদ শশধর হাস।
সংগে সবয়স সুবেশ সমরস
সতত সুখময় ভাস ॥"

৮। "বরজ কুলজ জলজ নয়নী
ঘুমল বিমল কমল বয়ানী
কৃত আলিস ভুজ বালিস
আলিস নাহি ত্যজে ॥"

৯। "চলে বৃষভানু সুকুমারী।
মঞ্জু বিকচ কুসুম পুঞ্জ, মধুপ শবদ গঞ্জিগুঞ্জ
কুঞ্জর গতি গঞ্জি গমন, বঞ্জুল কুল নারী।"

১০। "নন্দ নন্দন চন্দ চন্দন গন্ধ নিন্দিত অংগ।
জলদসুন্দর কম্বু কন্দর নিন্দি সিন্ধুর ভংগ ॥"

১১। "গণ্ড মণ্ডন বলিত কুণ্ডল চূড়ে উড়ে শিখণ্ড।
কেলি তাণ্ডব তাল পণ্ডিত বাহু দণ্ডিত দণ্ড ॥"

১২। "মরকত মঞ্জু মুকুর মুখ মণ্ডল
মুখরিত মুরলী সুতান।"

এমন অসংখ্য অনুপ্রাস ব্যবহৃত হয়েছে বিভিন্ন পদের বিভিন্ন অংশে। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় এই যে কোন শব্দকেই জোর করে ব্যবহার করা হয় নাই, অত্যন্ত স্বাভাবিক ও সুস্পষ্টভাবে ছন্দ রক্ষা করে ব্যবহৃত হয়েছে।

উপমাবৈশিষ্ট্য

চতুর্থতঃ এসব সংগীত রচনার মধ্যে উপমাচাতুর্য খুবই উল্লেখযোগ্য, উপমার পরিধিও অসীম। রূপের বিভিন্ন অংশকে, বিভিন্ন ভাব, বিভিন্ন অবস্থাকে যথার্থরূপে উপস্থাপিত করবার জন্য বিভিন্ন ধরনের উপমা বিভিন্ন রচয়িতা

ব্যবহার করেছেন। যেমন, গোরা রূপের তুলনা দিতে গিয়ে বলেছেন—

১। "বিমল হেম জিনি কিয়ে অনুপম"
২। "লাখ বাণ কাঞ্চন জিনি"
৩। "দামিনী দাম দমন রুচি দরশনে"
৪। "জাম্বুনদ স্বর্ণ কি ছাড় লাবণ্য
গোরা রূপের কাছে কভু গণ্য নয়।"
৫। "কি ছাড় শারদ কোটী শশী"
৬। "শোণ কুসুম কিয়ে কিয়ে গণিয়ারে
প্রাতর অরুণ সন্তাপ।"
৭। "তরুণ কামের কোঁড়া"
৮। "মোতিম দরপন সিন্দুরে মাজল
হেরইতে কতই না সুখ।
মদন বেয়াধ কি নারী হরিণী ধরা
পাতিল নদীয়ামে ফাঁদ॥"

শ্রীকৃষ্ণের রূপ প্রসঙ্গে বহুবিধ উপমার উল্লেখ পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে চণ্ডীদাসের একটি পূর্ণ পদই আস্বাদনযোগ্য। পদটি হ'ল—

"সুধা ছানিয়া কেবা ও সুধা ঢেলেছে গো
তেমতি শ্যামের চিকন দেহা॥
অঞ্জন গঞ্জিয়া কেবা খঞ্জন আনিলরে
চাঁদ নিঙ্গাড়ি কৈল থেহা॥
থেহা নিঙাড়িয়া কেবা মুখানি বনালরে
জবা নিঙাড়িয়া কৈল গণ্ড।
বিম্বফল জিনি কেবা ওষ্ঠ গড়ল রে
ভুজ জিনিয়া করি শুণ্ড॥
কম্বু জিনিয়া কেবা কণ্ঠ বনাইল রে
কোকিল জিনিয়া সুস্বর।
আরদ্র মাখিয়া কেবা সারদ্র বনাইলরে
ঐছন দেখি পীতাম্বর॥
বিস্তারি পাষাণে কেবা রতন বসাইলরে
এমতি লাগয়ে বুকের শোভা।
দাম কুসুমে কেবা সুষম করেছেরে
এমতি তনুর দেখি আভা॥

আদলি উপরে কেবা কদলি রোপিলরে
ঐছন দেখি উরুযুগ।
অংগুলি উপরে কেবা দর্পণ বসাইলরে
চণ্ডীদাস দেখে যুগে যুগ॥"

তাছাড়া ১। "মুখমণ্ডল জিতি শারদ সুধাকর
তনুরুচি তরুণ তমাল।"
২। "নীলরতন কিয়ে নব ঘন ঘটা।"
৩। "বিকচ সরোজ ভাণ্ড মুখমণ্ডল।"
৪। "মরকত মঞ্জু মুকুর মুখ মণ্ডল।"
৫। "কানাড়া কুসুম জিনি শ্যামের বদনখানি···"
৬। "কুবলয় নীল রতন দলিতাঞ্জন
মেঘ পুঞ্জ জিনি বরণ সুছান্দ।"

অনুরূপ অসংখ্য উপমার উল্লেখ পাওয়া যায়।

পঞ্চম অধ্যায়

কীর্তনের গান

কীর্তন গানের সংশ্লিষ্ট কতগুলি বিশেষ ধরনের শব্দ আছে যেগুলির সৃষ্টিই হয়েছে কীর্তন গানের আঙ্গিক, পদ্ধতি বা সংস্কারের সূত্র ধরে। এ শব্দগুলির অন্যান্য ক্ষেত্রে কিছু প্রয়োগ দেখা গেলেও মূলতঃ এগুলি কীর্তন গানের সূত্র ধরেই সৃষ্টি হয়েছে এবং এগুলি কীর্তনের পরিভাষা বলেই পরিজ্ঞাত। এই পরিভাষাগুলির অর্থ যে কোন কীর্তনীয়া বা কীর্তন সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তি অনায়াসে বুঝে নেবেন কিন্তু সাধারণ লোকের পক্ষে এর অর্থ অনুধাবন করা কঠিন। এগুলি হল :

(ক) গান সম্পর্কিত : ১। দাগী গান, ২। জাত গান, ৩। তুক গান, ৪। বটুক গান, ৫। গৌরচন্দ্রিকা গান, ৬। ঝুমুর গান, ৭। লুট গান, ৮। গড়াণহাটি গান, ৯। মনোহরসাহি গান।

(খ) গানের আঙ্গিক সম্পর্কিত : ১। মুখ, পূর্বার্ধ ও উত্তরার্ধ, ২। আখর, ৩। ঘটকালি, ৪। পর্যায়, ৫। কাটান, ৬। ভনিতা।

(গ) সুর সম্পর্কিত : ১। আপত্তন, ২। সুরমিল, ৩। ভাতি, ৪। সুরের ভিয়ান, ৫। কোণাকুণি, ৬। গমক, ৭। চিতান।

(ঘ) তাল সম্পর্কিত—১। কোশী, ২। জোড়া, ৩। ছুট, ৪। ছোট, মধ্য, বড়, ৫। লঘু-গুরু, ৬। চাপড়।

(ঙ) খোলবাদ্য সম্পর্কিত : ১। হাত ও হাতুড়ি, ২। ঘাত, ৩। মাতন, ৪। মূর্ছন, ৫। টুকি, ৬। লহর, ৭। জুয়ানী, ৮। মেল বাদ্য।

(চ) গায়ক-বাদক সম্পর্কিত : ১। মূল গায়েন, ২। শির দোহার, ৩। বায় দোহার, ৪। শির বায়ান, ৫। বায়াটি বায়ান, ৬। কোল বায়ান, ৭। বকরা, ৮। পেয়ালা।

এসব পরিভাষাগুলির যথার্থ পরিচয় প্রসঙ্গক্রমে কোন কোন ক্ষেত্রে দেওয়া হলেও সম্পূর্ণ পরিচয় যথাসম্ভব সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হবে। তবে এ অধ্যায়ে কীর্তনের যেসব গান প্রচলিত আছে তার বিভিন্ন নাম সম্পর্কে আলোচনা করা হ'ল।

১। দাগী গান

পদাবলী কীর্তন এবং পালা কীর্তন মূলতঃ কতকগুলি গানের সমন্বয়। এ গানগুলির কেতাবী পরিচয় খুঁজলে হয়ত রাগ-রাগিণীর নাম পাওয়া যায় কিন্তু হিন্দুস্থানী পদ্ধতির রাগ-রাগিণীর পরিচয়ের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে দেখা যায় কোন ক্ষেত্রেই যথার্থভাবে প্রচলিত রাগিণীকে কাজে লাগানো হয়নি। এ নিয়ে বিতণ্ডার উদ্ভব হ'তে পারে কারণ কীর্তনের অনুগামীগণের

ভাষায় কীর্তনের সুরের একটি স্বকীয়তা আছে, এ সুর অন্য কোন রাগ-রাগিণীকে পদ্ধতিগতভাবে অনুকরণ করেনি। এ প্রসঙ্গে অন্যত্র আলোচনা আছে। তবে কীর্তন গানের সুরের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায় মূল গানের মুখের অংশটির পূর্বার্ধ ও উত্তরার্ধের সুরের সূত্রে। মুখের অংশটি বড় তালে গাওয়া হয়। প্রকৃতপক্ষে কীর্তনের গান শেখা বলতে ঐ বড় গানের অংশটি শেখাকেই বুঝায়। এ অংশে মূল গানের পর যে আখরের স্তর বা কাটান সংযোজন করা হয় তার সুর অনেক সময় অন্যান্য অনেক গানের কাটানের সুরের সঙ্গে মিশে যায়। কিন্তু যেসব ক্ষেত্রে মূল গানের মূল সুরটি অতুলনীয় বা একক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন সেগুলিকেই বলা হয় দাগী গান। দাগী গানের জোড়া গান থাকে না বলেই দাগী বা প্রসিদ্ধ গান বলে পরিচিত। পালা প্রকরণে বহু গান। এগুলির মধ্যে বেশির ভাগ গানের সুরের সঙ্গে অন্যান্য পালার অনেক গানের সুরের মিল পাওয়া যায় কিন্তু এমন দু' একটি গান থাকে যার সঙ্গে অন্য কোন গানের তুলনা চলে না। দাগী গান মাত্রেই বড় গান অর্থাৎ বিলম্বিত তালের গান এবং আকর্ষণীয় গান। এ ধরনের গানগুলির মধ্যে কতকগুলির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। এ গানগুলির সম্পর্কে অনেক প্রাচীন গায়ক-বাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি—তাঁদের সকলের মত অনুসারে এ গানগুলিকে দাগী গান বলে মানা হ'ল।

ক। গৌর প্রসঙ্গ প্রকরণে—

১। জয় জগতারণ কারণ ধাম	(বড় দশকোশী
২। গোরা বড় পতিতপাবন	”
৩। কাচা কাঞ্চন	”
৪। প্রেম সিন্ধু গোরা রায়	”
৫। জয়রে জয়রে গোরা শ্রীশচীনন্দন	”
৬। দামিনী দাম দমন রুচি দরশনে	”
৭। লাখ বাণ কাঞ্চন জিনি	”
৮। গোরা নাচে প্রেম বিনোদিয়া	”
৯। দেখি গোরা নীলাচল নাথ	”
১০। কোথায় আছিল গোরা এমন সুন্দর	(থামশা)
১১। বিমল হেম জিনি	(মধ্যম দশকোশী)

খ। বিভিন্ন লীলা প্রকরণে—

১। আমার শ্যামের মুখখানি যেন	(বড় দশকোশী)
২। বিকচ সরোজ ভাণ্ড মুখমণ্ডল	”
৩। অরুণিত চরণে রণিত মণি মঞ্জীর	(মধ্যম দশকোশী)
৪। দুটি ভুরু কামেরি কামান	(বড় বীরবিক্রম)

৫। সজনিলো কি বরণের কতই রূপের কানু (বড় বীরবিক্রম)
৬। সজনিলো সই খানিক বৈস শ্যামের
বাঁশীর কথা কই
৭। চঞ্চল নীলনলিনী দল নয়নী

মধ্যম বীরবিক্রম তালের দাগী গান :

১। খেলে রাম খেলে রাম খেলে রামকানাই। (গোষ্ঠ)
২। গোঠের মুরলী ধ্বনি শ্রবণে পশিল। „
৩। রাই তনু রতন ভাণ্ডার। (অভিসার)
৪। নাচে রাম রাম রাম কানু। (বাল্যলীলা)
৫। এমন হইবে কেবা জানে।
তবে কি চাইতাম শ্যাম পানে॥ (রূপানুরাগ)

বড় শশিশেখর তালের দাগী গান :

১। মরি মরি শ্যামের বদন ছটার কিবা ছবি। (রূপানুরাগ)
২। বড়াই মানা করগো দানী যেন না ছোঁয় আমায়। (দান)
৩। হেদেহে নিলাজ কানাই কে তোমারে কৈল মহাদানী। „
৪। শুনলো বড়াই বুড়ি তুই সে নাটের গুড়ি
আনিয়া ঘটালে পরমাদ। „
৫। প্রভাতে পরের বাড়ী কোন লাজে আইস। (খণ্ডিতা)
৬। বাজত সব গোঠবাজনা। (গোষ্ঠ)
৭। জাগহু বৃষভানু নন্দিনী। (কুঞ্জভঙ্গ)

মধ্যম শশিশেখর তালের দাগী গান :

১। দুঃখিনী ব্যথিতের বন্ধু শুন দুঃখের কথা। (মাথুর)
২। কেমনে তোমার সঙ্গে পীরিতি করিব হে। (দান)
৩। উঠিল নাগরবর নিদের আলিসে। (কুঞ্জভঙ্গ)

মহামণ্টক তালের দাগী গান :

১। এই পথে কেমনে যাবে তুমি। (দান)

বড় ইন্দ্রভাষ তালের দাগী গান : (একটিমাত্র)

১। সুন্দরি কি লাগিয়া আইলা দূরদেশে। (রাস)

মধ্যম ইন্দ্রভাষ তালের দাগী গান—(একটিমাত্র)

১। কোথা যাওগো গোয়ালিনী কোথা তোমার ঘর। (দান)

বড় আড় তালের দাগী গান :

১। দানী দেখি কাঁপিছে শরীর। (দানলীলা)
২। রাই কানু যমুনারি মাঝে। (নৌকাবিলাস)
৩। ধনি পহিলে চাপিলা গিয়া নায়। (নৌকাবিলাস)

৪। ধনি ধনি রমণী জনম ধনী তোর। (কৃষ্ণের পূর্বরাগ)
৫। শোন বিনোদিনী বিনোদ নাগর।
বাঁশী বাজায় কার ছলে, বিনোদ কদম্বতলে। (রূপাভিসার)
৬। শ্যাম নাগর অতি বেগে ঝুলায়। (ঝুলন)
৭। চারুশীলে মঞ্জময়ী মানমনি দানমু। (কলহান্তরিতা)
৮। কোন কুঞ্জে সই বাজে ঐ মুরলী। (অভিসার)
৯। বধু কহিলে বাঁশী বাজুক। (অভিসার)
১০। জাদু আমার নবীন রাখাল। (গোষ্ঠ)
১১। ফিরিয়া আপন ঘরে যাও। (আক্ষেপানুরাগ)
১২। কেন গেলাম যমুনারি জলে। (রূপানুরাগ)
১৩। হেম ঘট পাইয়া পাথারে। (দান)

খামশা তালের দাগী গান :
১। কানাই না কর এতেক চাতুরালী। (দানলীলা)
২। কৈছে চরণ করপল্লব ঠেললি। (কলহান্তরিতা)

তেওট তালের দাগী গান :
১। ওগো ওমা দেদে নবনী আনি দেমা। (বাল্যলীলা)
২। ওগো ওমা নন্দরাণী ভেবোনা। (গোষ্ঠলীলা)
৩। গর গর মাধব বৈঠল কুন্ডকীতীর। (শ্রীকুন্ডমিলন)
৪। খেলা সমাধিয়া শ্রমযুত হৈয়া। (উত্তর গোষ্ঠ)
৫। রামকানাই যমুনারি তীরে। (খেলা গোষ্ঠ)
৬। উড়নী পড়েছে ভূঞে ঘাম চুয়াইছে মুঞে। (দান)
৭। ওগো ওমা নন্দরাণী তোমার গোপাল
কি জানএ মোহিনী। (উত্তরগোষ্ঠ)
৮। গোখুর ধূলি উছলি ভরু অম্বর। (উঃ গোষ্ঠ)
৯। নিজগাদ সাজ যদুনন্দনে। (কুঞ্জভঙ্গ)
১০। বেশ বনাই পহিরি পুন সারি (কুঞ্জভঙ্গ)
১১। মাধবে মা কুরু মান মানিনী। (কলহান্তরিতা)
১২। কুসুমাবলিভি। (বাসকসজ্জা)
১৩। কুন্দকুসুমে করু কবরিক ভার। (রূপাভিসার)
১৪। সাজল ধনি চন্দ্রবদনী। „
১৫। ঐছন বচন কহল যব কান। (রাস)
১৬। কাঁদিতে না পাই বধু কাঁদিতে না পাই। (সাক্ষাৎ আক্ষেপ)
১৭। সংকেত কুঞ্জেতে আসি ভানুর নন্দিনী। (বাসকসজ্জা)
১৮। জয়রে জয় বৃষভানুতনি। (অভিসার)

১৯। পুত্রমুদারমসূত যশোদা। (নন্দোৎসব)
২০। নীল রতন কিএ নব ঘন ঘটা। (রূপানুরাগ)
২১। সীদতি সখি মম হৃদয়মধীরম্। (কলহান্তরিতা)

বড় দশকোশী তালের দাগী গান :

১। কালি দমন দিন মাহ। (কৃষ্ণের পূর্বরাগ)
২। সহচরি চতুরত বরজ কিশোর। (কলহান্তরিতা)
৩। শুন ওরে সুবল ভাই। (দান)
৪। তুহুঁসে রহলি মধুপুর। (মাথুর)
৫। এ দধিমন্থন কালে। (গোষ্ঠ)

মধ্যম দশকোশী তালের দাগী গান :

১। অরুণিত চরণে রণিত মণি মঞ্জীর। (রূপানুরাগ)
২। অঞ্জন গঞ্জন কিয়ে দলিতাঞ্জন। „
৩। স্বর্ণ বরণ বিবর্ণ ভৈ গেল। (কলহান্তরিতা)
৪। কি কহিলি কঠিনি কালি দহে পৈঠবি। „
৫। বেলি অবসান কালে একা গিয়েছিলাম জলে। (রূপানুরাগ)
৬। সে যে ধনি রমণী মুকুটমণি। (কৃষ্ণের পূর্বরাগ)
৭। কামিনী কি একাকিনী। (রূপাভিসার)
৮। ওগো ওগো রামের মা গোপাল নাচিছে তুড়ি দিয়া। (বাল্যলীলা)
৯। চাঁদ বদনী ধনি চলু অভিসারে। (অভিসার)
১০। ছি ছি কানাই ছুঁইও না। (দান)
১১। অপরূপ পেখলুঁ রামা। (কৃষ্ণের পূর্বরাগ)
১২। যো দিন মাধব পয়ান করল। (মাথুর)
১৩। কালা গরলের জ্বালা (ধরা / মধ্যম—রূপানুরাগ)
১৪। চরণ নখরমণি রঞ্জিত ছাঁদ। (কলহান্তরিতা)
১৫। সজনী ও ধনী কে কহ বটে। (কৃষ্ণের পূর্বরাগ)
১৬। নাচত গোর রাস রস অন্তর। (রাস)
১৭। সুরত সমাপি শুতল বর নাগর। (রসালস)
১৮। সৌন্দর্য্য অমৃত সিন্ধু। (শ্রীকুণ্ড মিলন)
১৯। হরি অভিসারে চলু বিনোদিনী রাধা। (অভিসার)
২০। ঐছন বচন কহল যব কান। (কলহান্তরিতা)

দাসপ্যারী তালের দাগী গান :

১। সই তোরে বলি গো নাগর বড় রসিয়া। (রূপানুরাগ)
২। আলো সই কিনা জ্বালা কালা কানুর পীরিতে। „
৩। মুই ত আগে জানু না।

৪। অব চিত ধরণে না যায় মুরলীক গান শুনিয়ে। (রূপাভিসার)
৫। কোন কামিনী করত সিনান। (কৃষ্ণের পূর্বরাগ)
৬। চন্দ্রবদনী ধনী মৃগনয়নী। (রূপাভিসার)
৭। কেবা জানে ও বেশ বনাইতে। (রূপানুরাগ)
৮। এত বড় মিঠ লাগে ভাইরে কানাই। (খেলা গোষ্ঠ)
৯। পশ্য মিলতি বনমালী। (উত্তর গোষ্ঠ)
১০। ওমা নন্দরাণী ভাসে আনন্দসাগরে। „
১১। এমন কালিয়া চাঁদে কে বনাইল বেশ। (রূপানুরাগ)
১২। কেন গেলাম জল ভরিবারে। (গঞ্জন)
১৩। ওমা কালা কোল কদম্বতলে। „
১৪। আজুরে সিংগারে ধনিরে চলু বালা। (অভিসার)

রূপক তালের গান :
১। দিন দয়ার্দ্র নাথ মথুরানাথ। (মাথুর)
২। মান বিরহ জ্বরে। (কলহান্তরিতা)
৩। নট কৈল কুল অভিমান। (রূপানুরাগ)
৪। শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ। (প্রার্থনা)

দুঠুকী তালের দাগী গান :
১। বিপিনে গোবিন্দ বাঁশী পুরে মন্দ। (রূপাভিসার)
২। বৃষভানু কুমারী নন্দকুমার। (হোরী)

একতালি (৮ মাত্রার) :
১। বিনোদ শ্যামেরি রূপ হেরিলে। (রূপানুরাগ)

এছাড়া বিভিন্ন তালের আরও অসংখ্য গান আছে যেগুলি দাগী বলে পরিচিত। বেশীর ভাগ গানই লুপ্ত হয়ে গেছে তবে তালিকাভুক্ত গানগুলির কিছু কিছু এখনও কতিপয় প্রাচীন গায়কের সাহায্যে বিস্মৃতির অন্তরাল থেকে উদ্ধার করা যেতে পারে। কোন একজন গায়ক কোন-কালেই সমস্ত গানগুলি জানতেন না। বিভিন্ন গায়ক বিভিন্ন গানটি ভাল জানতেন। সেই সেই সূত্র থেকে এখনও কিছু কিছু গান পাওয়া যেতে পারে। এর মধ্যে অনেক গান আছে যেগুলি নিজেই একটি করে ইতিহাস, আবার এমন অনেক গান আছে যে গান নিজেই একটি সংগীততত্ত্বকে ধরে রেখেছে! এসব অনেক গানে শিক্ষার সূত্র নিয়ে কিছু কিছু জনশ্রুতি প্রচলিত ছিল। যেমন "ধনি ধনি রমণী জনম ধনি তোর"—গোবিন্দদাসের রচিত এ গানখানি বড় আড়তালে বিশেষ সুরে গাওয়া হ'ত। মালদহ অঞ্চলে কোন এক আসরে দামোদর কুণ্ডু মহাশয় প্রথম গানটি শোনালেন। তখনকার দিনের শ্রেষ্ঠ মূল গায়েন রাধিকা সরকার মহাশয়ও ঐ আসরে একজন গায়ক হিসাবে আমন্ত্রিত ছিলেন। মানী হিসাবে রাধিকা সরকারই ছিলেন বেশী

সম্মানিত। সরকার মুলগায়েন গানটি শুনেছেন এবং ঐ গানটি শেখার তাঁর খুবই ইচ্ছা কিন্তু সেকালে কোন গায়কের কাছে একখানা গান শিখতে গেলে মাথা নোয়াতে হ'ত। সরকার মহাশয় তাই খুব চিন্তায় পড়ে গেলেন। পরদিন সকালে আকস্মিক কুণ্ডু মহাশয়ের এক দোহার এসে সরকার মহাশয়ের ঘরে উপস্থিত। তারপর নানাবিধ আলাপ আলোচনার পর গানটির প্রসঙ্গ উঠতে দোহারটি অনেকক্ষণ বসে বার বার গানটি আলোচনা করলেন আর সেই সুযোগে রাধিকা সরকার গানটি শিখে নিলেন। দোহারটি চলে যাবার পর সরকার মহাশয় খোঁজ নিয়ে জানলেন যে দোহারটি যে নামে পরিচয় দিয়ে গেছেন সে নামে দামোদর কুণ্ডুর দলে কোন দোহার নেই। সমগ্র ঘটনাটিই সরকার মহাশয়ের কাছে তখন অলৌকিক বলে মনে হতে লাগল। রাত্রিতে স্বপ্নাদেশে তিনি জানতে পারলেন যে স্বয়ং মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য দোহারের রূপ ধারণ করে সরকার মুল গায়েনের তীব্র বাসনা নিবৃত্ত করেছিলেন। এমন নানাবিধ প্রবাদ বিভিন্ন গানের ক্ষেত্রে প্রচলিত আছে। 'জয় জগতারণ কারণ ধাম'—খেতরী মহোৎসবে গাওয়া প্রথম গান, গরাণহাটি পদ্ধতির অভিনব বড় দশকোশী গান—এটি ঐতিহাসিক তথ্য। "কালিয়া দমন দিন মাহ"—গোবিন্দ দাস বিরচিত এই বড় দশকোশী তালের গানটির শেষ অংশে আঠার কাটানের ঝুমড়া আছে। এ অংশে শ্রুতি, পাকছটা পোট ইত্যাদি বিভিন্ন ভাগে বাদ্য প্রয়োগ করে বিলম্বিত থেকে মধ্য হয়ে দ্রুত আবার মধ্যলয় হয়ে বিলম্বিতে শেষ অর্থাৎ প্রাচীন তালতত্ত্বের ডমরু যতির প্রয়োগ এ গানে এখনও আছে। এ জন্যই বলা হয় যে প্রাচীন দাগী গানের সূত্রে অনেক প্রাচীন সংগীততত্ত্বকে ধরে রাখা হয়েছে। প্রতিটি দাগী গান একটি করে সুর। কীর্তনের গানগুলিতে রাগরাগিণীর পরিচয় গানের সর্বাত্মক পরিচয় নয়, গানের পরিচয় হ'ল গানের প্রথম চরণের কথা বা ভাষা। শুধু ঐ কথা কটিই হ'ল গানটির নাম আর ঐ নাম শুনেই সবাই বুঝতে পারে গানের কি সুর আর কি তাল। যে কোন গায়ক, বাদক বা নিয়মিত শ্রোতাই গানের পরিচয় জানেন। প্রতিটি দাগী গান একটি করে সুরকে ধরে রেখেছে।

২। জাত গান

কীর্তন গানের সংশ্লিষ্ট একটি বিশেষ পরিভাষা হ'ল 'জাত গান'। 'জাতি গান' শব্দের অপভ্রংশস্বরূপ 'জাত গান' শব্দটি কীর্তনে প্রচলিত হয়েছে। 'জাতি' শব্দটির ব্যবহার সংগীত ক্ষেত্রে নানাভাবে বিভিন্ন সময় ব্যবহার হয়েছে। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে উল্লেখ আছে সাতটি শুদ্ধ জাতি এবং এগারটি বিকৃত জাতি অর্থাৎ মোট আঠারটি জাতি রাগ। এই জাতি রাগের প্রত্যেকটি হ'ল একটি ক'রে রাগের জাতি সেজন্য অনেকে এই জাতি রাগকে বর্তমান রাগপদ্ধতির পিতামহ বলে গণ্য করে থাকেন। দশলক্ষণ সমন্বিত এই জাতিগুলি প্রাচীন

রাগগীতির মূল ধারা। দশলক্ষণ হ'ল—

১। গ্রহ, ২। অংশ, ৩। তার, ৪। মন্দ্র ৫। ন্যাস, ৬। অপন্যাস, ৭। অল্পত্ব, ৮। বহুত্ব, ৯। ষাড়ব এবং ১০। ঔড়ব।

এই দশটি লক্ষণ প্রযুক্ত জাতিগুলি যেমন এক একটি শ্রেণীর পরিচায়ক তেমন পরবর্তীকালে রাগগুলিকেও স্বরসংখ্যা ব্যবহারের ভিত্তিতে নয়টি জাতিতে বিভক্ত করা হয়েছে। এগুলি হ'ল রাগের জাতি রাগভিত্তিক আরোহণ ও অবরোহণের স্বরসংখ্যার ভিত্তিতে এগুলির নিম্নরূপ নামকরণ হয়ে থাকে। যেমন—

১। সম্পূর্ণ—সম্পূর্ণ, ২। সম্পূর্ণ—ষাড়ব, ৩। ষাড়ব—সম্পূর্ণ। ৪। ষাড়ব—ষাড়ব, ৫। সম্পূর্ণ—ঔড়ব, ৬। ঔড়ব—সম্পূর্ণ, ৭। ঔড়ব—ঔড়ব, ৮। ঔড়ব—ষাড়ব, এবং ৯। ষাড়ব—ঔড়ব।

যে কোন রাগ এই নয় প্রকার কোন না কোন জাতির অন্তর্ভুক্ত হবে। তা' ছাড়া সংগীতের তালের দশপ্রাণের একটি প্রধান প্রাণ হ'ল 'জাতি'। তালের মাত্রা-সংখ্যার উপর নির্ভর করে জাতি। এগুলির নাম হ'ল—১। ত্র্যস্র, ২। চতুরস্র, ৩। খণ্ড, ৪। মিশ্র ও ৫। সংকীর্ণ। সুতরাং সংগীতের নানা ক্ষেত্রে নানাভাবে জাতি শব্দটির ব্যবহার দেখা যায়। ঠিক সেই কারণেই কীর্তনের গানগুলির শ্রেণী প্রকরণের জন্যও 'জাতি' শব্দটির ব্যবহার করে 'জাতি গান' এবং গ্রামীণ ভাষায় অপভ্রংশস্বরূপ 'জাত গান' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

কীর্তনের দাগী গানগুলি যেমন বনেদি গান, 'জাত গান'গুলিও তেমন অভিজাত গান। এর মধ্যে সুর ও তালের আভিজাত্য থাকে। 'জাত গানের' গাইয়ে, 'জাতগানের দোহার' কিংবা 'জাত গানের বাজিয়ে' পাওয়া কঠিন। প্রকৃত-পক্ষে রাঢ় দেশের কীর্তন এই জাতের আভিজাত্যেই সমৃদ্ধ। জাত গান বলে যে গানটিকে চিহ্নিত করা হয় ঠিক সে গানটির সুরে ও তালে আরও বেশ কিছু গান থাকে। অর্থাৎ গানটির সুর ও তাল অভিজাত পদ্ধতির এবং একই সুর ও তালে আরও যে কয়টি গান গাওয়া হয় এই সবগুলিই 'জাত গান'। সুতরাং 'জাতগান' একটি শ্রেণীকে বোঝায় এবং সুর ও তালের তারতম্যানুসারে, 'জাতগানের' সংখ্যাও কম নয়। 'দাগী গান'গুলি বাদ দিলে অন্যান্য বড় গানগুলির সবই কোন না কোন একটি 'জাত গানের' শ্রেণীর অন্তভুর্ক্ত হয়ে পড়ে। 'জাত গানে'র জাতের নাম খুব নির্দিষ্ট না থাকলেও প্রধানতঃ গানের প্রথম চরণের অংশটির কথা ক'টি দিয়ে গানের পরিচয়টি পাওয়া যায়। যেমন বলা হয় গানটি হ'ল—'নিরমল গোরা তনুর জোড়া গান' কিংবা বলা হয় 'চব্বিশ চাপড়ের ধরা তাল' আবার বলা হয় মায়ুর তেওট, বিভাস তেওট, গৌরী তেওট, মল্লার তেওট, বেহাগ তেওট বা আলেয়া তেওট ইত্যাদি, মধ্যম দশকোশীর ক্ষেত্রে বলা হয়, যেন 'অনুক্ষণ হেরি সখা'র মত গৌরী মধ্যম, 'চূড়াটি বাঁধিয়ার জোড়া মধ্যম গান,' তা ছাড়া দুঠুকী, একতালি ক্ষেত্রে কয়েকটি নির্দিষ্ট সুর আছে। এগুলি জাত গানের সুর বলেই গণ্য।

প্রত্যেক পালায় যে গৌরচন্দ্রিকা গানটি গাওয়া হয় তার সুর, একমাত্র বিশেষ দাগী গান ছাড়া, অন্য কোন একটি গানের সুরের অনুরূপ এবং সেটিই জাত সুর। গৌরচন্দ্রিকা সাধারণতঃ বড় দশকোশী তালের তিনটি প্রকরণেই গাওয়া হয়। এই প্রকরণ তিনটি হ'ল—১। সম তাল, ২। যোত সম বা বড়যতি তাল এবং ৩। বড় দশকোশী তাল। এই তিন প্রকার তালের গৌরচন্দ্রিকা গানের সুর সাধারণতঃ তিন প্রকার এবং ঐ প্রকার স্রষ্টার আমল থেকেই সৃষ্টি হয়ে আছে।

ক। সমতালের জাত সুরের গৌরচন্দ্রিকা গান :

১। গোরা অনুরাগে মোর পরাণ কাতরে। (রূপানুরাগ)
২। মরমে লেগেছে গোরা না যায় পাসরা। ,,
৩। আজুরে গৌরাঙ্গের মনে কিভাব পড়িল (দান)
৪। বিরস বদনে গোরা কেন বসে আছে। (পূর্বরাগ)
৫। নদীয়া ছাড়িয়া গেল গৌরাঙ্গ সুন্দর। (মাথুর)
৬। কহ সখি জীবন উপায়। (মাথুর)
৭। আজুরে গৌরাঙ্গের ঘাটে অদান খেয়া বয়। (নৌকাবিলাস)
৮। শুতিয়াছে গোরাচাঁদ শয়নমন্দিরে। (কুঞ্জভঙ্গ)
৯। অলসে অরুণ আঁখি। (খণ্ডিতা)

খ। যোত সমের গৌরচন্দ্রিকার জাত সুরের গান :

১। মান বিরহ জ্বরে পহু ভেল ভোর। (কলহান্তরিতা)
২। আজু হাম কি পেখলুঁ নবদ্বীপচন্দ্র। (রূপানুরাগ)

গ। বড় দশকোশী তালের গৌরচন্দ্রিকার 'জাত' সুরের গান :

১। নিরমল গোরা তনু। (রূপানুরাগ)
২। গৌরাঙ্গ লাবণ্য রূপে। ,,
৩। দামিনী দাম (প্রচলিত)। (রূপাভিসার)
৪। সিংহদ্বার ত্যজি গোরা। (মাথুর)

ঘ। মধ্যম দশকোশীর জাত সুর। মধ্যমের জাত গানের সুর বেশ কয়েকটি আছে তার মধ্যে যেগুলি এখনও বিশেষ প্রচলিত তার তালিকা নিম্নরূপ :

১। অনুক্ষণ হেরি সখা। (কৃষ্ণের পূর্বরাগ)
২। পাল জড় কর শ্রীদাম। (উত্তর গোষ্ঠ)
৩। নীলপীত ধড়া নন্দ। (গোষ্ঠ)
৪। চূড়ার উপরে মত্ত। (রূপানুরাগ)
(নীলরতন গানের দ্বিতীয় চরণ)

ঙ। মধ্যম দশকোশী দ্বিতীয় প্রকরণ :
(সম তাল গৌরচন্দ্রিকার উত্তরার্ধগুলির সুর)

১। নিরবধি ছল ছল আঁখি জল ঝরে। (গোরা অনুরাগের)

২। নয়নে অঞ্জন হয়ে লাগিয়াছে পারা। (মরমে লেগেছে গোরার)
৩। সুরধুনী তীরে গোরা দান সিরজিল। (আজুরে গৌরাঙ্গের মনে)
৪। ডুবল ভকত সব শোকের সায়রে। (নদীয়া ছাড়িয়া গেল)

চ। মধ্যম দশকোশী জাত সুরের তৃতীয় প্রকরণ :
১। যত রূপ তত বেশ। (রূপানুরাগ)
২। গোপাল নাকি যাবে। (গোষ্ঠ)
৩। হরি গেয় মধুপুর। (মাথুর)

ছ। মধ্যম দশকোশীর জাত সুরের চতুর্থ প্রকরণ :
১। তোহারিক হৃদয় বেণী বদরিকাশ্রম। (দান)
২। কুঞ্জস নিকশই মানিনী রাই। (কলহান্তরিতা)
৪। অল্প বয়সে মোর। (রূপানুরাগ)

জ। ধরা তালের জাত সুর। (চব্বিশ চাপড়ের গান :
১। মুখমণ্ডল জিতি শারদ সুধাকর। (রূপানুরাগ)
২। আধল প্রেম পহিলে নাহি হেরনু। (কলহান্তরিতা)
৩। বরজ বালক সঙ্গে। (দান)
৪। এই না মাধবী তলে। (মাথুর)

(ময়নাডালের পদ্ধতি এ গানটি বিশ চাপড়ের ধরা এবং এটিকে পোট ধরা বলা হ'ত।—উক্তিটি রাসবিহারী মিত্র ঠাকুরের ছাত্র প্রয়াত কানাইলাল গুহ মহাশয়ের।)

৫। উজর হার উর পীতবসন। (রূপানুরাগ)
৬। চরণ লাগি হরি হার পিন্ধায়ল। (কলহান্তরিতা)
৭। ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার। (পূর্বরাগ)

ঝ। তেওট তালের বেশ কয়েক প্রকার জাত গানের সুর আছে। এগুলির পরিচয় ক্ষেত্রে রাগিণীর নাম উল্লেখ করে বলা হয়। যেমন—

(ক) মায়ুর তেওট, (খ) বিভাস তেওট, (গ) গৌরী তেওট, (ঘ) বেহাগ তেওট, (ঙ) আলেয়া তেওট, (চ) মল্লার তেওট ইত্যাদি।

মায়ুর তেওট :
১। মরকত মঞ্জু মুকুর মুখমণ্ডল। (রূপানুরাগ)
২। প্রেমকি অঙ্কুর। (মাথুর)
৩। নির্বান্ধব হ'ল পুরী। (মাথুর)
৪। না যাইও না যাইও রাই। (দান)
৫। শুনইতে কানু (প্রচলিত)। (কলহান্তরিতা)
৬। কাঞ্চন মণি গণ। (রাস)
৭। আঁধার বরণ কালো গা। (দান)

৮। টলমল অলকা তিলক ঝলঝলকই। (রূপানুরাগ)
৯। যো হাম মান বহুত করি মানলু। (কলহান্তরিতা)

বিভাস তেওট :

১। সোবর নাগর রাজ। (রূপানুরাগ)
২। বধূরে দেখিতে সাধ লাগে। ,,
৩। পেখলুঁ শ্যাম। ,,
৪। নিগদ নিজংগদমুদম্। (পূর্বরাগ)
৫। তুহু সে রহলি মধুপুর (প্রচলিত)। (মাথুর)
৬। কান্দিয়া সাজায় নন্দরাণী (প্রচলিত)। (গোষ্ঠ)

গৌরী তেওট—১। চিকণ কালিয়া রূপ। (রূপানুরাগ)
বেহাগ তেওট—১। ঐছন বচন কহল যব কান। (রাস)
আলেয়া তেওট—১। সীদাতি সখী মম। (কলহান্তরিতা)
মল্লার তেওট—১। নীলরতন কিয়ে। (রূপানুরাগ)

ঞ। দুঠুকী তালের গানের জাত সুর বেশ কয়েকপ্রকার আছে। যেমন,

প্রথম প্রকার :

১। কি হ'ল অন্তরের ব্যথা। (পূর্বরাগ)
২। সজনী ও ধনী কে কহ বটে। (কৃষ্ণের পূর্বরাগ)
৩। ওই কি ঘাটের নেয়ে। (নৌকাবিলাস)
৪। সুন্দরী শুনহ আজুক কথা। (দান)

দ্বিতীয় প্রকার :

১। কি রূপ হেরিনু মধুর মুরতী। (রূপানুরাগ)
২। কি রূপ হেরিলাম কালিন্দীর কূলে। (রূপানুরাগ)
৩। সুবলে নাগরে কহিছে কথা। (পূর্বরাগ)
৪। সো হেন রসিক নাগরের সনে। (কলহান্তরিতা)

তৃতীয় প্রকার :

১। মধুকর রঞ্জিত মালতী মণ্ডিত। (রূপানুরাগ)

চতুর্থ প্রকার :

১। শুন সুন্দর শ্যাম ব্রজবিহারী। (প্রার্থনা)
২। বহুদিন পরে বঁধুয়া এলে। (মাথুর)
৩। একদিন শেষে রসভ কাজ। (মালিনী মিলন)

এগুলি ছাড়া আরও বিভিন্ন তালে বহুপ্রকার জাত সুর আছে। যেমন একতালি তালের কয়েকটি নির্দিষ্ট সুর আছে—(ক) গৌরচন্দ্রিকা গানে ব্যবহৃত, (খ) সূচক গানে ব্যবহৃত ইত্যাদি। তাছাড়া কাটা দশকোশী, কাটা ধরা ইত্যাদি তালগুলির গানের নির্দিষ্ট সুর আছে। গানের পদও অবশ্য প্রাচীন কাল থেকেই

নির্দিষ্ট আছে। বর্তমানে পালাকীর্তনে বড় বড় প্রাচীন যে কয়েকজন গায়ক আছেন তাঁরা এই জাত গানের সুর নিয়ে কয়েকটি নির্দিষ্ট জাত গান সংকলন করেই সাধারণতঃ পালা প্রকরণ সৃষ্টি করে থাকেন। যাই হোক জাত গানের বিভিন্ন তালের সুরগুলি হ'ল প্রাচীন নিদর্শক সুর, এই এবই সুরে অনেক গান ছিল, অনেক গান পরিচয় হারিয়েছে আবার অনেক গান এখনও কোন মতে বেঁচে আছে।

৩। তুক গান

প্রাচীন পদাবলী কীর্তন গানের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, গানটির সমাপ্তি পর্যায়ে লেখকের বা রচয়িতার নামোল্লেখ থাকে। এই নামোল্লেখকে বলা হয় ভনিতা। 'ভণা' শব্দটির আভিধানিক অর্থ 'বলা'। যিনি বলেন, তাহাকে বলা হয় ভণয়িতা, এই শব্দটির চলিত বা অপভ্রংশ স্বরূপ ভনিতা। কথাটি সঙ্গীতে প্রচলিত। পদকর্তার নামোল্লেখ না থাকলে সেই গানটি ভক্ত শ্রোতাদের নিকট সাধারণতঃ মনোগ্রাহী হয় না। মহাজনদের নির্দিষ্ট তালিকা আছে। কিন্তু কীর্তন গানের ভাণ্ডারে এমন কতকগুলি গান আছে, যা ভাবরসসমৃদ্ধ এবং বহুলপ্রচারিত। গুরুপরম্পরায় গানগুলি গীত হয়ে থাকে। কিন্তু পদগুলির কোন ভনিতা নাই। এ গানকেই তুকগান বলা হয়। তুক অর্থে সঙ্গীতের অংশ বোঝায়। এর থেকেই অনুমান করা যায় কোন একটি দীর্ঘ পদের অংশবিশেষ গায়ক কর্তৃক গীত হয় বলে এটিকে তুক গান বলা হয়। এরূপ তুক গানের সংখ্যা অনেক। এই সব গানগুলি যে কাব্যিকছন্দে নিবদ্ধ থাকে, ঠিক তা নয়, অনেক গান আবার গদ্যছন্দেই লেখা। এর মধ্যে অনেক দাগী গানও আছে। অনেক লীলা প্রসঙ্গেই এ গান গাওয়া হয়।

অভিসার পর্যায়ে বিশিষ্ট গানগুলির মধ্যে—

কামিনী কি একাকিনী বনে যায় ঘোর যামিনীতে।
ঘোর নিশীথে কেমনে যাবে হরি দরশনে।

এই দুটি চরণ নিয়ে একটি গান, মধ্যম দশকোশী তালে দাগী গানের পর্যায়ভুক্ত।

অব চিত ধরণে না যায় মুরলীকো গান শুনিয়ে॥
মুরলীরে তোর গানে মৃত তরু মুঞ্জরয়ে রে।
দরবহী দারুমুঞ্জরে নব পল্লব রে
মীন মকর সব উর্ধ্বমুখে চায়॥

দাসপ্যারী তালের এই গানটি অতি প্রসিদ্ধ। এর জোড়া আর কোনও গান শুনতে পাওয়া যায় না। একারণে এটিকেও দাগী গানের পর্যায়ভুক্ত করা চলে। অভিসারের আর একটি উল্লেখযোগ্য তুক গান "কোন কুঞ্জে সই বাজে ঐ মুরলী।"

গানটি আড় তালে নিবন্ধ। অভিসার অন্তে মিলন পর্যায়ে একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ তুক গানেরউল্লেখ আছে—

"আরে ধনি প্রবেশিল রে কুঞ্জকুটিরে।
রাধাশ্যাম দুহুঁজনে বৈঠল একাসনে।
হেরি সখী আনন্দে বিভোর ;"

গানটির প্রথমাংশে শশিশেখর তাল, তারপর যথাক্রমে রূপক, গঞ্জন এবং সম তালে 'বদসি যদি' গানের অনুরূপ তালগুচ্ছ এই গানটিতেও দেখা যায়। তাছাড়া মিলন পর্যায়ে অন্য আর যে সকল গান আছে, সেগুলি তেমন উল্লেখযোগ্য নয়।

দানলীলা পর্য্যায়ে শশিশেখর তালে যে প্রসিদ্ধ তুকগানটি আছে, তা হ'লো "বড়াই মানা কর গো, ঐ দানী আমারে যেন ছোয় না। কি খেনে বাড়াইলাম ঘর হতে পাগো তাতো আগে জানি না। বড়াই তোর কথা শুনে॥ তুই সে নাটের গুরিলো ওগো বড়াই বুড়িলো আ ছি ছি ছি, রাখাল হয়ে দানী আমায় ছুঁতে আসে।" এই সম্পূর্ণ গানটি বড় শশীশেখর তালে। অবশ্য এর পর "তোর দানী যা চাহে আমি তাহাই দিব, দানী যেন ছোয় না।" এই অংশটুকু একতালিতে গাইতে শোনা যায়। বড় দশকোশী তালে তুক গানের মধ্যে কলহান্তরিতা পর্যায়ে "সহচরী চুরত বরজ কিশোর" গানটি প্রসিদ্ধ। পূর্বরাগ পর্যায়ে মধ্যম দশকোশী তালের প্রসিদ্ধ তুক গান "সে যে ধনি রমণীমুকুটমণি, ধন্যা ধনী, রূপে গুণে ত্রিভুবনে শ্রীবৃন্দাবনে নাম হল যাঁর রাইরঙ্গিনী।" এই গানটিতে যে সকল আখর সংযোজন করা হয়, তা নিচে দেওয়া হ'ল।

১। যদ্যাপি তোমার রূপে ভুলায় ত্রিভুবন, তাও সত্য মেনে নিলাম, কিন্তু আমার রাইয়ের রূপে ভোলে তোমায় নয়ন।

২। যদ্যাপি তোমার বংশীরব করে আকর্ষণ।
তাও সত্য মেনে নিলাম—
কিন্তু আমার রাইএর কণ্ঠধ্বনি মাতায় তোমার শ্রবণ।

৩। যদ্যাপি তোমার অংগগন্ধ ভুলায় ত্রিভুবন
তাও সত্য মেনে নিলাম—
কিন্তু আমার রাইয়ের অংগগন্ধ ভুলায় তোমার মন হে,
সর্বশেষ মাতনে গাওয়া হয়—

৪। এমন ধনি আর নাই আর নাই
রূপে গুণে ত্রিভুবনে—

মাথুর লীলা প্রসংগে "বড় রামা হে সো কাহে মুঝে বিছুরাই", গানটি ছোট দশকোশী তালের বলে চিহ্নিত হলেও এর গতি মধ্যম দশকোশী তালের অনুরূপ। এ গানটি বর্তমানে আর শোনা যায় না। অপর একটি মধ্যম দশকোশী তালের গান আছে—

নন্দ শুধায় ব্রজে ঘরে ঘরে
আমার বাধা বওয়া ধন কে নিলিরে হরে ঃ
ওরে ব্রজবাসীরে আমার গোপাল কি আর
তোদের ঘরে যায় না।
আর খায় না ননী চুরি করে
তোদের বাছুরী কি দেয় না ছেড়ে
আধুয়ার ননী কেবা নিলিরে হরে
আমি তো কারো মন্দ করি নাই।

মাথুর পালায় আরও একটি গানের উল্লেখ পাওয়া যায়। কেউ কেউ বলেন গানটি ব্রহ্ম তালে নিবদ্ধ। কিন্তু গানটি সকল ক্ষেত্রেই একতালীতে গাওয়া হয়। গানটি—

কহিও নিঠুরের আগে সই, কহিও নিঠুরে।
একবার যেন সে আসে ব্রজপুরে।
আসে যেন এ অভাগিনীর মরবার আগে।
সে যদি না দেখে মোরে—
আমি তারে দেখব আমার নয়ন দুটি ভরে॥

গোষ্ঠ পর্যায়ে প্রসিদ্ধ তুক গান—"কাঁদিয়া সাজায় নন্দরাণী" গানটি আড় তালে গীত হয়। কেউ কেউ বিভাস তেওটে গানটি গেয়ে থাকেন। মধ্যম দশকোশী তালে অপর একটি গান—"হের আয়রে, বলরাম, হাত দে মায়ের মাথে।" দানলীলা পর্যায়ে ইন্দ্রভাষ তালে একটি গান আছে—

কোথা যাওহে গোয়ালিনী, কোথা তোমার ঘর।
কিসের পশরা দাসীর মাথার উপর
দধি দুগ্ধ, ঘৃত ঘোলে পশরা আমার
কে তুমি, তোমার বোলে ওলাব পসার।
ঘাটের ঘাটোয়াল আমি পথের মহাদানী।
আমায় দান দিতে হবে শুন বিনোদিনী॥

সহজেই অনুমেয় যে গানটি রাধাকৃষ্ণের উভয়ের কথোপকথনের মাধ্যমে বিশ্লেষিত।

রাস পর্যায়ে তুক গানের সংখ্যা অনেক। তার মধ্যে দাসপ্যারী তালে একই সুরে দুটি গান উল্লেখযোগ্য। গানদুখানির একটি—

কও হে গোপী কিসের লাগি বনে কেন এলে।
এমন কাজে উচিত হয় নাই।
ঘর ছেড়ে এ বনে আসা এ ঘোর রজনী জেনে॥

অপর গানটি সখীদের উক্তিতে আছে—

এখন পরম ধার্মিক হয়ে ধরম শিখাও,
ওহে ও লম্পটের গুরু,
তোমার মত সাজা ধার্মিক কে আর দেখেছে বল।

এছাড়া দ্রুতলয়ে লোফা তালে কয়েকটি গান আছে। যেমন—

রুনুঝুনু রুনুঝুনু বাজত নুপুর নাচত কান।
মাতি রহত মদে মদন গোপাল,
বিকট তাল পর নাচে ভালে ভাল॥”

এই গানটি অনেকে শেখরের ভনিতা যুক্ত করে গেয়ে থাকেন। কিন্তু দেখা গেছে, দু একখানি গ্রন্থ ভিন্ন অধিকাংশ গ্রন্থে গানটি ভনিতাবিহীন। তা ছাড়া নৃত্য সম্বলিত গানের মধ্যে ‘থুগু থুগু থুগু থুগু থুগু থা, উয়ারে আগর তাততা আদি দমভা’ ইত্যাদি বোলযুক্ত গানটি অতি প্রাচীনকালের সৃষ্টি। দুঠুকী তালে—

এবার কানু নাচত রে আগর তাততা থৈয়া তাথৈয়া
দ্রিমিকি দ্রিমি তাতথৈ তাতথৈ, কানু নাচত রে।’

গানটিতে কৃষ্ণমঙ্গলের সুর থাকলেও, অতি প্রাচীনকাল থেকেই কীর্তনের পর্যায়ে প্রচলিত। রাস পর্যায়ে এরূপ গানের সংখ্যা অনেক। নৌকাবিলাস পর্যায়ে কয়েকটি গান প্রাচীন সংকলন রূপে প্রচলিত হলেও পদগুলির রচনাশৈলী থেকে তা প্রমাণিত হয় না। এই শ্রেণীর গানের মধ্যে—

বহুদূরে একখানি তরী দেখা যায়,
তরী একবার ওঠে একবার নামে মধ্য যমুনায়।
কি সুন্দর তরণীখানি দেখে যা লো প্রাণ সজনী
তরীর অপরূপ শোভা দেখা যায়।

অপর একটি গান :

তোমরা কে গো খঞ্জন নয়নী।

দানলীলা পর্যায়ে দাসপ্যারীর একটি গান আছে :

ললিতা বিশাখা সাথে চলিয়া যাইতে পথে, মনোসাধে বাড়াইল পা
উপজল ভাবসার এলাইল কেশভার, ধরণে না যায় রাধার গা।

অপর একটি শ্রুতিমধুর গান :

বড়াই আয় আয় দেখে যা
দানীর রঙ্গ দেখে অঙ্গ কাঁপছে,
হেইমা, অঙ্গে ঢলে পড়বে নাকি।
বিষম দানী ধেয়ে, পথ আগুলিল যেয়ে
জীবন যৌবন বুঝি যায়, ওগো বড়াই আয়।

এই পর্যায়ে মধ্যম দশকোশীতালে একটি প্রসিদ্ধ তুকগান আছে—

"ওহে ও তাই বল কানাই,
কেমনে তোমার সঙ্গে পিরীতি করিব হে।
ওহে কানাই তুমি রাখাল, আর আমি হলাম রাজার ঝি হে॥
এই কথা লোকে জানলে বলবে কি হে
রাখালের সঙ্গে রাজনন্দিনীর প্রেমের কথা।"

এই অংশটুকু শশিশেখর তালে নিবদ্ধ, পরবর্তী অংশ দাসপ্যারীতে—

"কানাই তোমার হল কালবরণ।
আর আমি হইলাম গৌরাঙ্গিনী।
তোমার গলে বনফুলের মালা,
আর আমার গলে গজমতি,
এদিকেও মিল নাই ওদিকেও মিল নাই
ইথে কি পিরীতি শোভা পায়।
সমানে সমানে হলে অত করে সাধতে হয় না
আপনি মেলে॥"

রসপর্যায়ে এমন গানের সংখ্যা প্রচুর, কিন্তু গৌরচন্দ্রিকা বা প্রার্থনা পর্যায়ে কোনো তুকগানের পদ পাওয়া যায় না। এর থেকে অনুমান করা যায় যে এই গানগুলির মধ্যে অনেক গান চৈতন্যদেবের পূর্বেই সৃষ্ট এবং পরবর্তী সৃষ্ট গানগুলিও প্রসিদ্ধ গায়কদেরই সৃষ্টি। কারণ এই গানগুলিতে কাব্যিক ভাব বিশেষ নাই। এমনকি পদান্তমিল বা সাধারণ ছন্দরীতিও অনুসরণ করা হয় নাই। কিন্তু তাল ও গীতিরীতির বৈচিত্র্য যথেষ্ট আছে। এমন অনেক তুকগান আছে যেগুলি পরবর্তী কালে কোনো দুজন কবির চেষ্টায় সম্পূর্ণ রূপ প্রাপ্ত হয়েছে এবং তাতে উভয় কবির নামোল্লেখ আছে। যেমন, 'প্রেমাক অংকুর' গানটির ভণিতায় বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাসের নাম আছে। আবার 'মরকত মঞ্জু' গানটিতে সন্তোষ রায় ও গোবিন্দ দাসের নাম আছে। উত্তর গোষ্ঠের একটি গানে উদ্ধবদাস ও মোহন দুজনের নামোল্লেখ পাওয়া যায়। এমন পদপূরণ প্রচেষ্টায় যে সকল কবি অগ্রণী ছিলেন, তাঁদের মধ্যে উদ্ধব দাস রাজা শিবসিংহ এবং রায়শেখরের নাম উল্লেখযোগ্য। তুকগানগুলি মূলতঃ বিভিন্ন পদাবলীর মধ্যে ভাবসংগতি রক্ষাকল্পে অন্তর্বর্তী গান হিসাবে সৃষ্টি হয়। কারণস্বরূপ বলা যায়, এইরূপ ভাবসংগতি রক্ষার জন্যই তুকগান গাওয়া হয় কিন্তু পৃথকভাবে তুকগান গাইবার রীতি দেখা যায় না। তুকগান রচনায় ও পরিবেশনায় যথেষ্ট নৈপুণ্য ও শিল্পীর নন্দনতাত্ত্বিক অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়।

৪। বট্‌ক গান

কীর্তন গান অনেক সময় ঘরোয়া আসরে অর্থাৎ বৈঠকখানার বৈঠকে হয়ে থাকে। যখন এই বৈঠকে বসে বিশেষ ধরণের দ্ব্একটি প্রসিদ্ধ গান গাওয়া হয়ে থাকে তখন সেগ্বলিকে বলা হয় 'বট্বক গান'। গ্রামদেশে প্রচলিত অন্য নামগ্বলি হ'ল 'বৈঠকিয়া গান', 'বৈঠ্বকী' বা 'বৈঠকিরী' গান। এই গানগ্বলি সাধারণতঃ রাগাংগ বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন এবং তালের ক্ষেত্রেও একট্ব জটিলতাসম্পন্ন হয়ে থাকে। প্বর্ববংগে এমন যেসব বৈঠ্বকী গান গ্রামীণ জীবনের সংশ্লিষ্ট ছিল সেগ্বলিকে বলা হ'ত 'বান্ধ্বটী' গান। আবার একই পরিবেশে একইভাবে বৈঠ্বকী আসরে যখন বিশেষ ধরণের একটি বা দ্ব'টি মধ্যগতির দাগী পর্যায়ের গান গাওয়া হয় সেগ্বলিকে বলা হয় 'বট্বক গান'। এই গান 'ত্বকগান' হ'তে পারে বা মহাজন পদাবলীও হ'তে পারে। 'বট্বক গানে' নানাবিধ তালফেরতা আছে। কথা সংকলন, আখর সংযোজন এবং ভাববিন্যাসেও যথেষ্ট অভিনবত্ব থাকে। কোন কোন 'বট্বক গানে' দ্বই লহরে কাটান থাকে। এই' লহর দ্ব'টি হ'ল—'গ্বর্ব কাটান' এবং 'লঘ্ব কাটান'। 'বট্বক গান' সাধারণতঃ মধ্যম দশকোশী, ছোট দশকোশী, তেওট, দাসপ্যারী, দ্বঠ্বকী বা একতালি তালের হয়ে থাকে। প্বর্ববংগে 'বান্ধ্বটী গান' বিশেষতঃ বরিশাল অঞ্চলে খ্বই আকর্ষণীয়। এগ্বলি হয় 'খয়রা', সাত মাত্রার লোফা, র্পক, তেওরা, ইত্যাদি নানাবিধ তালে কিন্ত্ব গানগ্বলির বন্দিস এমন জটিল যে প্বর্ব অভিজ্ঞতা না থাকলে এ গান বাজানো কঠিন। ঠিক তেমন হল কীর্তনের 'বট্বক গান'। গায়কগণ যখন গাইতে বসেন তখন এমন একটি পরিবেশ তৈরী করেন যাতে ম্বল গানটি স্বন্দরভাবে ফ্বটিয়ে ত্বলেই চড়া পর্দায় আখর জ্বড়ে দেন। আখরের পদ সাধারণতঃ "আহারে, আহা মরি রে, মরি মরিরে" ইত্যাদি গড়াণহাটি ধরণের। করতাল বাজাবারও বিশেষ পদ্ধতি আছে। 'বট্বক গান' গাইবার সময় গানের খাতা সামনে খ্বলে রাখা হয় এবং এ গান হয় বসে বসে। অন্তরংগ ব্যক্তিদের আস্বাদনের বস্ত্ব হিসাবে এ গানগ্বলি গাওয়া হয়।

৫। গৌরচান্দ্রকা গান

রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক লীলাপ্রসংগ গানের প্বর্বে ঠিক সেই লীলার অন্বর্প শ্রীচৈতন্যের লীলাপ্রসংগ গানকে 'গৌরচন্দ্রিকা গান' বলা হয়। সাহিত্যক্ষেত্রে গৌরচন্দ্রিকা শব্দটি অন্য যে কোন অর্থে ব্যবহৃত হউক না কেন ম্বলতঃ গৌরচন্দ্রিকা হ'ল গান এবং সম্প্র্ণভাবে শ্রীগৌরাংগেরই লীলাপ্রসংগ। শ্রীকৃষ্ণের র্প দেখে যেমন রাধারাণী অন্বরক্ত ঠিক তেমন নদীয়ার অধিবাসী বা নাগরীগণও শ্রীগৌরাংগের র্প দেখে অভিভূত। তারই অভিব্যক্তি বাস্বদেব ঘোষ, রাধামোহন প্রম্বখ অনেকের গানে পাওয়া যায়, সেগ্বলি র্পের গৌরচন্দ্রিকা। যেমন—

১। "মরমে লেগেছে গোরা না যায় পাসরা।
নয়নে অঞ্জন হয়ে লাগিয়াছে পারা॥
জলের ভিতরে যদি ডুবে দেখি গোরা।
ত্রিভুবনময় গোরা চাঁদ হল পারা॥
তেঁহি বলি গোরা রূপ অমিয় পাথার।
ডুবল তরুণী মন না জানি সাঁতার॥
বাসুদেব ঘোষে কহে নব অনুরাগে।
সোনার বরণ গোরা চাঁদ হিয়ার মাঝে জাগে॥"

২। "গোরা অনুরাগে মোর পরাণ কাতরে।
নিরবধি ছল ছল আঁখি জল ঝরে॥"

৩। "দামিনী দাম দমন রুচি দরশনে
দূরে গেল দরপকি দাপ।
শোণ কুসুম কিয়ে কিয়ে গণিয়ারে
প্রাতর অরুণ সন্তাপ।"

রাধাকৃষ্ণের দানলীলার অনুরূপ গৌরাঙ্গলীলার গান—

"আজুরে গৌরাঙ্গের মনে কিভাব পড়িল।
সুরধুনীর তীরে গোরা দান সিরজিল॥
দান দেহ দান দেহ বলি গোরা ঘন ডাকে।
নদীয়া নাগরীগণ পড়িল বিপাকে॥
কিসের দান চাহে আমার গোরা দ্বিজমণি।
নেত্র দিয়া আগুলিয়া রাখয়ে ধরণী॥"

দানলীলার প্রসিদ্ধ তেওট তালের গৌরচন্দ্রিকা আছে—"হোর দেখ নব নব গৌরাঙ্গ মাধুরী।" এটি হল "চর চর কাঞ্চন" অর্থাৎ ঝুলনের প্রসিদ্ধ গড়াণহাটি তেওটের গৌরচন্দ্রিকাটির জোড়া গান। কলহান্তরিতার গৌরচন্দ্রিকা গানটি হ'ল—

"মান বিরহ জ্বরে পহু ভেল ভোর।
ও রাঙ্গা নয়নে বহে তপত হিলোর॥
আরে মোর আরে মোর গৌরাঙ্গ চাঁদ।
অখিল জীবের মন লোচন ফাঁদ॥
প্রেম জলে ডুবু ডুবু লোচন তারা।
প্রলাপ সন্তাপ আদি ভাব আদি ভোরা॥
কাঁদিয়া কহয়ে পুনঃ ধিক মোর বুদ্ধি।
অভিমানে হারাইলাম কানু গুণ নিধি॥
কি কহব মন দুঃখ কহনে না যায়।
সোঙরি সে সব বাসর হিয়া ফাটি যায়॥

প্রতিটি পালা পর্যায়ে এমন বহু গান আছে। গৌরচন্দ্রিকায় গানগুলি সাধারণতঃ সমতালে, যোতসম এবং বড় দশকোশী তালে মুখ গাওয়া হয় এবং এ গানগুলির সবই জাত গানের সুর। উপরের 'মান বিরহ' গানটি আসরে গাওয়া হয় যোতসম তালে কিন্তু এ গানটি সম্পর্কে প্রাচীন মত হল গানটি রূপক তালে গাওয়া হত, অবশ্য সুরটি অনেকটা যোতসম তালের গানটির সুরের মতই।

শ্রীগৌরচন্দ্রের তত্ত্বগত পরিচয় দুটি অর্থাৎ "রাধাকৃষ্ণ প্রণয় বিকৃতি হ্লাদিনী শক্তি বিগ্রহ"; "রাধা ভাবদ্যুতি সুবলিতং নৌমি কৃষ্ণ স্বরূপম্"; "অন্তে কৃষ্ণ বহি'গৌর" ইত্যাদি তত্ত্ব থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে শ্রীগৌরাঙ্গের দু'টি সত্তা—একটি শ্রীকৃষ্ণ সত্ত্বা, অপরটি শ্রীরাধার সত্তা। তাই বিভিন্ন লীলাপ্রসঙ্গ প্রকট করবার ক্ষেত্রেও কখনও কৃষ্ণস্বরূপ আবার কখনও রাধাস্বরূপ লীলা প্রকাশ হয়েছে। যেসব গানের মধ্যে রাধাভাব সুস্পষ্ট ফুটে ওঠে সে গানগুলিকে বলা হয় 'ভাবাঢ্য গৌরচন্দ্রিকা'। যেমন "মান বিরহ জ্বরে"—একটি 'ভাবাঢ্য গৌরচন্দ্রিকা'।

গৌরচন্দ্রিকা গানগুলির প্রথম চরণের প্রথমার্ধ—যথাবিহিত নিয়মে বিলম্বিতে গাইতেই হয়। না হ'লে গুরুবর্গকে তথা কীর্তনপিতা শ্রীগৌরচন্দ্রকে অপমান করা হয় কীর্তনীয়াদের এমত বিশ্বাস। উত্তরার্ধ ক্ষেত্রেও নির্দিষ্ট জাত গানের মধ্যমের সুর ব্যবহার করে গাইতে হয়। সমতাল এবং যোতসমের গানগুলির ক্ষেত্রে প্রথম চরণের পর থেকেই একতালি বড় এবং ছোট তালে গাইতে হয়। আবার কামোদ বড় দশকোশীর গৌরচন্দ্রিকাগুলির প্রথম চরণের পর সমগ্র অংশই ছোট দশকোশী বা দাসপ্যারী তালে গাওয়া হয়ে থাকে। সব রকম গৌরচন্দ্রিকা গানের শেষ চরণটি অর্থাৎ পদকর্তার নামভণিতা যুক্ত চরণটি একটি বিশেষ কাটানের সুরে গাওয়া হয়। এ সুরটি চৌদ্দ মাত্রার দশকোশী তালের বিভাগেই গাঁথা। এটিকে বলা হয় 'কাটা সুম' এবং বাজনাটি শুরু হয় নিম্নরূপে—

+			0	0		0	২			0
দাদ্	দাদ্	দা	গিদাধেই	দাদ্	দাদ্দা	গিদাধেই	দাদ্	দাদ্	দা	গিদাগিদা

0	0	৩	0	৪	0	0
ঘেনেদাঘি	নাও	দাদ্দাদ্দা	গিদাগিদা	ধেইয়াতাতা	থেইয়া তাতা	থেইয়াতাখি

0
তা।

এরপর নানা ধরণের বাদ্যের মাধ্যমে আসরকে মাতিয়ে তোলে বাদকগণ। এই মাতান-এর আর একটি প্রকরণের নাম হ'ল 'মাথট', এটি সাতমাত্রা ছোট দশকোশীর বিভাগের মত। গায়কগণ শুধু একই কথাকে পুনরাবৃত্তি করে গাইতে থাকেন আর বাদক নানাভাবে বাজনা বাজাতে থাকেন, যার শুরু হয় নিম্নলিখিত

বাদ্যটি দিয়ে।

+ তাক ধেইয়া   ০ তাক ধেইয়া   ২ তাক ধেইয়া   ০ তা   ৩ দাদা দাধেই   ৪ নাক্তেই তেই

০ খেটেতাখি তেরেখেটা

বহু ধরণের গৌরচন্দ্রিকা আছে। গৌর বিষয়ক প্রার্থনা গানের গৌরচন্দ্রিকা "গৌরাঙ্গের দুটি পদ যার ধন সম্পদ সে জানে ভকতি রস সার।"

গৌর-নিত্যানন্দ বিষয়ক সর্বোৎকৃষ্ট ঐতিহাসিক গৌরচন্দ্রিকা হল—

"জয় জগতারণ কারণ ধাম।"

এটি ঐতিহাসিক, কারণ খেতরী মহোৎসবেই এই গানটি প্রথম গাওয়া হয়েছিল বলে প্রেমবিলাস গ্রন্থে পাওয়া যায়।

সূচক গানের জন্য নির্দিষ্ট গৌরচন্দ্রিকা হল—

"প্রেমসিন্ধু গোরা রায় নিতাই তরঙ্গ তায়
করুণা বাতাস চারিপাশে।"

সুতরাং সকল ক্ষেত্রেই গৌরচন্দ্রিকা গান প্রযোজ্য। পূর্বে বলা হয়েছে গৌরচন্দ্রিকা গান রাধা বা কৃষ্ণভাবের প্রকাশ কিন্তু তার ব্যতিক্রমও আছে। যেমন "নন্দোৎসব' লীলাপ্রসঙ্গের গৌরচন্দ্রিকার পদটি—

"পুরব জনম দিবস দেখিয়া
আবেশে গৌর রায়।
নিজগণ লৈয়া হরসিত হৈয়া
নন্দ মহোৎসব গায়॥"

এ গানটিতে শ্রীগৌরাঙ্গ নন্দের ভাবে বিভাবিত। অবশ্য এমন ব্যতিক্রম আর বেশী দেখা যায় না।

৬। ঝুমুর গান

ঝুমুর গান—এ নামটিই বাংলার নিজস্ব সুরের প্রভাবযুক্ত গান ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে থাকলেও ঝুমুর গানের মূল বৈশিষ্ট্য এই পশ্চিমবঙ্গেই আছে। ঝুমুর গান মূলতঃ লোকসঙ্গীত, প্রধানতঃ আদিবাসীদের উৎসবের গান। সে হিসাবে সাঁওতালী ঝুমুর, ওরাওঁ ঝুমুর, পুরুলিয়ার ঝুমুর ইত্যাদি সাম্প্রদায়িক বা আঞ্চলিক ঝুমুরের ছড়াছড়ি দেখা যায় লোকসঙ্গীতে। কোন কোন ঝুমুরের সঙ্গে কীর্তনের কোন কোন সাধারণ শ্রেণীর গানের বেশ মিলও আছে। এ দেখে অনেকে সিদ্ধান্ত করেন যে পুরুলিয়ার ঝুমুরের প্রভাব কীর্তন গানে বহুল পরিমাণে দেখা যায়। প্রকৃতি বিশ্লেষণে দেখা যায় কীর্তনে যে ঝুমুর গান আছে তার সঙ্গে লোকসঙ্গীতের ঝুমুরের কিছু কিছু মিল আছে।

কীর্তনে ঝুমুর গান গাওয়া হয় পালাকীর্তনের শেষ পর্যায়ে। অর্থাৎ পালার শেষ হয় রাধাকৃষ্ণের মিলনে। এই মিলনের পর মিলনভিত্তিক কতকগুলি গান যা প্রাচীন কাল থেকে প্রচলিত আছে সে সব গানের দু'একটি পদ সাধারণতঃ প্রত্যেক মূল গায়েনই গেয়ে থাকেন। এর মধ্যে জয়ধ্বনিবাচক পদ আছে অনেক, স্মরণবাচক অনেক পদও আছে। তাছাড়া আছে রূপ এবং শোভাবাচক পদ। এসব গান গাইবার সময় গায়ক বাদক সকলেই দাঁড়িয়ে ওঠেন। নাচের ভংগীতে আড় ছন্দে গানগুলি গাওয়া হয়। এসব গানের পদকর্তাদের নাম সব সময় থাকে না। প্রচলিত সূত্র ধরে এ গানগুলি চিরন্তন হয়ে বেঁচে আছে।

উদাহরণস্বরূপ দু'একটি গানের উল্লেখ করা যায়। যেমন—

১। "এমনি থাকুক যুগল কিশোর আমাদের।
আমরা নিত্যুই আসব, নিত্যুই হেরব
এমনি থাকুক যুগল।"

২। "আজ রাধামাধব নীপমূলে হো,
কেলি কলারস দান ছলে হো॥"

৩। "চাঁদ চাঁদ চাঁদ চাঁদের বামে
চাঁদ বদনী দাঁড়াল।"

৪। "রাধা শ্যাম দুহুজনে সেজেছে ভাল।
রাই আমাদের হেম বরণী শ্যাম চিকন কালো।
গলে বনফুলের মালা, বামে চূড়াটি হেলা
যুগলরূপে নিকুঞ্জবন করেছে আলো।
দোঁহার বাহুতে বাহু, যেন চাঁদেতে রাহু,
চূড়া বেণী ঘেরাঘেরি করি দাঁড়ালো॥
করে মোহন মুরলী, তাই অংগে পড়ে ঢলি,
ভানু দুলালী মোদের নন্দদুলাল॥"

৭। লুট গান

সাধারণতঃ কীর্তনের শেষে ঝুমুর গান হয় এবং ঝুমুরের শেষ জমাটের পর লুট গান হয়। এই লুট গানের পর বাতাসা চারদিকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। গ্রাম অঞ্চলে অনেক বাড়িতে একটি তুলসীতলা থাকে। কোন কোন দিন, বিশেষ কোন তিথি বা শুভ উৎসবাদির উপলক্ষে ঐ তুলসীতলায় হরির লুট দেওয়া হয়। সন্ধ্যাবেলা বাড়ির এবং পাড়ার সকলে তুলসীতলায় সমবেত হন, সেই সময় বাতাসা, খই, নাড়ু, পেড়া, সন্দেশ ইত্যাদি দিয়ে ভোগ দেওয়া হয়। সকলে মিলে গান করে, সাধারণ গান প্রায় সকলেই জানেন, হাতে তালি দিয়ে গানগুলি গাওয়া হয়। ঐগুলিকেই বলা হয় 'লুট গান'। এ গানের পর প্রসাদী বাতাসা চারদিকে ছুঁড়ে

দেওয়া হয় আর সকলেই লুটে বা কুড়িয়ে সেই বাতাসা প্রসাদ নিয়ে থাকেন। হরির লুট নানা ধরণের আছে। যেমন—১। বারের লুট, ২। মানসিক হরিলুট, ৩। ওজনের হরিলুট ইত্যাদি। কোন গৃহস্থ পরিবারে সপ্তাহের একটি বার নির্দিষ্ট থাকে আর সেই বারে সন্ধ্যাবেলা ঐ বারের হরিলুট হয়, সকলেই সমবেত হন এবং গান করে। এ হল বারের লুট। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে পরিবারের কোন একটি মঙ্গল চিন্তা করে গৃহস্থ মানসিক করেন যদি তাঁদের পরিবারের মঙ্গল ঘটে তবে হরিলুট দেওয়া হবে। এ মানসিকগুলির কারণ নানা ধরণের। যেমন—ছেলে হওয়া, গরু খুঁজে পাওয়া, পরীক্ষায় পাস করা, মোকদ্দমায় জিতে আসা, নূতন জমি কেনা, ঘর করা ইত্যাদি। এগুলি হ'ল মানসিক হরিলুট। এগুলি সাধারণ হরিলুট বা বারের লুটের চেয়ে অনেক বড় হয়। তৃতীয় প্রকরণটি হ'ল 'ওজনের হরিলুট'। অনেক সময়ে বাড়ির কোন লোক বা ছেলে অসুস্থ হ'লে, জলে পড়ে গেলে, সাপের কামড় খেলে তাঁদের জন্য 'ওজনের হরিলুট' মানত করা হয়। এক্ষেত্রে যার ঘটনাকে উপলক্ষ করে হরিলুট মানত হয় তার দেহের যা ওজন সে পরিমাণ নানাবিধ ফল, মিষ্টি, বাতাসা ইত্যাদি দিয়ে লুটের ব্যবস্থা হয়। অনেক সময় এসব ক্ষেত্রে সারারাত গান কীর্তন হয়। তবে সব ক্ষেত্রেই লুটের গান গাইতে হয়। গানগুলি সহজ, গাইতে কোন সহায়কারী যন্ত্র লাগে না, কেবল হাততালি দিয়ে গাওয়া হয়, যুবক বৃদ্ধ শিশু সকলেই এ গানে অংশগ্রহণ করে থাকেন। গানের উদাহরণ—

১। "হরি লুট পড়েছে লুটের বাহার
লুটে নেরে তোরা।
চিনির সন্দেশ ফুল বাতাসা
মণ্ডা জোড়া জোড়া॥
ছেলেপুলে (পোলাপানে) লুটে খেল
ঠকল যত বুড়া॥
যত মণ্ডা মিঠাই লুঠে নিল
ব্রজের মাখন চোর॥"

২। "চাই আনন্দ চাই প্রেম চাই হরির নাম নিবি কে,
হরি নামের ফেরিওয়ালা
নিতাই নিতাই যায় ডেকে।
ত্রিতাপে তাপিত ভবে
কে আছিস কে আছিসরে।
(তোদের) জুড়িয়ে যাবে সকল জ্বালা
এই হরিনাম একবার নে॥"

৩। "আয়রে তোরা লুটবি কে আয়।
আমার দয়াল নিতাই অমিয়া বিলায়রে ॥
শ্রীগৌরাঙ্গ সুধার আধারে
নিতাইচাঁদ তাঁর অঙ্গ আধারে ॥
চাঁদে চাঁদে মিশে দুটি চাঁদ
(কলিঘোর অমানিশা বিনাশিতে)
(নন্দকুল চাঁদ ভানুকুল চাঁদ)
এসে উদয় হ'ল নদীয়ায় ॥ আয়রে…"

৮। গড়াণহাটি গান

উত্তরবঙ্গের রাজশাহী জেলার অন্তর্গত খেতরী গ্রাম পদ্মা নদীর পার্শ্বে অবস্থিত। পরগণার নাম গড়ের হাট, গোপালপুর। প্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীকৃষ্ণানন্দ দত্তের পুত্র শ্রীল নরোত্তম দত্ত। সংগীত মাধব নাটকোদ্ধৃতি—

"পদ্মাবতী তীরবর্তি—গোপালপুর—নগরবাসী গৌড়াধিরাজ মহামাত্য শ্রীপুরুষোত্তম দত্ত সত্তম তনুজঃ শ্রীসন্তোষ দত্তঃ, সহি শ্রীনরোত্তম দত্ত সত্তম—মহাশয়ানাং কনীয়ান্ যঃ পিতৃব্য ভ্রাতৃ শিষ্যঃ ইত্যাদি"

যুগস্রষ্টা এই দত্তসন্তান নরসমাজে উত্তম হয়ে তাঁর নরোত্তম নামের সার্থকতা প্রতিপন্ন করেন।

"আকুমার ব্রহ্মচারী সর্বতীর্থদর্শী।
পরম ভাগবতোত্তমঃ শ্রীল নরোত্তম দাস ॥"

একাধারে প্রেম ও ভক্তির মূর্ত বিগ্রহ অন্যদিকে অনন্যসাধারণ সঙ্গীতবেত্তা।

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে কোন এক সর্বচিত্তাকর্ষী ফাল্গুনী পূর্ণিমায় শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীবল্লভীকান্ত, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীব্রজমোহন, শ্রীরাধারমণ ও শ্রীরাধাকান্ত—এই ছয় ভগবৎ বিগ্রহ স্থাপনকল্পে খেতরী গ্রামে আয়োজন করলেন এক মহা-মহোৎসবের। উপস্থিত ছিলেন শ্রীনিবাসাচার্য প্রভু, জাহ্নবা দেবী, গোবিন্দদাস প্রমুখ অসংখ্য গুণী, জ্ঞানী, ভক্ত। অভূতপূর্ব কীর্তনের ধ্বনিতে ত্রিলোক কম্পিত হ'ল। সপার্ষদ শ্রীচৈতন্য নৃত্যগীতাদিতে আকর্ষিত হলেন, অপ্রকট হয়েও পুনঃপ্রকটিত হয়ে ধরাধামকে ধন্য করলেন। এই ঐতিহাসিক মহোৎসবেই কীর্তনের নবরূপায়ণ হয়েছিল।

"নাচে গৌরচন্দ্র—কি অদ্ভুত গান সৃষ্টি।
ভুবন মাতায় প্রেমে, করে প্রেম বৃষ্টি ॥" ভঃ রঃ ১০।৫৭৯

এই অভিনব কথা, সুর ও তালের সুমিত সংকলনকেই গড়াণহাটি গান বলা হয়। অভিনব হলেও পূর্বেকার ধারা এতে যে ছিল না এমন নয়। মহাপ্রভু

যে গান রাত্রিদিন রামানন্দ ও স্বরূপের সঙ্গে আস্বাদন করতেন সে গানেরই পুনরাবৃত্তি করলেন ঠাকুর নরোত্তম। অবশ্য সে গানও ছিল বিশিষ্ট উচ্চ প্রথার শৈল্পিক ধারাসম্পন্ন, কারণ স্বরূপ ছিলেন 'সংগীতে গন্ধর্ব'।

> কেহ কহে—"মহাপ্রভু স্বরূপের স্থানে।
> শুনিতেন উচ্চগীত মহাহর্ষ মনে॥
> গীত প্রথা রক্ষা ক্ষোভ নিবৃত্ত নিমিত্তে।
> প্রচারিতে সম্যক বিচার কৈল চিতে॥
> সে সময়ে তাহা প্রেম সম্পুটে রাখিল।
> নরোত্তম দ্বারে প্রভু এবে উঘাড়িল॥" ভঃ রঃ ১০।৫৫৬-৮

গড়াণহাটি গান সৃষ্টির ইতিহাস প্রসঙ্গে একটি মতবাদই প্রচলিত। রাজশাহী জেলায় গড়ের হাট হ'ল একটি পরগনা এবং এই পরগনার অন্তর্গত হ'ল খেতরী গ্রাম। এই গ্রামেই যেহেতু মহামহোৎসবটি হয় এবং যেহেতু এরই সূত্রে কীর্তন গানের একটি নূতন ধারা সৃষ্টি হলো সেজন্যই বলা হ'ল 'গড়াণহাটি'। অন্যদিক দিয়েও বিচারের একটি সুযোগ আছে। প্রাচীন ভারতীয় রাগগীতির কিছু প্রকরণ ছিল যেগুলি গাইতে 'ও', 'হা' ইত্যাদি বর্ণ ব্যবহার করা হ'ত। সেগুলিকে বলা হ'ত 'ওহাটি' গান। গৌড়ভূমির জন্যও নির্দিষ্ট ওহাটি ছিল। তাই গৌড়-দেশের ওহাটিকে গৌড়ণহাটি বলা হ'ত কিনা তাও বিবেচ্য। সপক্ষে বলা যায়—গড়াণহাটি গানের ক্ষেত্রে বিলম্বিত মাত্রার সুর ধরে রাখার জন্য 'ও', ও 'হা' ইত্যাদি বর্ণ ব্যবহার হয় তাছাড়া গানে শুরুর আগেও এ ধরণের বর্ণ প্রয়োগ করা হয়। যেমন—'বিমল হেম' গানের আগে 'ও, আ', 'নীলরতনের' আগে 'হেই গো' 'স্বর্ণবর্ণের' আগে "হেইগো ওকি দেখিগো", 'আজু হাম কি পেখলুঁ'র আগে 'ও আরে', 'মুখমণ্ডলের' কাটানে 'আরে সখীরে', যোতসমের কাটানে 'ও আরে আহামরিরে ওকি আহা মরি রে এ এ এ" ইত্যাদি; ধরার মাতনে 'ওকি আরে'। সুতরাং 'ও', 'হা', 'আ', 'আরে' ইত্যাদি ভাষার প্রয়োগের প্রাধান্য দেখে এ গানকে 'ওহাটি' গানের ধারা বলেই গ্রহণ করা যায়। অবশ্য এই ওহাটি ধারা গৌড়ের নিজস্ব বলে 'গৌড়াণহাটি' বা 'গড়াণহাটি' বলে পরিচিত হয়েছে এমন অনুমান সঠিক কিনা তা বিবেচ্য।

কীর্তনের মূলধারাটি সুপ্রাচীন এ বিষয়ে সন্দেহ নাই, কারণ দল সংগঠন পদ্ধতিতে বৃন্দগানের বৃন্দ সংগঠন পদ্ধতির নিয়মটি সুস্পষ্ট, গায়েকী ধরণের মধ্যেও সমসাময়িক 'ওহাটি' গানের প্রভাব থাকাটা অসমীচীন নয়। কীর্তনে রাধা-কৃষ্ণ বিষয়টি পরবর্তীকালের বিষয় বলে গণ্য হ'লেও শুধু কৃষ্ণ বিষয়ক কীর্তনের রীতি শ্রীমদ্ভাগবতের যুগেই প্রচলিত ছিল। কৃষ্ণকে বিষয় করে যেসব গানের ধারা বৃন্দগান বা ওহাটি গানের যুগেই প্রচলিত ছিল সেগুলি হ'ল—১। ভ্রমর-গীত, ২। ভিক্ষুগীত, ৩। গোপীগীত, ৪। গোপিকাযুগল গীত, ৫। রুদ্রগীত,

৬। বেণুগীত, ৭। রাসগীত, ৮। ঐলগীত। এসব গীতেরই উল্লেখ শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে পাওয়া যায়। অপ্সরা ইলার বিরহে যে গান রচিত হয়েছিল তা-ই ঐলগীত। মনে হয় সেই সংগীতেরই দেশীয় ধারার প্রকরণটি হ'ল এলা প্রবন্ধ। এলা প্রবন্ধের একটি নির্দিষ্ট ধারা গৌড় অঞ্চলে প্রচলিত ছিল যাকে বলা হ'ত 'গৌড়েলা'। গৌড়েলার বৈশিষ্ট্য ছিল 'গমক অনুপ্রাসযুক্ত রসপ্রধান সংগীত'। তৎকালীন বাংলাদেশে এমন যে সংগীত প্রচলিত ছিল তা কীর্তন ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই সঠিক বিচারে অনায়াসে বুঝি যে কীর্তন হ'ল সুপ্রাচীন গীত প্রকরণ এবং 'গড়াণহাটি' হ'ল কীর্তনের মূল প্রকরণেরই প্রাচীন সংস্করণ। নরোত্তমদাস ঠাকুর এই ধারাটিকে অবলুপ্তির পথ থেকে বাঁচিয়েছেন এবং এটিকে নবজীবন এবং নবযৌবন দান করেছেন খেতরী মহোৎসবের সূত্রে।

যা হোক পরগনার নামানুসারে যে 'গড়াণহাটি' গান প্রচারিত হ'ল তারই প্রাধান্য নরোত্তমোত্তর যুগে স্থাপিত হ'ল এবং এরই অনুকরণে 'মনোহরশাহী', 'রেনিটী' ইত্যাদি ধারার সৃষ্টি হল।

এ প্রথার গানের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে লিখিত তত্ত্ব গ্রন্থসূত্রে না পাওয়া গেলেও গুরুবর্গের মুখে বা কিংবদন্তিতে কিছু কিছু সন্ধান পাওয়া যায়। এ গান ছিল পদসর্বস্ব অর্থাৎ আখর সংযোজনার যে বৃত্তি পরবর্তীকালের কীর্তনকে আকর্ষণীয় করে রেখেছে তা গড়াণহাটিতে বেশী ছিল না। পদস্রষ্টাগণ অনেকেই গায়ক ছিলেন কিন্তু তাঁরা শুধু গানই করতেন, আখর সংযোজনা করতেন বলে মনে হয় না, কারণ তা হ'লে সেগুলিও তাঁদের রচনায় উক্ত থাকত। আখরগুলি থাকত 'পদাংশ' দিয়ে বা "আহা মরি, আহারে"—ইত্যাদি ভাব প্রকাশের ভাষা দিয়ে। গানগুলিতে রাগের প্রভাব ছিল নিঃসন্দেহে বলা যায় কিন্তু সে রাগগুলি বর্তমান পদ্ধতির হিন্দুস্থানী রাগের মত ছিল কিনা তা বিচার্য। নরোত্তম প্রভু, দেবীদাস, গোবিন্দদাস, নরহরি চক্রবর্তী, শ্রীবল্লভ দাস, শ্রীগৌরাঙ্গ দাস, গোকুল দাস প্রমুখ "সকলেই গীত-নৃত্য বাদ্যে বিচক্ষণ।

"বার বার প্রণমিয়া সবার চরণে।
আলাপ অদ্ভুত রাগ প্রকট কারণে॥
রাগিণী-সহিত রাগ মূর্তিমন্ত কৈলা।
শ্রুতি, স্বর, গ্রাম, মূর্চ্ছনাদি প্রকাশিলা।" ভঃ রঃ ১০।৫৩৯

এ রাগগুলি হিন্দুস্থানী পদ্ধতির রাগ কিনা সন্দেহ হওয়ার কারণ এই যে পরবর্তীকালের গায়ক পণ্ডিতদাস, গিরিধারীদাস, বনমালীদাস, প্রতাপ মজুমদার প্রমুখ অনেকেই ধ্রুপদ গান শিক্ষার পর কীর্তন শিখেছিলেন কিন্তু তাঁদের গানের ধারা শিষ্যবর্গের মুখে এখনও যা পাওয়া যায় তাতে হিন্দুস্থানী পদ্ধতির রাগের পূর্ণ রূপের প্রকাশ নাই। অবশ্য জয়দেবের গীতগোবিন্দ,

রাধামোহন ঠাকুরের পদামৃত সমুদ্র এমনকি শশিশেখর প্রমুখ গায়কদের পাণ্ডু-লিপিতেও বিভিন্ন রাগের নাম পাওয়া যায়।

গড়াণহাটি গানে তাল ব্যবহার একটি ঐতিহ্যবিশেষ। বিলম্বিত ও মধ্যগতিতেই দশকোশী, তেওট, দোঠুকী, একতালি, লোফা ইত্যাদি মৌলিক তালগুলি ব্যবহার করা হ'ত। সাধারণতঃ একই তালে গানের আদ্যন্ত সম্পন্ন হ'ত এবং একখানা গান করতেই বহু সময় লাগত যার জন্য বর্তমানে যেমন 'দান', 'কলহান্তরিতা', 'রূপানুরাগ', 'পূর্বরাগ', 'রাস', ইত্যাদি একটি পালার নাম ঘোষণা করা হয় আগে হ'ত 'দামিনী দাম', 'চূড়াটি বাঁধিয়া', 'কাঁচা কাঞ্চন', 'গোরা বড় পতিত পাবন', 'বিমল হেম', 'অঞ্জন গঞ্জন' ইত্যাদি একটি গানের নাম। সংগীতে বিলম্বিত লয় হ'ল উপভোগের বিষয় তাই উপভোগ্য গড়াণহাটি গানগুলি বিলম্বিত লয়েই গাওয়া হত। ব্যবহার্য তালগুলি ছিল প্রবন্ধ তালেরই অংশ-তাল—দ্বিকল, চতুস্কল বৃত্তিসম্পন্ন বার্তিক ও দক্ষিণ মার্গ হিসাবে ব্যবহার করা হ'ত। গানের ছিল নির্দিষ্ট বন্দেজ, লয় বিলম্বিত থাকার দরুন কথা সংযোগ বা গমকাদি প্রয়োগ করে রসসৃষ্টি করা অনায়াসসাধ্য ছিল। একটি কিংবদন্তি শোনা যায় কালনার সিদ্ধ মহাত্মা ভগবানদাসজী সম্পর্কে। তাঁর বয়স দ্বিশতাধিক ছিল বলে অনেকেরই অনুমান। শতাধিক বৎসর আগে একদিন বৃন্দাবনের পণ্ডিতদাসজী তাঁর নিকট 'কালিয় দমন' গানটি বড় দশকোশী তালে যথারীতি শোনালেন। ভগবানদাসজী চোখের পাতা টেনে খুলে মুখ দেখে বললেন "নরোত্তমের শিষ্যের মুখে এ গান শুনেছিলাম, একই গান আজ শুনলাম তোমার মুখে।" স্পষ্টই বোঝা গেল শ্রীধাম বৃন্দাবনের প্রসিদ্ধ ভজনসিদ্ধ গায়কদের মুখে যে গান কিছুদিন আগেও প্রচলিত ছিল তাই নরোত্তম ঠাকুর প্রবর্তিত গড়াণহাটি গান। গায়কের নাম ধরে বর্তমানে ঘরাণাপার্থক্য না দেখতে পারলেও 'গড়াণহাটি' গান নামে প্রচলিত কিছু কিছু গান এখনও প্রাচীন গায়কদের মুখে পাওয়া যাবে বলে আমার বিশ্বাস।

অবশ্য মনোহরসাই গানও গড়াণহাটি গানের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করতে চেষ্টা করেছে কারণ মনোহরশাহী পদ্ধতিতে গানের প্রথম চরণের পূর্বার্ধ ও উত্তরার্ধ বিলম্বিত তালে গড়াণহাটি ধারায়ই গাওয়া হয়। পরে সহজবোধ্য করবার জন্য সহজ তালে, সহজভাষা প্রযুক্ত আখর সংযোজনা করে অল্প সময়ের মধ্যেই গানখানা বিশ্লেষণ করে থাকেন। তা ছাড়া ময়নাডালের প্রাচীনতম গায়ক নৃসিংহানন্দ মিত্র ঠাকুর ছিলেন মনোহরশাহীর প্রবর্তকদের একজন, কিন্তু পরবর্তীকালে ময়নাডালের প্রসিদ্ধ যে কয়টি বড় দশকোশী গান আছে সেগুলির কিছু কিছুকেও গড়াণহাটি গান বলা হ'ত। অনেকে মনে করেন ধ্রুপদ আর খেয়ালে যেমন পার্থক্য, গড়াণহাটি আর মনোহরসাইতেও অনুরূপ পার্থক্য।

গড়াণহাটি গান যথার্থভাবে শিক্ষা করে যাঁরা ধরে রাখতে চেষ্টা করেছিলেন

তাঁদের মধ্যে বৃন্দাবনে প্রসিদ্ধ ছিলেন—ভক্তিচরণ দাস, পণ্ডিতদাস, গিরিধারী দাস, নিতাইদাসজী, হরেকৃষ্ণ দাস, ডাঃ গৌর ঘোষ প্রমুখ। বঙ্গদেশে যাঁরা এ গান যথার্থভাবে শিক্ষার চেষ্টা করেছিলেন তাঁদের বেশীর ভাগই নবদ্বীপচরণ ব্রজবাসী মহাশয়ের শিক্ষাধীনে। এদের মধ্যে ছিলেন—খগেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, ডাঃ ইন্দুভূষণ বসু, বিনয় মুখোপাধ্যায়, পরেশচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ। আর এখনও আছেন কল্যাণী মৈত্র। অন্যদিকে গদাধরদাস বাবাজীর সূত্র ধরেও গড়াণহাটি গান কলিকাতায় ছড়ায়—এ ধারায় ছিলেন সুরেন বন্দ্যোপাধ্যায়, কানাই গুহ, নিতাই অধিকারী, ভৈরব ঘোষ প্রমুখ এবং সেইসব সূত্রে কিছু কিছু গান শোভনা চৌধুরী, বৃন্দাবন বণিক, দ্বিজেন দে প্রমুখ কতিপয় গায়কের কাছে এখনও আছে।

গড়াণহাটি বলে পরিচিত বেশ কিছু গান এখনও শুনতে পাওয়া যায়। যেমন—

(ক) বাল্যলীলা পর্যায়ে :

১। ওগো রাণী দে দে নবনী আনি দেমা। (তেওট)

২। ওগো রামের মাগো গোপাল নাচিছে তুড়ি দিয়া (মধ্যম)

(খ) গোষ্ঠলীলা :

১। হইল অধিক বেলা অঙ্গনে করিছ খেলা (একতালি)

২। জাগিতে ঘুমাতে হেরিয়ে তোর কাল বরণ („)

৩। গোপাল নাকি যাবে দূর বনে (মধ্যম দশকোশী)

৪। এ দধি মন্থনকালে (বড় দশকোশী)

৫। বাজত সব গোঠ বাজনা (শশিশেখর)

৬। যাদু আমার নবীন রাখাল (আড়)

৭। নীলপীত ধড়া নন্দ (মধ্যম)

৮। হের আয়রে বলরাম (একতালি)

৯। গোঠের মুরলীধ্বনি শ্রবণে পশিল গেল (বীরবিক্রম)

১০। যায় পদ রহিয়া (দুঠুকী)

(গ) শ্রীকুণ্ড মিলন :

১। রাধিকা রূপসী লইয়া তুলসী (একতালি)

২। সৌন্দর্য অমৃত সিন্ধু (মধ্যম দশকোশী)

৩। নিজগৃহে সখীসঙ্গে রসবতী রাই (তেওট)

(ঘ) খেলা গোষ্ঠ :

১। যমুনাক তীরে (দাসপাহারী)

২। খেলে রাম খেলে রাম (বীরবিক্রম)

৩। খেলা সমাধিয়া (তেওট)

৪। রামকানাই যমুনারি তীরে (তেওট)
৫। আজ খেলায় হারিলা কানাই (একতালি)
৬। এত বড় মিঠ লাগে ভাইরে কানাই (দাসপ্যারী)

(ঙ) উত্তর গোষ্ঠ :

১। গোখুর ধূলি (তেওট)
২। পশ্য মিলতি বনমালী (দাসপ্যারী)
৩। কোন বনে গিয়াছিলে ওরে রাম কানাই (মধ্যম)
৪। ওমা নন্দরাণী ভাসে আনন্দ সাগরে (দাসপ্যারী)
৫। ওমা নন্দরাণী গোপাল কি জানয়ে মোহিনী (তেওট)

(চ) রূপানুরাগ :

১। অরুণিত চরণে
২। চূড়াটি বাঁধিয়া
৩। অঞ্জনগঞ্জন
৪। বেলি অসকালে
৫। কানু সে বিনোদ রায়

(মধ্যম দশকোশী)

এ ছাড়া বেশীরভাগ দাগী গানগুলিই গড়াণহাটি গান।

৯। মনোহরসাই গান

কীর্তন গানের প্রসংগ আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই অনেকের মনে আগ্রহ দেখা যায় 'মনোহরসাই' এবং 'গরাণহাটি' এই কীর্তন ধারা দু'টি সম্পর্কে আলোচনা করবার। গানের এই নাম দু'টি কীর্তনের ইতিহাসকে নূতন করে চেনার প্রবৃত্তি জাগিয়ে দেয় : হিন্দুস্থানী গায়ক-বাদকদের সংস্কার অনুসারে 'মনোহরসাই' এবং 'গড়াণহাটি'কে কীর্তনের ঘরাণা বলে স্বীকার করা হয়েছে। কীর্তনের ক্ষেত্রে ঘরাণা শব্দটি কতটা প্রযোজ্য তা বিচারের কথা। ঘরাণা বলতে কোন একটি নির্দিষ্ট পরিবারের সূত্রে কোন একটি নির্দিষ্ট স্থানে এক ধরণের সংগীতের আশ্রয়ে, প্রকরণ বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে নবায়নীবৃত্তির প্রেরণায় সেই সংগীতধারায় নূতন সংযোজন বা বিন্যাস পদ্ধতিতে স্বকীয়তা সৃষ্টিকেই বোঝায়। এই ঘরাণা শব্দটি সর্বপ্রথম প্রয়োগ হয় খেয়াল গানের ক্ষেত্রে। যেমন—কাওয়াল বাচ্চে ঘরাণা সৃষ্টি করেন শাবন্ত ও বুলা নামে দু'ভাই; উত্তরপ্রদেশে আলিগড়ের নিকটে কালে খাঁ ও চাঁদ খাঁ—এ দু'ভাই সৃষ্টি করেন আত্রাওলি ঘরাণা; আবদুল্লা খাঁ ও কাদের বক্স নামে দু'ভাই সৃষ্টি করেন গোয়ালিয়র ঘরাণা, শ্যামরংগ ও সরসরংগ—এ'দুই ভাই সৃষ্টি করেন আগ্রা ঘরাণার একটি ধারা, মইনু খান ও জোরাবর খান নামে দু'ভাই সৃষ্টি করেন ফতেপুর সিক্রী ঘরাণা। ধ্রুপদ গানের ক্ষেত্রে কিন্তু

ঘরাণা শব্দটি প্রচলিত ছিল না। সেক্ষেত্রে ঘরাণাকে বলা হয় 'বাণী'। যেমন—ডাগরবাণী, খাণ্ডারবাণী, নওহরবাণী, গওহরবাণী ইত্যাদি। তেমনি কীর্তনের ক্ষেত্রেও ঘরাণা শব্দটি তেমন প্রচলিত ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে প্রাচীন গায়কগণ গানের পরিচয় দিতে উল্লেখ করতেন—এটি মনোহরসাই ঘরের গান, এটি গড়াণহাটি ঘরের গান: এই 'ঘর' শব্দটি খেয়ালের 'ঘরাণা' শব্দটির সমার্থবোধক হলেও প্রতিশব্দ নয়। গানটির আভিজাত্য বোঝাবার জন্য 'ঘর' শব্দটির ব্যবহার। কিন্তু এ শব্দটির সূত্রে গানটির স্রষ্টার পরিচয় প্রকাশের কোন চেষ্টা নাই। কীর্তনের পদরচয়িতা মহাজনগণ প্রায় সকলেই কম বেশী গায়ক ছিলেন। স্বভাবতই তাঁদের রচিত পদাবলীতে সুর ও তাল সংযোজনের দায়িত্বও তাঁদেরই থাকত। অন্যথায় অপর কেহ এ সুর সংযোজনা করলেও তার পদরচয়িতার ইচ্ছানুযায়ী বা মনোমত হ'তে হ'ত। পরবর্তীকালে গান ট নির্দিষ্ট সুরে সর্বত্রই গাওয়া হ'ত এবং প্রচারিত হ'ত। বৈষ্ণব গায়কগণ সকলেই মোটামুটি প্রাচীনপন্থী, তাই যে কোন পরিবর্তনকে অনায়াসে তাঁরা মানতে পারেন না। পদ, সুর এবং তাল—সকলই যদি নির্দিষ্ট থাকে তবে আর ঘরাণা সৃষ্টির সুযোগ কোথায়? কিন্তু 'ঘর' শব্দটি 'মনোহরসাই', 'গড়াণহাটি' ইত্যাদি ক্ষেত্রে কি কি বৈশিষ্ট্যের জন্য প্রযোজ্য তা আলোচনা প্রয়োজন।

'মনোহরসাই' গান সৃষ্টির ইতিহাস সম্পর্কে বিভিন্ন মত আছে। প্রথমতঃ ধরা হয় এ গান সৃষ্টি হয়েছে কাটোয়ার নিকটবর্তী অঞ্চলে—শ্রীপাট শ্রীখণ্ড জ্ঞানদাস কাঁদড়া, ঝাজীগ্রাম ইত্যাদি এই অঞ্চলের কতিপয় গ্রামকে কেন্দ্র করে। এ অঞ্চলটি 'মনোহরশাহী' নামক পরগণার অন্তর্গত সেজন্যই এ কীর্তনের ধারাকে 'মনোহরসাই' বলে অভিহিত করা হয়। এর মূল স্রষ্টাদের মধ্যে ছিলেন জ্ঞানদাস, রঘুনন্দন আচার্য, নৃসিংহানন্দ মিত্র ঠাকুর, মঙ্গল ঠাকুর প্রমুখ ব্যক্তিগণ। এটি খুবই গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্ত কারণ এর ঐতিহাসিক সমর্থন আছে। দ্বিতীয় মতটিতে বলা হয় মনোহরদাস নামক একজন বিখ্যাত পদরচয়িতা এবং গায়ক যে সংগীতধারা প্রবর্তন করেন তারই নাম মনোহরশাহী গান। কিন্তু মনোহরদাসের পদসংখ্যা খুবই অল্প, তা ছাড়া কীর্তনীয়াদের মৌলিক ইতিহাসেও মনোহরদাসের তেমন গায়কী কৃতিত্বের মোটেই উল্লেখ নাই। তাই সেই মনোহরদাস কীর্তনের একটি বিশেষ ধারা প্রবর্তন করেছেন তা খুব সুস্পষ্ট নয় বলেই গ্রহণযোগ্যও নয়।

'মনোহরশাহী' নামটি পুঁথিগত নাম, গায়ক-বাদকগণ যে নাম বলে থাকেন তা হ'ল 'মনোহরসাই'। এ গানের ধারা একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে গড়ে উঠলেও ক্রমশঃ বর্ধমানের ঐ নির্দিষ্ট অঞ্চল ছাড়া বর্তমান মুর্শিদাবাদ, বীরভূম ইত্যাদি অঞ্চলেও ক্রমশঃ প্রসারলাভ করে। নৃসিংহানন্দ মিত্র ঠাকুর ছিলেন মনোহরসাই গানের একজন প্রবর্তক। তিনি পরবর্তীকালে বীরভূমের সিউড়ির নিকটবর্তী

'ময়নাডাল' গ্রামে বসবাস করেন, সেখানে শ্রীনিতাইগৌর বিগ্রহ স্থাপন ও সেবা প্রকট করেন। তদবধি প্রথমত কীর্তনক্ষেত্রে 'ময়নাডাল' গ্রামের প্রসিদ্ধি সর্বজন বিদিত। ময়নাডালের ধারাতে গায়ক ও বাদক সমভাবে জন্মলাভ করেছেন। পুরোনো দিনের বেশীর ভাগ প্রসিদ্ধ বাদকই ছিলেন ময়নাডালের এবং সেজন্য বলা হ'ত—"উত্তরখণ্ডের বায়ান আর দক্ষিণখণ্ডের গায়ান"—এরাই প্রসিদ্ধ। এই উত্তরখণ্ডের বাদকদের ক্ষেত্রে আদিগুরু বা মূল ওস্তাদ বলতে প্রাত নিকুঞ্জবিহারী মিত্র ঠাকুরের কথাই প্রসিদ্ধ। ময়নাডালের এই নিকুঞ্জবিহারীর খোলবাদন নিয়ে একটি জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। একদিন সকালে অন্য কোন এক গ্রামে গানে যোগদান করার জন্য শ্রীখোল কাঁধে নিয়ে নিকুঞ্জবিহারী চলেছেন। এমন সময় মাঠের মাঝখানে একটি রাখাল বালক তাঁর পথ রুদ্ধ করে তাঁর বাজনা শুনতে চেয়েছেন। বহু চেষ্টা করেও বালককে নিরস্ত করতে না পেরে শ্রীখোলটি খুলে সামান্য একটু বাজালেন। বালকটি বাজনা শুনে মুগ্ধ হয়ে বললেন—"ঠাকুর, আমার ত কিছু নাই তুমি এই কাঁচুলীটা নিয়ে যাও।" কোমরে বাঁধা চাদরটি দিয়েই তিনি কোথায় অন্তর্হিত হয়ে গেলেন। নিকুঞ্জবিহারীরও সংবিৎ ফিরল, তাকাতেই দেখলেন সূর্য তখন পাটে গেছে, প্রায় অপরাহ্ন বেলা। মন খারাপ করে বাড়ি ফিরে গিয়ে নিকুঞ্জবিহারী শুয়ে পড়লেন, পরে স্বপ্নাদেশে জানতে পারলেন মহাপ্রভু স্বয়ং শ্রোতা হিসাবে বাজনা শুনলেন এবং তাঁরই গায়ের উড়ানী নিকুঞ্জবিহারীকে দিয়েছিলেন। এমন আরও অনেক অলৌকিক ঘটনা আছে ময়নাডালকে কেন্দ্র করে। এই ধারার অর্থাৎ মনোহরসাই ধারার বাদকদের মধ্যে অনেক প্রসিদ্ধ বাদক ছিলেন। তাঁদের মধ্যে শেষ যাঁদের আমরা সন্ধান পাই তার মধ্যে ধরণীধর মিত্র ঠাকুর, ময়নাডালের বাজিয়ে কিংকর দাস, রাসবিহারী মিত্র ঠাকুর মহাশয়ের বাজিয়ে ছিলেন। তা ছাড়া ময়নাডালে গীতবাদ্য শিক্ষার টোল আজও আছে। যে কোন ব্যক্তি গান বা বাজনা শিক্ষার উদ্দেশ্যে ময়নাডালে গেলে তাঁদের থাকা খাওয়া ইত্যাদির যথারীতি ব্যবস্থা আছে এবং গান-বাজনাও অনায়াসে শিখতে পারেন।

গানের দিক থেকেও 'ময়নাডাল' হ'ল কীর্তন গানের একটি পীঠস্থান। কারণ এখানে অনেক-গায়ক বাদক জন্মগ্রহণ করেছেন, অনেক গান এখানে প্রকৃত রূপ পেয়েছে। নৃসিংহানন্দ মিত্র ঠাকুর, মঙ্গল ঠাকুর প্রমুখের সময় থেকেই ময়নাডালে গান সৃষ্টি, গান নিয়ে গবেষণা, আখর সংযোজনা তালের বিন্যাস এবং মূল গড়াণহাটি ধারার আশ্রয়ে গানগুলির কলেবর বৃদ্ধির প্রচেষ্টা হয়েছিল। সর্বশেষ পর্যায়ে ময়নাডালের যেসব গায়কদের নাম উল্লেখযোগ্য তাঁরা হ'লেন প্রয়াত রাসবিহারী মিত্র ঠাকুর, প্রয়াত নবগোপাল মিত্র ঠাকুর, গোবিন্দগোপাল মিত্র ঠাকুর, নদীয়ানন্দন মিত্র ঠাকুর প্রমুখ। মনোহরসাই গান সমগ্র অঞ্চলকে আশ্রয় করেই বিকাশলাভ করেছে তবু ময়নাডালের অবদান এক্ষেত্রে

যথেষ্ট। এখনও ময়নাডালের কিছু কিছু মনোহরসাই গান সুপ্রসিদ্ধ। ময়নাডালের বড় দশকোশী খুবই প্রসিদ্ধ গান বলে গণ্য হ'ত। 'জয়রে জয়রে গোরা', 'দামিনীদাম' ইত্যাদি প্রসিদ্ধ বড় দশকোশী গানগুলিকে গড়াণহাটি গান রূপে গণ্য করা হলেও এগুলির মূল সুর ময়নাডালেরই সৃষ্টি, সেজন্য এগুলি ময়নাডালের গান বলেই পরিচিত। অনুরূপ আরও একটি ছাপ্পান্ন মাত্রার এক আবর্তের বড় দশকোশী গানের সন্ধান ঐ ময়নাডালের ঘরেই আছে। ওটিও মনোহরসাই গান বলেই গোবিন্দগোপাল মিত্র ঠাকুর মহাশয় বলে থাকেন। তাই মনোহরসাই গান সৃষ্টি ও বিকাশের ইতিহাসে ময়নাডালের ভূমিকা সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য।

মনোহরসাই গানের ধারা ক্রমশঃ বিস্তারের ক্ষেত্রে শ্রীপাট শ্রীখণ্ডের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বর্ধমান জেলার অন্তর্গত কাটোয়ার নিকটবর্তী এই গ্রামটি। কাটোয়া থেকে বাসে বা বি. কে আর-এর ছোট ট্রেনে যেতে হয়। শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক তাঁর নিকট পার্ষদ নরহরি সরকার, অপর নাম সরকার ঠাকুর এবং পূর্বলীলার মধুমতী জন্মগ্রহণ করেন এই শ্রীখণ্ড গ্রামে। এই গ্রামটি খুবই প্রসিদ্ধ এখানে রঘুনন্দন আচার্যেরও জন্মস্থান, তা ছাড়া অদূরে জাজীগ্রাম শ্রীনিবাস আচার্যের জন্মস্থান। মধুমতীর নিকট মধুপানের জন্য চাহিদা মিটাতে যে দীঘি কাটা হয়েছিল তা এখনও আছে। শ্রীপাট শ্রীখণ্ডে সেব্য বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর এবং নিত্যানন্দ। শ্রীচৈতন্যদেব এই শ্রীখণ্ডের বড়ডাঙার মাঠে এসেছিলেন। সেই তিথিকে স্মরণ করে আজও শ্রীখণ্ডে প্রসিদ্ধ কীর্তন মেলা হয়ে থাকে এই বড়ডাঙার উৎসবে। সুপ্রাচীনকাল থেকে এখানে প্রাচীন গায়ক-বাদকগণ সকলেই উৎসবে আসতেন এবং থাকতেন। সেই সূত্রে যেসব নতুন এবং প্রসিদ্ধ গান শোনা যেত সরকার ঠাকুরের বংশধরগণ বা মহাপ্রভুর সেবকগণ সে গান শিখে সংরক্ষণের চেষ্টা করতেন। তাই সকলেরই চেষ্টা থাকত এই আসরে কিছু নূতন গান গাওয়া যায় কিনা। যেসব মেলার সূত্রে মনোহরসাই গান বিস্তারলাভ করে বড়ডাঙার মেলা তার মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ। এই শ্রীপাটে ব্যবস্থা ছিল যে কোন ব্যক্তি গান বা বাদ্য শিক্ষা করতে গেলে এখানে থাকা খাওয়া এবং শিক্ষার সুব্যবস্থা করা হত। সরকার ঠাকুরের গান নরোত্তম ঠাকুর, নরহরি চক্রবর্তী, রামচন্দ্র কবিরাজ, গোবিন্দদাস প্রমুখের খুবই প্রিয় ছিল। সেজন্য তাঁর কিছু কিছু গান গড়াণহাটি গান বলে এখনও প্রসিদ্ধ। তা হলেও মনোহরসাই গানের মূল উদ্ভাবকগণ অনেকেই এখানকার লোক, সেজন্য মনোহরসাই গানই এখানে বেশী বিস্তারলাভ করে। এ বংশের ধারকদের শেষ খ্যাতিমান পুরুষ ছিলেন প্রয়াত গৌরগুণানন্দ ঠাকুর এবং সেই সময়ের বাদক ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ কবিরাজ, রচয়িতা কবিদের মধ্যে ছিলেন রাখালানন্দ ঠাকুর শাস্ত্রী প্রমুখ। এখানে থেকে যাঁরা গান শিখে গেছেন তাঁদের শেষ পর্যায়ের গায়কের মধ্যে

ছিলেন প্রয়াত হরিদাস কর, পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য প্রমুখ কয়েক জন।

মনোহরসাই গান রাঢ় বাংলার একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে, মুর্শিদাবাদ জেলা ঐ বিষয়ে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। এখানে বিশেষ বিশেষ কয়েকটি গ্রামসূত্রে ধারাটি বিকাশলাভ করে। যেমন 'পাঁচথুপি' গ্রাম। এ গ্রামের বেশীরভাগ লোকের এককালে মূল পেশাই ছিল মূলগায়েনী, দোহারী বা বায়েনী করা। এই পাঁচথুপির প্রধান এবং প্রাচীনতম গায়ক ছিলেন 'চন্দজী' তাঁর আসল নাম ছিল কৃষ্ণদয়াল চন্দ। তিনি বহু গান শিখেছিলেন এবং কিছু কিছু গানের সুর সৃষ্টিও করেছেন। তেওট তালের একটি নির্দিষ্ট জাত সুর—অর্থাৎ খণ্ডিতা গানের—'ভালই হইল আরে বন্ধু', কুঞ্জভংগ গানের 'শারী শুক দুহু জনে', 'কানন দেবতা হেরি' ইত্যাদির সুর—চন্দজীর সৃষ্টি, এজন্য 'পাঁচথুপির তেওট প্রসিদ্ধ' বলে একটি প্রবাদ আজও প্রচলিত আছে। এ'ছাড়াও পাঁচথুপির একতালিও প্রসিদ্ধ। এখানকার বাদকদেরও এককালে প্রসিদ্ধি ছিল। পাঁচথুপির খোলের মাটি আজও প্রসিদ্ধ। ঐ মাটির খোলের ধ্বনি খুব মিষ্টি এবং সহজে নোনা ধরে না। মনোহরসাই গান সৃষ্টি ও প্রচারের আরও একটি বিশেষ কেন্দ্র হ'ল মুর্শিদাবাদের মুনিয়াডিহি গ্রাম। এখানকার প্রসিদ্ধ গায়কদের মধ্যে ছিলেন দামোদর কুণ্ডু যিনি 'ঐ যায়, হারুয়া নাগর, যেতে যেতে আবার ফিরে চায়'—হোরির একটি গানে এই আখর সংযুক্ত করে ভাবসৃষ্টির মাধ্যমে বৃন্দাবনের আসরের সকল শ্রোতাকে উঠিয়ে যমুনার দিকে নিয়ে চলে গেলেন। রাগাশ্রিত গানে এই দামোদর কুণ্ডুর প্রসিদ্ধি সর্বজনবিদিত। রাধিকা সরকার অলৌকিক সূত্রে তাঁর গান শিখতে পেরেছিলেন ঘরে বসে। এখানকার দুঠুকী এবং আড় তাল খুবই প্রসিদ্ধ। যদিও পরবর্তীকালে অবধোত বাঁড়ুজ্জে মশাএর দুঠুকী খুব রসাল ছিল। বাঁড়ুজ্জে মশাই দুঠুকীতে গাইতেন ছেড়ে ছেড়ে খুব বেশী গমক ব্যবহার করে। 'কিরূপ হেরিনু মধুর মুরতী"—ইত্যাদি সুরের দুঠুকী ছিল বাঁড়ুজ্জে মশাইর মুখে ভাল আর 'সজনী ও ধনী কে কহ বটে' কিংবা 'বৃষভানু কুমারী নন্দকুমার' ইত্যাদি দুঠুকী গানের সুর দামোদর-কুণ্ডুর সৃষ্টি বলেই ঘোষিত। তা ছাড়া এ গ্রামের গায়কদের সূত্রে নানাধরনের তুক গানের প্রচার হয়েছে। এ গ্রামে বড় বড় বাদকও সৃষ্টি হয়েছেন। যেমন বৈষ্ণবচরণ দত্ত, রাম কুণ্ডু প্রমুখ এবং জীবিত পর্যায়ে শ্রীব্রজরাখাল দাস। বাঁড়ুজ্জে মশাইএর দুঠুকী প্রসিদ্ধ ছিল সত্য কিন্তু তিনি সুর সৃষ্টি করেন নাই। তিনি ছিলেন মাতুল বিপিনবিহারী, দামোদর কুণ্ডু, রসিক দাস প্রমুখ কীর্তনীয়ানের ছাত্র। মনোহরসাই গানের মুখ রসিক দাসের খুবই রসাল ছিল। বাঁড়ুজ্জে মশাই পণ্ডিত ছিলেন এবং রসিক দাসের ছাত্র হিসাবে গানের যে মুখ তিনি পেয়েছিলেন অন্য কোন ছাত্র তা পায় নাই। বাঁড়ুজ্জে মশাইর প্রিয় ছাত্রবর্গের মধ্যে আছেন শক্তিপুরের পঞ্চানন দাস, দুপুকুরিয়ার প্রসিদ্ধ

কীর্তনীয়া শ্রীনন্দকিশোর দাস, তা ছাড়া ছিলেন প্রয়াত গৌর দাস, গারাজীবন দোহারের খ্যাতি নিলেন তিনি কিন্তু গানের ছিল অপূর্ব মুখ।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয়ের জন্মস্থান শ্রীপাট ঝামটপুর, রেল স্টেশন ঝামটপুর বহরান, নিকটবর্তী গ্রাম দক্ষিণখণ্ড। এই গ্রামে একটি পরিবারের সূত্রে মনোহরসাই গান বিশেষভাবে প্রসারলাভ করে। এ পরিবারটির সূত্রপাত প্রাচীনকাল থেকেই হয়েছিল সন্দেহ নাই তবে এদের প্রসিদ্ধি স্থাপিত হয় অনুরাগীদাসের আমলে। তাঁর পুত্র রসিকদাস মনোহরসাই গানের একজন প্রবাদপুরুষ। তাঁদের ধারায় রাধাশ্যাম দাস, নন্দ দাস প্রমুখ অনেকে ছিলেন। এঁদের মুখে গানের দশা একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার। যেমন ছিল প্রত্যেকের কণ্ঠের জোর তেমন আখর ও ঘটকালি দিয়ে গানকে পরিপূর্ণ করতেন। অপূর্ব সুরের ভিয়ান করে অদ্ভুত দশা সৃষ্টি করতেন। গানের দশার কথা উল্লেখ করতে গেলেই রসিক দাস আর গণেশ দাস। রসিক দাস ছিলেন বড় গানের গায়ক এবং বড় গানের আশ্রয়ে রসসৃষ্টি কারক আর গণেশ দাস ছিলেন 'কোকিল-কণ্ঠ'। সুরের ভাঁতি ছড়িয়ে গানকে জীবন্ত করে তুলতেন এবং পরিবেশকে প্রকট করে তুলতেন। তা ছাড়া মনোহরসাই গানের শ্রেষ্ঠ গায়ক এবং আজও প্রাতঃস্মরণীয় বলে যাঁদের নাম উল্লেখ করা যায় তাঁরা হলেন—রাধিকা সরকার, ফটিক চৌধুরী, অন্ধ শিবদাস, আখরিয়া হরিদাস, রামগোপাল আচার্য, হরি আচার্য, প্রেমদাস, গণেশদাস, আরও পরবর্তীকালে ছিলেন—শচীনন্দন ঘোষ ও তাঁর পুত্র কমল ঘোষ, আখরিয়া হরিদাসের পুত্র দাঁইহাটের গৌরগোপাল, ষতীনদাসের ছাত্র নবদ্বীপের প্রয়াত রাধারমণ কর্মকার (আদি বাড়ি ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের সিরাজাবাদ) ধ্রুব দাস ও তাঁর পুত্র রামকৃষ্ণ, দক্ষিণখণ্ডের যামিনী মুখোপাধ্যায়, নবদ্বীপের রাধাচরণ বাবাজী, মুর্শিদাবাদের দুঃখভঞ্জন সান্যাল, কলকাতায় গোয়াবাগানের রাধারমণ বাবাজী, রাসবিহারী মিত্র ঠাকুরের ছাত্র কানাইলাল গুহ, পূর্ববঙ্গের উথলীর প্রাণাধিক গোস্বামী। এ ছাড়া গোস্বামী-বংশের অনেকে ছিলেন যাঁরা মনোহরসাই গড়াণহাটি দু' ধরনের গানই বিশেষ শিক্ষা করেছিলেন। এঁদের কাছে অনেক বড় বড় গান রক্ষিত ছিল। এমন গোস্বামী সন্তানদের মধ্যে ছিলেন হাওড়া রামকৃষ্ণপুর গোঁসাইবাড়ির গৌরগোপাল গোস্বামী, তাঁর পুত্র মদনগোপাল গোস্বামী এবং অন্যেরা, নবদ্বীপ মণিপুরের আনন্দগোপাল গোস্বামী, রামগোপাল গোস্বামী প্রমুখ, বহরমপুরের নিতাই গোস্বামী, নবদ্বীপের বড় প্রাণগোপাল গোস্বামী (মদনমোহন বাড়ি), যদুগোপাল গোস্বামী প্রমুখ।

বৈশিষ্ট্য :

মনোহরসাই গানের কতগুলি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য আছে যার ভিত্তিতে এ গানকে

গড়াণহাটি গান থেকে অনায়াসে পৃথক করা যায়।

প্রথমতঃ মনোহরসাই গান রূপ পরিগ্রহ করে এমন একটি প্রচেষ্টার ফলে যে প্রচেষ্টা ছিল কীর্তনকে ঘরে ঘরে পেঁাছে দেওয়ার অর্থাৎ যথার্থভাবে গণমুখী করে তুলবার। শ্রোতাসাধারণের মনোহরা বৃত্তি অর্থাৎ মনোরঞ্জন করবার চূড়ান্ত প্রয়াস এ গানের শৈল্পিক কুশলতায় লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। ফলতঃ শিল্পীর অপার স্বাধীনতা থাকে এ গানের ক্ষেত্রে। এজন্যই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের আখর, ঘটকালি, পর্যায় প্রকরণ তৈরী হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ, দলবদ্ধ হয়ে না গাইলে মনোহরসাই গানের প্রকৃত রূপ ফুটে ওঠে না। শিরদোহার, বাঁ দোহার, কান দোহার, শির বায়ান, বাঁয়াটি, কোল বায়ান ইত্যাদি পরিভাষাগুলি মনোহরসাই গানের সূত্র থেকে জন্মেছে। সকলের সমবেত প্রচেষ্টা থাকে বলেই সৃষ্টিটি সমৃদ্ধ হয়ে উঠে। তাছাড়া মূল গায়েনের মননপ্রক্রিয়াটির সুযোগ থাকে বেশী, ভেবে ভেবে আখর, সুর, ছন্দ বা রসের কথা সংযোজন করার সুযোগ পান। এ যৌথ প্রকরণে যে যাঁর অংশে সকলেই খুব মূল্যবান কারণ দোহার, বায়েন ইত্যাদি যে-কোন অংশ ন্যূন হ'লে সমগ্র অনুষ্ঠানটির গুরুত্ব নষ্ট হয়ে যায়।

তৃতীয়তঃ মনোহরসাই গানের সূত্র ধরেই পালাগান বা লীলাকীর্তনের সূচনা হয়। ভিন্ন ভিন্ন পদগান গাইবার রীতি হ'ল গড়াণহাটি যেজন্য ঐ গানের আখর কম গাম্ভীর্য বেশী কিন্তু মনোহরসাই পদ্ধতি গৌরচন্দ্রিকা থেকে শুরু করে মিলন পর্যন্ত সমগ্র লীলাপ্রসংগটি মহাজন বিরচিত বিভিন্ন পদাবলী সংযোজন করে পর্যায় করে নাটকীয়ভাবে গাওয়াই নিয়ম। রাধাকৃষ্ণ লীলা-প্রসঙ্গের ঘটনাটি কোন শাস্ত্রীয় বা পুরাণের সূত্র ধরে স্থির করে নেওয়া হয়। যেমন—রাসলীলা, মাথুরলীলা, ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবতের সূত্র থেকে; নৌকাবিলাস বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' ও মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' গ্রন্থের পরিশিষ্টের সূত্রে এবং প্রচলিত লোকগাথার সূত্রে; মান বা কলহান্তরিতা—কবি জয়দেবের 'গীতগোবিন্দের সূত্রে, তাছাড়া কালোচিত লীলাপ্রসংগ গোস্বামীবর্গের চিন্তা ও কল্পনার সূত্রে। ঋতু উৎসবের বিভিন্ন লীলাপ্রসংগ গোস্বামীবর্গ প্রণীত বিভিন্ন লীলাগ্রন্থের আশ্রয়ে যেমন গোবিন্দলীলামৃত, গোপাল চম্পূ, আনন্দবৃন্দাবন চম্পূ, দানকেলি কৌমুদী, ললিতমাধব, বিদগ্ধমাধব ইত্যাদি গ্রন্থের সূত্র থেকে বিষয় উদ্ধার ও তদনুপাতিক পদ সংযোজন করে পালা সৃষ্টি করতে হয়। কিন্তু অনেক সময় পালাকে পূর্ণায়ত রূপ দেবার উপযোগী পদ পাওয়া যায় না বা সৃষ্টি হয় নাই—সেক্ষেত্রে গায়ক অন্তর্বর্তী কোন তুক গান বা ঘটকালি ব্যবহার করে গানগুলি সংকলনের বা গ্রন্থনার সূত্র সৃষ্টি করেন। সমস্ত সংকলনটি যতই নাটকীয় হয়, গায়কের বাচনভঙ্গীতে রসসৃষ্টির প্রচেষ্টা যতই ফুটে উঠে, বিষয়টি ও গানের ধারাটি ততই জনপ্রিয় হয়। তাই মনোহরসাই

গানের ধারা যৌথ সংগীতধারা হিসাবে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে।

চতুর্থতঃ মনোহরসাই ধারায় গানপ্রসংগ অপেক্ষা লীলাপ্রসংগের উপর গুরুত্ব বেশী থাকায় লীলাবিন্যাসের সূত্রে রসের নানাবিধ প্রকরণ সৃষ্টি হয়েছে। নানা ধরনের মিলনপর্যায়ও সৃষ্টি হয়েছে, যেমন মালিনী মিলন, যোগিনী বেশে মিলন, দেয়াসিনী বেশে মিলন, সূর্যপূজাচ্ছলে মিলন, কলাবতী মিলন, পেটারী মিলন, বেদেনী মিলন, সুবল মিলন, চিত্রপটে মিলন, তমালে মিলন তাছাড়া নানাবিধ ভাবসম্মেলন, এসবই মনোহরসাই গানের ধারা প্রচলনের পরে ক্রমশঃ সৃষ্টি হয়েছে। এ প্রভাবগুলি বিভিন্ন পালা প্রকরণে সংযুক্ত হওয়ায় কিছু কিছু চটুলতাও সৃষ্টি হয়েছে। 'তুকগান'গুলিরও জন্ম মনোহরসাই ধারার বিকাশের সংগে সংগেই হয়েছে। গানগুলি 'তুক' অর্থাৎ এ গানের পদকর্তার নাম অজ্ঞাত কিন্তু সুরের বিচারে খুবই বর্ধিষ্ণু। ভাল 'তুকগান' জানা না থাকলে পালার গাঁথুনী ভাল করা যায় না এবং মনোহরসাই গায়ক হিসাবে প্রতিষ্ঠা পাওয়া যায় না।

পঞ্চমতঃ, কীর্তনের প্রচলিত সংগীতধারাকে বিশ্লেষণ করলে গানগুলিতে কোন কোন ক্ষেত্রে হিন্দুস্থানী রাগসংগীতের প্রভাব এবং কোথাও লোকসংগীতের প্রভাব দেখা যায়। এ প্রভাবগুলি সংযোজিত হয়েছে মনোহরসাই গায়কদের প্রচেষ্টায়। এ সংযোজন অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকে করা হয়েছে। অবশ্য মধ্যযুগীয় মংগলগানের প্রভাব, ধামাইল, তরজা, নাটগীতি ইত্যাদির প্রভাব প্রাচীনকালেই আঞ্চলিক সূত্রেই সংযোজিত হয়েছে। মনোহরসাই হল 'রাঢ়ী কীর্তন' অর্থাৎ রাঢ়দেশীয় কীর্তন আর 'গড়াণহাটি' হল বরেন্দ্র কীর্তন অর্থাৎ, উত্তরবংগের কীর্তন। এর মধ্যে 'রাঢ়ী কীর্তন' ভাষাটি প্রচলিত আছে কিন্তু 'বরেন্দ্র কীর্তন' ভাষাটি অপ্রচলিত। সৃজনক্ষেত্রেও তাই, কারণ মনোহরসাই হল রাঢ়েরই পরগণা আর গড়েরহাট হল রাজশাহী অর্থাৎ বরেন্দ্রভূমির পরগণা।

ষষ্ঠতঃ, মনোহরসাই গানের ভাঁতিতে সুস্পষ্ট একটি লৌকিক প্রভাব পাওয়া যায়। মীড়ের কাজ এবং সুরের কোনাকুনি যেন শ্রুতিগুলির উপর দিয়ে গড়িয়ে চলে। এগুলি কোন সাধা গলার কাজ নয় কারণ সাধা গলা স্বভাবতই যান্ত্রিক প্রভাবযুক্ত আর সাধা নয় এমন মেঠো গলা সম্পূর্ণভাবেই যান্ত্রিক প্রভাবমুক্ত এবং স্বভাবসিদ্ধ মিষ্টতায় পরিপূর্ণ। সুরগুলি বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই আখরকে নিয়ন্ত্রণ করে তাই সুরগুলি হয় খণ্ড খণ্ড এবং স্তরে স্তরে। এ সুরের খাদ আছে অর্থাৎ উদারার পঞ্চম, মধ্যম পর্যন্ত নামে, আবার চড়া বা চিতান আছে যা তার সপ্তকের পঞ্চম পর্যন্ত চলে যায়। বেশীরভাগ গানগুলির সুর বিচার করলে দেখা যায় মূল গানের পদটির সুর এক ভাঁতির আবার আখরের সুরে অন্য ভাঁতি। আবার একই ভাঁতি বিভিন্ন গানের আখরে প্রয়োগ করা হয়। মূল গানের সুর ভিন্ন কিন্তু আখরের সুর এক। তাই স্পষ্ট বোঝা যায় মূলগান এবং তার

সুর হ'ল প্রকৃত প্রাচীনতাবিশিষ্ট গান আর আখর হ'ল পরবর্তী সংযোজন যা আসরের প্রয়োজনে করা হয়েছে ; তাই আখরের এই সুরগুলি মনোহরসাই সুরের অংশবিশেষ।

সপ্তমতঃ, মনোহরসাই গানে কতগুলি নির্দিষ্ট তালের আশ্রয়ে ঘটকালি কথা বা সুরের বিস্তার করা হয়। বিশেষ করে একতালি, ঝাঁতি, দুঠুকী, দাসপ্যারী, লোফা, চঞ্চুপুট, ছোট দশকোশী, বিরাম দশকোশী, তেওটের কাটান ইত্যাদিতে। কিছু গানের মুখ আসার আগেই অনেক সময় ঠেকা জুড়তে হয় তখন ঘটকালির সুর চলতে থাকে, গানের ভিয়ান তৈরী হয়। যেমন – 'হরি বড় গরবী' এই একতালি গানটি আরম্ভ হবার আগেই ভিয়ান শুরু হল—"দূতি যাবি যারে" সংগে সংগে ঠেকা শুরু হয়ে গেল, আর মূল গায়েন গাইতে লাগলেন 'কৃষ্ণ আনতে যাবি যারে, যেয়ে যেন আগে কথা, ও কথা কহিস না সে যে আমার আমার হরি'। এই হরি শব্দটি থেকে মূল গানটি শুরু। কোন কোন ক্ষেত্রে আগেই একটি জমাট মাতন হয়ে যায় তার পরে মূল গান শুরু। এগুলি সাধারণত দাসপ্যারী, তেওট এবং কোন কোন মধ্যম দশকোশী গানের সংগেই প্রযোজ্য। মনোহরসাই গানের প্রকরণে ধরা তালের গান খুবই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বিশেষ করে চব্বিশ চাপড়ের 'মুখমণ্ডল', 'আধল প্রেম' ইত্যাদি গানগুলি। এগুলির উত্তরার্ধের মধ্যমের কাটান মনোহরসাই কীর্তনের অন্যতম আকর্ষণ। তাছাড়া 'কাঁটা ধরা' তালের গান এবং তার ঠেকা খুবই উল্লেখযোগ্য। এগুলি বলে বোঝাবার কথা নয়। যাঁরা শুনেছেন—'কদম্বেরি বন হৈতে কিবা শব্দ আচম্বিতে আসিয়া পশিল মোর কানে'—ইত্যাদি 'কাঁটা ধরা' তালের গান কেবল তাঁরাই মনোহরসাই গানের আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য সম্বধে অনায়াসে ধারণা করতে পারেন।

অষ্টমতঃ, মনোহরসাই গানের আখর সংযোজন এবং তার পর্যায়ভেদ একটি অভিনব সংযোজন। আখরের ভাষায় লৌকিক ভাষার প্রভাব, আঞ্চলিক উচ্চারণ-বিধি এবং সেইসংগে তৎকালীন প্রচলিত সাহিত্যের ধারার প্রভাব কিছুটা লক্ষ্য করা যায়। আখর ভাষাবহুল থাকে বলে রবীন্দ্রনাথ একে বলেছেন 'কথার তান'। আখর নানা কারণে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। মনোহরসাই গানে আখরেরই প্রাধান্য থাকে তাই গান অনায়াসেই বোঝা যায়। মূল গানের সুরের সংগে সংগতি রেখে আখর সংযোজন করা হয়। গানের সুর যদি নীচুর দিকে থাকে, আখরের সুর মধ্যসপ্তক থেকে শুরু হয়ে ক্রমশঃ স্তরে স্তরে গিয়ে তারার পঞ্চম পর্যন্ত চড়িয়ে দেওয়া হয়। এসব আখরই গানের উজ্জ্বলতা আনে। সব স্তরেই একটা চড়ার কাটান থাকে এটি মনোহরসাই গানের বৈশিষ্ট্য। আবার অনেক গান শুরুতে মাতন দিয়ে চড়ায় গান ধরা হয় সে ক্ষেত্রে আখরগুলি অনেক সময় নিচুর দিকে শুরু হয়। আখর সংযোজনের সাধারণ পদ্ধতি হল মূল গানের

খানিকটা অংশ অর্থাৎ কিছু মাত্রা পরিমাণ বজায় রেখে অন্য মাত্রাগুলিতে প্রথম আখর সংযোগ করতে হয়, দ্বিতীয় পর্যায়ে, আখর অংশটি ধরে রেখে মূল গানের অংশের মাত্রা কয়টিতে দ্বিতীয় আখরের কথা ক'টি বসান হয়, এরপর প্রথম আখরের মাত্রা কয়টি নিয়ে চড়া কাটান দেওয়া। এটি শেষ কাটান হ'লে এখানেই মাতন। আবার, আখরের ঘর তৈরী করে নানা কথা জুড়ে কেটে কেটে বহু আখর সংযোজন করা হয়। কিছু কিছু গানে কথার মালা গেঁথে 'শিবলী আখর' জোড়া হয়। বিশেষতঃ কাটা দশকোশী, কাটা ধরা, 'কাটা দাসপ্যারী ইত্যাদি তালে। গড়াণহাটি গানেও আখর আছে কিন্তু আখরের ভাষা হয় মূলগানের কথার অংশ-বিশেষ দিয়ে, নচেৎ 'আহারে', 'আহা মরিরে' ইত্যাদি অব্যয়সূচক শব্দ যোগ করে। মনোহরসাই গানের আখর সংযোজন সকলেই করতে পারে কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে প্রাচীন নির্বাচিত আখরই ব্যবহার হয়ে থাকে। সেইমতো আখরের নামও আছে—যেমন গণেশ দাসের আখর, রসিক দাসের আখর, হরিদাসের আখর, শিবদাসের আখর ইত্যাদি। সুতরাং আখরবৈশিষ্ট্য হল মনোহরসাই গানের সবচেয়ে আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।

নবমতঃ, মনোহরসাই গানের পরিবেশনক্ষেত্রে গায়েন এবং বায়েন উভয়েই প্রায় সমগুরুত্বসম্পন্ন। বায়েন ভাল না হলে গানের ঠেকা করা সম্ভব নয়। আখরগুলিকে সজীব করে তোলার দায়িত্ব বায়েনের। লহরের পর লহর সংযোজন করে মূল ঠেকা থেকে কাটিয়ে কাটিয়ে একটি নৃত্যপর্যায়ে নিয়ে যায় এবং মাতিয়ে গানের সার্থকতা প্রতিপন্ন করে। গায়ক বাদক দুজনাই নাচে। গড়াণ-হাটি গানে ঠিক তা হয় না। গান বাজনা এক্ষেত্রে বসে বসে করা হয়। মনোহরসাই গানের বাজিয়েরা থাকে আসরের বাজনায় দক্ষ, গানের ছন্দ থেকে বাজনার জন্ম হয় আবার বাজনার ছন্দ দিয়ে গানকে মাতিয়ে তোলে। গায়ক-বাদকের সাথ সঙ্গতেই মনোহরসাই গানের মূল স্বরূপকে ফুটিয়ে তুলতে পারে। উভয়ের সমন্বয়েই গানের দশার সৃষ্টি হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

কীর্তনের তাল

কীর্তনে প্রচলিত তালগুলির প্রকারে এবং প্রয়োগে কতকগুলি অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য থাকার দরুণ কীর্তনাঙ্গীয় একটি পৃথক তাল পদ্ধতির স্বীকৃতি দেওয়া অতীব চিন্তাপ্রসূত বলে আমি মনে করি। প্রথমেই তালের নামগুলি বিচার করলে দেখা যায় যে এগুলি অভিনব এবং বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই বাংলা ভাষা প্রভাবিত। দাসপ্যারী, ডাঁস পাহিড়া, ললিতপ্যারী, ধামালী, চণ্ডুপুট, গঞ্জন, ধরা, কাটাধরা, পঞ্চম ইত্যাদি আট মাত্রা বা ষোল মাত্রায় তালগুলির নাম বাংলা ভাষা ভিত্তিক। লোফা, জপ, দোজ ইত্যাদি ছয় বা বারমাত্রার তালগুলির নামেও একই ইঙ্গিত। একতালি, দোঠুকি, দশকোশী, তেওট, সম, যোৎসোম (যতি) ইত্যাদি সাত, চৌদ্দ বা আঠাশ মাত্রার তালগুলির নামও একই রূপ। তা ছাড়া আড়, বীরবিক্রম, শশিশেখর, রূপক, ইন্দ্রভাষ, মদনদোলা, বিষমসমুদ্র ইত্যাদি নামগুলিও ব্যুৎপত্তিগতভাবে বাংলা ভাষা জাত বলে মনে করা যায়। এ দ্বারা কীর্তন গানে আঞ্চলিকতার বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। এ নামগুলির দু'একটি যেমন রূপক ও একতালি ছাড়া অন্য নামগুলি অন্য কোন সঙ্গীতের তালপদ্ধতিতে দেখা যায় না। ঐ তালগুলিই প্রাচীন গ্রন্থে উক্ত আছে যেমন 'আদাবষ্টস্তথারুদ্র ব্রহ্ম ইন্দ্র চতুর্দ্দশ'......ইত্যাদি—সঙ্গীতসার প্রদত্ত শ্লোক। ঐ গ্রন্থটি অবশ্য পার্শ্বদেব প্রণীত সঙ্গীত সময়সার বা কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত গীতসূত্রসারও নয়, ঐটি চতুর্দশ শতাব্দীর কোন গ্রন্থকারের লেখা এবং ঐটির উল্লেখ আছে শব্দকল্পদ্রুম গ্রন্থে। যা হোক তালগুলির নাম সংকলন করা হয়েছে যেমন অষ্টতাল, রুদ্রতাল, ইন্দ্রতাল, ব্রহ্মতাল এবং চতুর্দশ তাল, সেগুলি সবই বিভিন্ন তালের গুচ্ছ। ঐ গুচ্ছতালের অংশতালগুলিরও ব্যবহার আছে যেমন আড় দোজ, যতি, শশিশেখর, গঞ্জন, পঞ্চম, রূপক ও সম—অষ্টতালগুচ্ছের অন্তর্ভুক্ত। এমন রুদ্রতালে আছে এগারটি তাল, ইন্দ্রতালে আছে ছয়টি তাল, এগুলির অংশতাল-গুলিতে আছে দাসপ্যারী, ইন্দ্রভাষ, মদন দোলা, বীরবিক্রম, বিষমসমুদ্র ও বীরদশক। ব্রহ্মতালে আছে চারটি তাল—ব্রহ্ম, বিরামব্রহ্ম, ষট্‌কলা ও সপ্ত মাত্রা, চতুর্দশ তালে আছে চৌদ্দটি তাল। এগুলি সুড় প্রবন্ধানুগ তাল।

কীর্তনাঙ্গীয় তালপদ্ধতিতে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে তালের প্রধানতঃ দুটি অংগ ধরা হয়—ছুট এবং জোড়া। তালের অংশগুলির মধ্যে একটি তালাঘাত ও অপর কয়েকটি নিঃশব্দ ক্রিয়া সংযোজনে যে স্বাভাবিক অংগটি বোঝান হয় তাকেই বলা হয় ছুট। ঐগুলি সাধারণত দুই মাত্রা, চার মাত্রা বা আট মাত্রা হয়ে থাকে। আবার

জোড়া প্রতিক্ষেত্রেই ছুটের অর্ধসংখ্যক মাত্রাসমন্বিত অংগ। প্রাচীন তালশাস্ত্রে 'যুগ্ম তাল' বা 'যুগলতালিকা' বলে যে পরিভাষা ব্যবহৃত হয় তা-ই পরবর্তীকালে 'জোড়া' নামে বাংগালী পদ্ধতিতে স্থান পেয়েছে। ছুট দুই, চার বা আটমাত্রা সমন্বিত হ'লে জোড়া হয়ে যথাক্রমে এক, দুই বা চার মাত্রা। ছুট ক্ষেত্রে দক্ষিণ ভারতীয় লঘু অংগটির চরিত্র লক্ষণীয় কারণ জাতি পরিবর্তনের জন্য যেমন লঘুর মাত্রা সংখ্যা তিন, চার, পাঁচ, সাত বা নয় করা হয় তেমন ছুটেরও মাত্রা সংখ্যা পরিবর্তন করে ছোট, মধ্য এবং বড় অর্থাৎ দ্রুত, মধ্য এবং বিলম্বিতে রূপান্তর করা হয়। ঐ রূপান্তর স্বভাবতই প্রাচীন তালপদ্ধতির মার্গভেদের স্বরূপ। একটি তালের চিত্র মার্গের রূপকে ছোট, বার্তিক মার্গের রূপকে মধ্য এবং দক্ষিণ মার্গের রূপকে বড় বলে অভিহিত করা হয়। মার্গভেদ বৈশিষ্ট্যটি কেবলমাত্র কীর্তনাংগীয় তালেই সুপ্রাচীন কাল থেকে প্রচলিত। অবশ্য বর্তমান যুগে একতাল ইত্যাদি হিন্দুস্থানী পদ্ধতির তালসমূহে অনুরূপ প্রকরণ দেখা যায় কিন্তু ঐগুলির সৃষ্টি বিগত কয়েক বছর আগে, তাই বৈশিষ্ট্যগুলির প্রাচীনতা থাকলেও প্রবর্তন আধুনিক।

প্রাচীন কালে তালের মাত্রার গতি সম্পর্কে অবহিত করবার জন্য হস্ত এবং অংগুলি সঞ্চালন দ্বারা কখনও সশব্দ কখনও নিঃশব্দ যেসব ক্রিয়া ব্যবহৃত হ'ত সেই পদ্ধতির ক্রিয়ার কিছু কিছু ব্যবহার কীর্তনাংগীয় তালপদ্ধতিতে দেখা যায়। কীর্তনাংগীয় পদ্ধতিতে সশব্দ ক্রিয়া একটি এবং তাকে বলা হয় তাল। প্রাচীন কীর্তন পদ্ধতিতে প্রতিটি গায়কের হাতেই এক জোড়া কাংস্যনির্মিত করতাল থাকে, সশব্দ ক্রিয়াটি প্রকাশ করে ঐ করতালের আঘাত দ্বারা। অবশ্য পরবর্তীকালে করতাল ধারণ না করে কেউ কেউ হাতে তালি দিয়ে সশব্দ ক্রিয়াটি বোঝান। ঐ তালির মাধ্যমে তালের প্রকৃতি বোঝাবার রীতি সুপ্রাচীন, শ্রীচৈতন্যদেব নিজেও কীর্তনবিধি প্রচার নিমিত্ত 'দিশা দেখান প্রভু হাতে তালি দিয়া'—চৈতন্য ভাগবতে উক্ত আছে। নিঃশব্দ ক্রিয়াগুলির মধ্যে ফাঁক এক প্রকারের ক্রিয়া, হিন্দুস্থানী পদ্ধতির 'খালির' এবং দক্ষিণ ভারতীয় পদ্ধতির 'বিসর্জিতমু'-এর মত। এ ক্রিয়া করতলের সম্মুখভাগ দেহাভিমুখে রেখে দেহ থেকে দেড় ফুট পরিমাণ সম্মুখে সঞ্চালন করে প্রকাশ করা হয়। 'ফাঁক' শব্দটি বাংলা, তাই এটি গৌড়ীয় সংগীতের পরিভাষা বলে গণ্য হওয়া উচিত। যদিও হিন্দুস্থানী সংগীতের কোন কোন গায়ক 'ফাঁক' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। অপর একটি নিঃশব্দ ক্রিয়া 'কাল'। এটির প্রয়োগ সাধারণতঃ হয় মধ্যগতির তালকে 'বড়' গতিতে পর্যবসিত করতে অর্থাৎ বার্তিক মার্গ থেকে দক্ষিণ মার্গে রূপান্তরিত করতে। হস্ত যে অবস্থায়ই থাকুক তার থেকে ঠিক উল্লম্বভাবে নয় দশ ইঞ্চি পরিমাণ উপরের দিকে উঠিয়ে যে ক্রিয়া দেখানো হয় তাকেই বলে 'কাল'। শব্দটি তালের দশ প্রাণের একটি প্রাণ হিসাবে গণ্য সেক্ষেত্রে এটির অর্থ হ'ল তালে ব্যবহৃত

সময়ের একক মাত্র। কিন্তু কীর্তনাঙ্গীয় পদ্ধতিতে এটি একটি নিঃশব্দ ক্রিয়া। অপর যে ক্রিয়াটি এ পদ্ধতিতে সর্বাধিক প্রযোজ্য সেটি হ'ল 'কোশী' বা 'কুশী'। 'কোশ' শব্দটির গ্রামীণ প্রয়োগে দেহের 'কোল' অংশ বুঝায় এবং 'কোশী' শব্দটিও তাই কোলের দিকে হাতটিকে টেনে আনা বা কোলের দিক থেকে হাতটিকে সরিয়ে নেওয়া উভয়কেই বোঝায়। এ ক্রিয়া বোঝাবার জন্য হাতটি বাহু ভাগের সঙ্গে সমকোণে রেখে কনুইটি দেহ থেকে নয় দশ ইঞ্চি সম্মুখের দিকে সঞ্চালিত করা হয় আবার ঐ কনুইটি কোলের দিকে টেনে দেহের পিছন দিকে ছয় সাত ইঞ্চি সরিয়ে নেওয়া হয়। 'কোশী' পরিভাষাটি এতই পরিচিত যে এর ভিত্তিতে তালের নামকরণ করা হয়েছে যেমন 'দশকোশী'। তালটি মধ্যগতিতে চৌদ্দ মাত্রা, চারটি তাল এবং দশটি নিঃশব্দ ক্রিয়া অর্থাৎ কোশী তাই ঐটি 'দশকোশী'। দ্রুতগতির তালে একটি 'তাল' অপর মাত্রা 'ফাঁক' মধ্যগতির তালে একটি তাল অপর তিনটি 'কোশী'—প্রথমটি বাইরের দিকে, দ্বিতীয়টি কোলের দিকে এবং তৃতীয়টি আবার বাইরের দিকে। 'কোশী' ক্রিয়াটি প্রাচীন দেশী ক্রিয়া 'বিসর্জিতা' ও 'বিক্ষিপ্তা'রই প্রয়োগবিশেষ। এ ক্রিয়াটির প্রদর্শনরীতি অন্য কোন তালপদ্ধতিতে দেখা যায় না। বিভিন্ন ক্রিয়ার মাধ্যমে তালের অংগগুলি প্রকাশ করে নানাবিধ তাল দেখানো হয়।

অতি প্রচলিত সাধারণ তালটি হ'ল বার মাত্রার লোফা, যার বৃন্দাবনে প্রচলিত অপর নাম জপতাল। দ্বিতীয় নামটির প্রয়োজনীয়তা এই যে 'লোফা' নামক তালটি পশ্চিমবঙ্গে বার মাত্রা হলেও পূর্ববঙ্গে এটি চৌদ্দ মাত্রা কিন্তু 'জপ' নামের রূপান্তর নাই। পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ অঞ্চল তালটিকে 'গড় খেমটা' বলে অভিহিত করা হয়। ব্যুৎপত্তিগত বিশ্লেষণে দেখা যায় 'গড়' অর্থে বনাঞ্চল এবং 'খেমটা' অর্থে নাচের একটি ছন্দ। উভয়ের সংমিশ্রণ থাকায় স্বভাবতই অনুমান করা যায় যে আদিবাসীদের নৃত্য ছন্দের প্রকাশ এ তালটিতে আছে। কথাটি নিছক সত্য কারণ তালটি ত্রিমাত্রিক এবং ছন্দ অনুধাবনে নৃত্যের অনুপ্রেরণা জোগায়। চারটি বিভাগ ৩।৩।৩।৩। প্রথম এবং তৃতীয় বিভাগে তাল আর দ্বিতীয় এবং চতুর্থ বিভাগে ফাঁক। কেউ কেউ একতালাও বলে থাকেন। দক্ষিণাঞ্চলে প্রচলিত 'ডাকনাম' গানে কিঞ্চিৎ বিলম্বিত লয়ে প্রয়োগ করা হ'লে বলা হয় 'সুধাতরঙ্গিণী' আবার এরই মাতন পর্যায়ে বলা হয় 'জামাল'। খোল যন্ত্রটিতে এ তালটি বাজানো হয়। খোলে ব্যবহৃত বাণীগুলিতে অভিনবত্ব এই যে এ যন্ত্রে 'ক' বর্গের প্রথম চারটি বর্ণ, 'চ' বর্গের তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ণ, 'ট' বর্গের প্রথম ও তৃতীয় বর্ণ, 'ত' বর্গের পাঁচটি বর্ণ, তাছাড়া 'র', 'ং' ইত্যাদি বর্ণগুলির সংকলনে বোল সৃষ্টি হয়। প্রতি বর্গের দ্বিতীয় এবং চতুর্থ বর্ণ প্রস্বন অনুপাতে প্রথম এবং তৃতীয় বর্ণ অপেক্ষা জোড়ে বাজান হয়। এর মধ্যে 'চ' বর্গের বাণীগুলি অন্য কোন প্রচলিত আনদ্ধ যন্ত্রে ব্যবহৃত হয় না কিন্তু খোলে এ বাণীগুলিই বেশী ব্যবহার হয়। সেভাবে লোফা তালের মধ্যগতির লওয়াটি—জা গ জা। জা ঘে না। তা ক তা।

তা খে টা। বিলম্বিত গতির লওয়া—খে তাত্ ঝা। তা—গুরু। দি দা ধি। না তে টে। উপরের বোল দুটি থেকে স্পষ্টই দেখা যায় যে 'সমে' কোন প্রস্বনযুক্ত বাণী রাখা হয় নাই অর্থাৎ লঘু বাণীই রাখা হয়েছে। প্রস্বন আছে মধ্যগতির পঞ্চম মাত্রায় এবং বিলম্বিত গতির তৃতীয় এবং অষ্টম মাত্রা। এদিক থেকে ধামারের ঠেকায় সমে 'ক' বিষয়টির সমর্থন পাওয়া যায়। পূর্ববঙ্গে (বর্তমান বাংলাদেশ) এ তালের গতিই বেশ বিলম্বিত করে একতাল নামে গাওয়া হয়। সে তালের ঠেকার বোল ঝা খি দাঘি। তাগ দিন্দা দিন্দা। তা খি দাঘি। তাক তেরে খেটা। এরই দ্রুত প্রয়োগকে বলা হয় 'খয়রা' তাল। মনে হয় এ ছন্দটি প্রাচীন ত্রিমাত্রিক একতালেরই অনুকরণ এবং বরিশালের নটসম্প্রদায়ের মস্তিষ্ক-জাত। কীর্তনে প্রচলিত চতুর্মাত্রিক ছন্দের বার মাত্রার তালের নাম দোজ তাল—বিভাগ ৪।৪।৪ তিনটিই তালাঘাত। বার মাত্রা বিভাগের চৌতালের অনুরূপ অপর তালটির নাম পরিমাণ তাল। চারটি তাল এবং দুটি ফাঁক।

দুঠুকি একটি অতি প্রচলিত তাল যার অপর নাম নন্দন তালও অনেকে বলেন। তালটি চোদ্দ মাত্রা হলেও দুটি অর্ধ অনুরূপ। ছন্দ ৩।৪।৩।৪ প্রথম এবং চতুর্থ মাত্রায় তালাঘাত, অষ্টম এবং একাদশ মাত্রায় ফাঁক। ছন্দটি সর্বভারতীয়, খুবই পরিচিত। এটিতে উত্তর ভারতীয় চাচর, দীপচণ্ডী ইত্যাদি তালের মত ঝোঁক আছে। আবার মধ্যগতি হলে অবিকল তেওড়া বা দক্ষিণ ভারতীয় মিশ্রজাতির ত্রিপুট তালের মত হয়ে যায়। বিলম্বিত লয়ে এটিতে ধামারের চেহারাও কল্পনা করা যায়, কারণ এ তালের বোলটি হ'ল

+ ২ . ০ ০ .
ধি ধি ধি ধি—ধি—ধি তে টে তা — — গুরুর

ষষ্ঠ মাত্রায় প্রস্বন এবং সপ্তম মাত্রায় দম্। এ থেকে ধামারের ক ধে টে ধে টে ধা - অংশের সংগে মিলে যায়। দ্রুত, মধ্য ও বিলম্বিত তিন গতিতেই তালটির প্রয়োগ আছে। তিন ও চার ছন্দ যুগপৎ থাকাতে এটিকে মিশ্রজাতি বলে ধরা হয়। সব ধরনের কীর্তনেই এ তালটির প্রচলন আছে কিন্তু মনোহরসাই কীর্তনে এটির আধিক্য আছে। মুর্শিদাবাদ জেলার শক্তিপুরের অবধৌত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের দুঠুকির বিন্যাস ছিল অত্যুত্তম যদিও মইনটির বা মণিহাটির দুঠুকি গান কীর্তনে প্রসিদ্ধ। তালটিকে উল্টে নিলে হয় ৪।৩।৪।৩ ছন্দ। একে বলা হয় একতালি। বৃন্দাবনের একতালি প্রসিদ্ধ। এ ছাড়া সূচক কীর্তনের সব প্রসিদ্ধ গানই একতালিতে গাওয়া হয়। এটিকে দক্ষিণ ভারতীয় মিশ্রজাতির একমু তালের সংগে তুলনা করা যায়॥ প্রতিটি তালাঘাতেই ছন্দটির সম্যক প্রকাশ বলেই মনে হয় একতালি নামকরণ করা হয়েছে। প্রবন্ধ সংগীতে একতালি নামে প্রবন্ধ আছে। সেটি অনেকের মতে অনিবন্ধ, তাই এ তালটির সূত্র সে প্রবন্ধে খুঁজে পাওয়া যায় না। সাধারণতঃ মধ্যগতির একতালিরই বেশী প্রয়োগ। তালের বোলটি

নিম্নরূপ…

+ · ০ ২ · ০
ঝা—তা—তা খি—তি—ঝা—দি দি দা

দশম মাত্রার 'ঝা' ও ষষ্ঠ মাত্রার 'খি'—এ' বাণী দুটিই তালটির নান্দনিক উৎকর্ষের কারণ। আবার দ্রুতগতির একটি তালকে ছোট একতালি বলা হয় যার অপর নাম ঝাতি। তালটিকে অনেকে সাতমাত্রা বলে থাকেন আবার অনেকে প্রয়োগ ক্ষেত্রে এটিতে ছয় মাত্রায় ঝোঁকও দেখিয়ে থাকেন। অবশ্য উভয় ক্ষেত্রের প্রতিটি মাত্রার স্থায়িত্বকাল প্রায় সেলাইকলের ছুঁচের গতির মত। যাঁরা সাতমাত্রা রক্ষা করেন তাঁরা অত্যন্ত সচেষ্টভাবে সচেতন থাকতে বাধ্য হন। আবার যাঁরা ছয় মাত্রা করেন তাঁদের সাবলীলতা বিশেষ লক্ষণীয়। বক্তব্য এই যে মাত্রার স্থায়িত্বকাল তত দ্রুত ধরা সমীচীন কিনা। তা ছাড়া প্রতিটি তালাঘাতের আশ্রয়ে গান, ছন্দ রক্ষার দায়িত্ব বাদকের, গানের কোন বন্দিস্ নাই। এক্ষেত্রে একতালির নামবৈশিষ্ট্য রক্ষা করে প্রতি তালে ছন্দ সৃষ্টি করা, সাবলীলভাবে ছয়, সাত, আট যে-কোন মাত্রায় ঝোঁক দিয়ে গানবিন্যাস করাই অনেকের মতে শ্রেয়। তালটির বহুল ব্যবহার। ঘটকালি, বিস্তার বা ব্যাখ্যা বেশীরভাগই হয় এ ঝোঁকটির আশ্রয়ে। এটি কঠিন হলে গানের সৌন্দর্য কমে যায়। পূর্ববঙ্গে প্রচলিত 'লোফা' নামক তালটিরও একই ঝোঁক অর্থাৎ বড় একতালির মত চৌদ্দ মাত্রাসম্পন্ন। অন্যান্য পদ্ধতির গানে ঝোঁকটি আছে কিন্তু একটি তালাঘাতেই ছন্দটি প্রকাশিত এমনটি দেখা যায় না। হিন্দুস্থানী পদ্ধতির একতাল বা পূর্ববঙ্গের একতালার থেকে তালটি সম্পূর্ণ পৃথক।

কীর্তনে ২।৩।২।৩ ছন্দের ঝাঁপতাল ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এ তালটি ধ্রুপদ, খ্যায়াল, সাদ্‌রা, লঘু ইত্যাদি সব অঙ্গেই ব্যবহার হয়। তাই এটিকে কীর্তনাঙ্গীয় তাল বলে গণ্য করা সমীচীন নয়।

তেওট নামে একটি তাল কীর্তনে বেশী প্রচলিত। তালটি চৌদ্দ মাত্রা, বিভাগ ২।২।২।২।২।২।২। তিনটি তাল—প্রথম সপ্তম এবং একাদশ মাত্রায়। ফাঁক চারটি—তৃতীয়, পঞ্চম, নবম এবং ত্রয়োদশ মাত্রায়। প্রথম ফাঁকটি দেখানো হয় কৃষ্যা ক্রিয়ার মত ডানদিকে হস্ত সম্প্রসারণ দ্বারা আর দ্বিতীয় ফাঁকটি দেখানো হয় সর্পিণী ক্রিয়ার মত বামদিকে হস্ত সম্প্রসারণ দ্বারা। নামটি থেকে অনুমান করা যায় যে তিনটি তালাঘাত সম্বলিত বলেই এটিকে তেওট বলা হয়। হিন্দুস্থানী পদ্ধতিতে একটি 'তেওট' নামে তাল আছে। সেটিও চৌদ্দ মাত্রা কিন্তু বিভাগ ভিন্ন হবার দরুণ পরস্পর তুলনা চলে না। তবে কীর্তনাঙ্গীয় তেওট তালের রূপ বোঝাবার ক্ষেত্রে বলা যায় যে তেওড়ার তালের মার্গ পরিবর্তন করে যদি চিত্র থেকে বার্তিক করা যায় অর্থাৎ সাত মাত্রার তেওড়াকে অতি বিলম্বিত করে যদি এক আবর্তে চৌদ্দ মাত্রা করা যায় তবে তা অবিকল কীর্তনাঙ্গীয় তেওট তাল হয়। তেওট তাল

মনোহরসাই ঘরানার অতি প্রিয় তাল হলেও গড়াণহাটি ঘরানার অনেক প্রসিদ্ধ গান তেওট তালে গাওয়া হয়। তালের ঠেকাটি দুই আবর্তে নিবন্ধ।

+ ০ ০ ২ ০ ৩ ০
ঝা খি ঝা খি—গুরুর ধেই তা গেদা ঘেনে তাক দাঘি নেত খেটা।
+ ০ ০ ২ ০ ৩ ০
তা—তা——গুরুর তাক তেটে তেটে খিখি তাক দাধে — দা ধেই।

কীর্তনাংগীয় তালের ঠেকাকে বলা হয় লওয়া। অনেকক্ষেত্রেই লওয়াগুলি হয় দুই আবর্তের, গুরু এবং লঘু, যথাক্রমে তবলার খুলি এবং মুদির মত। শোনা যায় মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের কাঁদি মহকুমায় পাঁচথুপি গ্রামের তেওট প্রসিদ্ধ। এ তালটি সম্পর্কে প্রাচীন ব্যক্তিদের অনেকে বলেন তৃতীয় তালে সম, অর্থাৎ যে তালটিতে সম দেখান হয়েছে সেটি তৃতীয় তাল। হিন্দুস্থানী সংগীতের ধারা অনুযায়ী কথাটি অযৌক্তিক মনে হয়। কারণ সম সর্বদাই প্রথম তালে হয়। এ বিষয়ে প্রাচীনদের মত অগ্রাহ্য করা যায় না, কারণ ঐ তালের অনেক ঘাত বাদ্য পাওয়া যায় যেগুলি বর্তমানের দ্বিতীয় তাল থেকে শুরু। তবে সাংগীতিক চরিত্রের সামঞ্জস্য রাখার জন্য সমকেই প্রথম তাল বলে গণ্য করা উচিত। অনুরূপ মত 'ধরা' তাল সম্পর্কে প্রচলিত আছে। এ তালটির চতুর্থ তালে সম। ধরা সম্পর্কে এবিষয় আলোচিত হবে।

অন্যান্য তালগুলির প্রচলিত রূপ অনুযায়ী বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে কতগুলি কেবল ছুটের সাহায্যে গঠিত, একটি কেবল জোড়া দ্বারা গঠিত এবং অপরগুলি গঠিত ছুট এবং জোড়ায় সমন্বয়ে। যেমন—

২ টি ছুটে—ডাঁস পাহিরা
৩ টি „ —দোজ
৪ টি „ —গঞ্জন, ধরা, বড় দাসপ্যারী
১ জোড়া—রূপক
১ টি জোড়া + ১ টি ছুট—আড়
১ টি „ + ২ টি „ —দশকোশী
১ টি জোড়া + ৩ টি „ —বীরবিক্রম
১ টি „ + ৪ টি „ —শশিশেখর

আবার এ তালগুলির সমন্বয়ও দেখা যায় কতকগুলি প্রচলিত তালে। যেমন—

১ টি আড় + ১ টি রূপক —বিষমপঞ্চম, খামসা
১ „ দশকোশী + ১ „ আড় —মহামণ্টক
১ „ রূপক + ১ „ দশকোশী—বিষমসমুদ্র
১ „ দশকোশী + ২ „ রূপক —ইন্দ্রভাস
১ „ আড় + ২ „ „ —মদনদোলা

এগুলি প্রচলিত রূপে। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রাচীন শাস্ত্রীয় রূপ থেকে পৃথক, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে একই।

ডাঁস পাহিড়া তালটি দাসপ্যারী বা আরও বিভিন্ন নামে পরিচিত। এর দুটি গঠন, একটি ছোট অপরটি বড়। ছোট দাসপ্যারী দুটি তালাঘাতে নিবন্ধ আট মাত্রার তাল। একটি তালাঘাতের পর তিনটি কোশী এমন দুই বার। ঠেকা নিম্নরূপ :

+ ০ ০ ০ ২ ০ ০ ০

ঝিনি তা তেটে তা খিউরর দাঘি নেদা গেদা।

বড় দাসপ্যারী চারটি তালে নিবন্ধ। একটি তালাঘাত তিনটি কোশী এমন চারবার। এদিক থেকে গঞ্জন তালের রূপের সঙ্গে বেশী পার্থক্য নেই, তবে গানের বিচারে পার্থক্য করা সম্ভব। ঠেকাটি নিম্নরূপ—

+ ০ ০ ০ ২ ০ ০ ০

ঝিনি দাঘি ঝিনি দা ঝিনি দাঘি নেতা খেটা

৩ ০ ০ ০ ৪ ০ ০ ০

তা উরর তেটে খেটা তা খে খে গুরর।

তালটি অতি প্রচলিত এবং ভক্তগণের অতি প্রিয় বলেই মনে হয় দাসপ্যারী নামকরণ করা হয়েছে। দেববিগ্রহের আরতিকালে যে খোল বাজানো হয় তা হয় দাসপ্যারীরই দ্রুতচলন চঞ্চুপুট তালে—

+ ০ ০ ০ ২ ০ ০ ০

ঝা দাঘি নেদা গেদা ঝা দাঘি নেতা খি।

তাছাড়া ধামালি নামে প্রচলিত যে তালটি আছে সেটিও দাসপ্যারীর অপভ্রংশ এবং আট মাত্রা সমন্বিত।

+ ০ ০ ০ ২ ০ ০ ০

ঝিনি দাঘি নাগ তা খি উরর ধি ধি।

তাছাড়া কাটা দাসপ্যারী ভাঙা ভাঙা ছন্দে বাজানো হয়। কথিত আছে কাঁথির দাসপ্যারী খুবই প্রসিদ্ধ। দাসপ্যারী তালের প্রচলিত রূপটি এই, কিন্তু প্রাচীন শাস্ত্রমতে এটি রুদ্র একাদশের সপ্তম তাল। এবং তালটির সংজ্ঞা নিম্নরূপ—

পঞ্চতালাৎ পরং শূন্যং ডাঁসপাহিড়া মুত্তমম্।
অত্যুর্ধ্বঞ্চ ভবেৎ ত্রস্তং সংগ্রামস্য যথা গতি ॥

পঞ্চতাল বলে যে তালটির পরিচয় পাওয়া যায় তাতে দুটি জোড়া এবং তার সঙ্গে মাত্রাগত মিল থাকলেও রূপগত কোন সামঞ্জস্য নাই। এক্ষেত্রে প্রচলিত রূপের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষাকল্পে 'পঞ্চতালাৎ পরং শূন্যং' কথাটির অর্থ করতে হয় যে পাঁচটি তালাঘাত থেকে শেষ তালাঘাতটি শূন্য অর্থাৎ বাদ। তাই চারটি

তালাঘাত বা ছুটের অস্তিত্ব রইল। অবশ্য এ সঙ্গীত নিতান্তই অনুমানভিত্তিক ও প্রচলিত রূপের সমর্থনে। কারণ অন্যত্র পাওয়া গেছে যে—

"একতালং পরং শূন্য ক্রমেনাপি ত্রিধাভবেৎ।
শেষ একতালং শূন্যং ডাঁসপাহিরা মুত্তমম্" ॥

তিনটি ছুটসম্পন্ন তাল 'দোজ'। যদিও এ তালের গান বেশী পাওয়া যায় না। বদসি অষ্টতালে এ তালটির প্রয়োগ আছে। তালটি মধ্যগতিতে বার মাত্রা, তিনটি তালাঘাত। প্রতিটি তালাঘাতের পর তিনটি করে কোশী। প্রাচীন শাস্ত্রের সূত্রানুযায়ী—

"একতালশ্চ শূন্যশ্চ—ক্রমেনাপি ত্রিধাভবেৎ—
শেষশূন্যং কলাভেদে দোজাখ্যাশ্চ ভবেৎ পৃথক ॥"

সূত্রটির সঙ্গে প্রচলিত রূপটির সঙ্গতি আছে। দ্রুতগতিতে বদসি অষ্টতালে ব্যবহৃত ঠেকা—

+ ০ ২ ০ ৩ ০
ধো গুরর ধোগগা তিৎঝা তিনিনাও তিনাও —

আবার মধ্যগতির ঠেকা অন্যরূপ—

+ ০ ০ ০ ২ ০ ০ ০
তা গুরুর দাখি নেদা গেদা তাউরর তাখি নেতা খেটা।
৩ ০ ০ ০
তা — খে খে।

হিন্দুস্থানী পদ্ধতির চৌতালের সঙ্গে মাত্রাগত মিল থাকলেও রূপগত পার্থক্য যথেষ্ট। চৌতালের সঙ্গে রূপগত মিল আছে পরিমল তালের।

গঞ্জন তালটি চারটি ছুটের, ষোল মাত্রা। একটি তালাঘাত ও তিনটি কোশী এমন চারটি অঙ্গবিশিষ্ট তালটি বদসি-অষ্টতালের পঞ্চম তাল। তালটি পূর্বে ছোট, মধ্য ও বড় এ তিনগতিতেই ব্যবহৃত হ'ত কিন্তু বর্তমানে এ তালের গান নাই বললেই চলে। বদসি-অষ্টতালের অন্তর্গত দ্রুত লয়ে ঠেকা :

+ ০ ২ ০ ৩ ০ ৪ ০
ধোগুরুর ধোগা তিৎঝা নাওগুরুর তিৎঝা তিনিতিনি নাও —

তালটির গঠন সম্পর্কে প্রাচীন সংজ্ঞা—

"একতালো ভবেচ্ছূন্টঃ ক্রমেনাপি চতুষ্টয়ম্।
শেষশূন্যং গঞ্জনশ্চ সর্বতো মুনিভাষিতম্ ॥"

প্রচলিত তালের রূপের সঙ্গে সূত্রটি মিলে যায়। চারটি ছুটের অপর তাল ধরা। মনোহরসাই ঘরাণার অতি প্রচলিত একটি বিশেষ তাল। ষোল মাত্রা সম্পন্ন। কেউ কেউ তালটিকে রুদ্র একাদশের 'ধরণ' তালের রূপ বলে গণ্য করতে চান কিন্তু প্রাচীন সূত্র—

"যুগ্মতালঞ্চ শূন্যঞ্চ একতালঞ্চ তৎপরে।
শেষৈকত্র ত্রিশূন্যঞ্চ বিষমং ধরণং ভবেদ॥"

রূপটি দাড়ায় ১ ২ ০ ৪ ০ ০ ০। তিনটি তালাঘাত একটি ফাঁক এবং তিনটি কোশী। তাই প্রচলিত ধরা তালের সংগে এর কোন মিল নাই। ধরা তালের ঠেকা চার তালে এবং আট তালে উভয় প্রকারই পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে তালাঘাতকে অনেক সময় চাপড় বলা হয় এবং গানগুলি সাধারণতঃ চব্বিশ চাপড়ে বা বিশ চাপড়ে পাওয়া যায়। অল্প কথা কয়টি, সুর এবং গমকে ভরা থাকে। চার তালের ঠেকাটি—

+ ০ ২ ০
ঝা — খি খি তা — তা —
৩ ০ ৪ ০
খি খি তা খি তা — গুরুর

প্রাচীনদের মতে তালটির চতুর্থ তালে সম অর্থাৎ 'খি খি তা খি'-র পরের 'ঝা'-টিতে সম। ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও তাই দেখা যায় কারণ গানটির মুখ ঘুরে এলেই মান অর্থাৎ তেহাই দেওয়া হয় যার শেষ ঝা-টি পরে চতুর্থ তালে। হিন্দুস্থানী তালশাস্ত্রবিদ্‌দের বিচারে হয়ত বিধিটি অসংগত মনে হবে। কিন্তু প্রচলিত বলেই কথাটি মেনে নিতে আপত্তি থাকা উচিত নয় কারণ কীর্তন পদ্ধতিতে অনেক অভিনবত্বই লক্ষ্য করা যায় যেগুলি সমষ্টিক বিচারে প্রমাদ বলে মনে হলেও নান্দনিক বা ভাবের যুক্তিতে অনেক উর্ধ্বে। এই ধরা তালেরই আবার একটি ভাঙা গতিকে 'কাটা-ধরা' নামে প্রচলন করেন কীর্তনীয়া রসিক দাস আজ থেকে ন্যূনপক্ষে দেড়শ বছর আগে। ঠেকাটি নিম্নরূপ—

+ ০ ০ ০ ২ ০ ০ ০
ধেৎ তেটে তেটে খিখি তাক্ ধে ইনা ধেই
৩ ০ ০ ০ ৪ ০ ০ ০
তেটে তেটে তেটে তেটে তা খি খি উর্র

তাল ক্ষেত্রে 'রূপক' নামটি খুবই পরিচিত। হিন্দুস্থানী পদ্ধতির রূপক সাত মাত্রা, বিভাগ ৩।২।২. তালাঘাত দুটি, প্রথম মাত্রায়ই ফাঁক। ফাঁক থেকে শুরু বলে এ তালটির ফাঁককেই সম বলে গণ্য করা হয়। আবার একপ্রকার 'রূপকম্' তাল প্রচলিত আছে কর্ণাটক পদ্ধতিতে যার রূপ দ্রুতর পরে লঘু, তাই জাতি অনুপাতে তালটি ৫, ৪, ৭, ৯ এবং ১১ মাত্রা পর্যন্ত হয়ে থাকে। কীর্তনে প্রচলিত রূপক তালটি তিন, ছয় বা বার মাত্রা। কেবলমাত্র একটি জোড়া বা যুগ্ম তালি। প্রয়োগক্ষেত্রে অবশ্য তালটির দুটি আবর্ত নিয়েই ব্যবহৃত হয়। বড়, মধ্য এবং ছোট তিন প্রকারেই ব্যবহার আছে। বড় রূপকের ক্ষেত্রেও অনেকে বলতেন জোড়ার শেষ তাল অর্থাৎ পঞ্চম মাত্রায় সম দিতে। এ সিদ্ধান্তটি প্রাচীন তালশাস্ত্রের অধিকাবর্তন

রীতিসম্মত। তালটি বদাস-অষ্টতালের সপ্তম তাল। ঐ গানে প্রয়োগের সময় দ্রুতলয়ে যে নির্ধারিত ঠেকাটি বাজে সেটি নিম্নরূপ—

+ ০ ২ ০ ০ ০ + ০ ২ ০ ০ ০

ঝা গুরু ঝা তেনা তেনা থিনি তা গুরুর তা- তেনা তেনা থিনি

প্রাচীন শাস্ত্রে তালটির যে সংজ্ঞা পাওয়া যায় সেটি নিম্নরূপ—

"প্রথমং যুগলং তালং তৎপরস্ত্বেকশূন্যকম্।
শেষে চ যুগলং তাল রূপকং পরিকীর্ত্তিত॥"

অর্থ দাড়ায় যে পর পর দুটি জোড়ার ব্যবহার হবে এবং প্রচলিত নিয়মের সঙ্গে মিলে যায়। অবশ্য পূর্ববঙ্গে প্রচলিত এক প্রকার রূপক আছে যেটি সাত মাত্রা এবং অনেকটা ছোট দশকোশীর মত। রবীন্দ্রসৃষ্ট ষষ্ঠী তালে কীর্তনাঙ্গীয় রূপক তালেয় অনুকরণ দৃষ্ট হয়।

জোড়া এবং ছুটের সমন্বয়ে সৃষ্ট তালগুলির মধ্যে ক্ষুদ্রতমই হ'ল 'আড়' তাল। তালটি দ্রুতগতিতে পাঁচ মাত্রা, মধ্যগতিতে দশ এবং বিলম্বিত গতিতে কুড়ি মাত্রা। একটি ছুট এবং একটি জোড়ার সমন্বয় তিনটি তালাঘাতবিশিষ্ট এ তালটি কীর্তনের কয়েকটি গানে এখনও ব্যবহৃত হয়। তালটি হিন্দুস্থানী পদ্ধতির সুর ফাঁক বা সুল তালের অনুরূপ। বদাস অষ্টতালের প্রথম তাল এবং ঐ গানে ব্যবহৃত দ্রুত লয়ের ঠেকাটি নিম্নরূপ—

+ ০ ২ ৩ ০

ধো — দিত্তা ধোগা তি —।

মধ্যগতিতে ঝা তাখি নেতা খেটা বোল দিয়ে এবং বড় গতিতে 'ঝাখি' ঠেকা দিয়ে বাজান হয়। তালটির প্রাচীন সূত্র—

"একতালস্তথা শূন্যং যুগলং তালিকাপরে।
সংগীত প্রথমঃ সার আড় তাল প্রকীর্ত্তিতঃ॥"

সূত্রানুযায়ী প্রথমে একটি তাল এবং পরে একটি জোড়া এবং এটিই প্রচলিত রূপ।

দশকোশী তালটির নাম কীর্তনের কঠিন তাল বলে সবার পরিচিত। তালটি দ্রুতগতিতে সাত মাত্রা ছোট দশকোশী নামে পরিচিত, মধ্যগতিতে চৌদ্দ মাত্রা মধ্যম দশকোশী নামে পরিচিত এবং বিলম্বিত গতিতে আটাশ মাত্রা বড় দশকোশী নামে পরিচিত। তালটির চারটি অঙ্গ—দু'টি ছুটের পর একটি জোড়া। সাত মাত্রার বিভাগ ২।২।১।২, চৌদ্দ মাত্রার বিভাগ ৪।৪।২।৪, এবং আঠাশ মাত্রার বিভাগ ৮।৮।৪।৮। হিন্দুস্থানী পদ্ধতির আড়া চৌতালের সঙ্গে তালটির রূপগত সামঞ্জস্য আছে। ছোট দশকোশীতে ব্যবহৃত বোল—

+ ০ ২ ০ ৩ ৪

ঝা — — ঝি নাগঝিনি ঝা — — ঝি নাগঝিনি ঝা-গুরের জাঘিনাক

০ + ০ ২ ০ ৩
তেটে তেটে তা — — থি নাকথিনি তা — — থি নাকথিনি তাগুরুর
৪ ০
তাত্‌তা খেখে।

লঘু এবং গুরু দুই আবর্তে ঠেকা বাজান হয়। গানগুলি সাধারণত জোড়া থেকে শুরু হয়। স্থানভেদে তালটির বিভিন্ন নাম আছে; যেমন, মেদিনীপুর অঞ্চলে বলা হয় 'সন্নিকাটা তাল', দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার লাট অঞ্চলে বলা হয় 'ছুটা তাল।' দশকোশী তালটি গড়াণহাটি ঘরানার তাল, কারণ প্রসিদ্ধ গড়াণহাটি গানের অনেকগুলিই এই তালের। মধ্যম দশকোশীর তিন, চার, পাঁচ ইত্যাদি অনেক আবর্তে গানের বন্দিস্ পাওয়া যায়। মধ্যম দশকোশীর ঠেকা—

+	০	০	০	২	০	০	০
ঝা	তাখি	নেতা	খেটা	তা	তাখি	নেতা	খেটা
৩	০	৪	০	০	০		
তা	উরর	তাত	তা	খিখি	তাখি		
+	০	০	০	২	০	০	০
ধেনা	দিধি	নেদা	ধেনে	ধেনা	দিধি	নেদা	ধেনে
৩	০	৪	০	০	০		
ঝা	উরর	জাঘি	নাক	তেটে	তেটে।		

বড় দশকোশীর গান খুবই ধীর প্রকৃতির, মাত্রাও বিলম্বিত। গৌরচন্দ্রিকার গান ছাড়াও অনেক প্রসিদ্ধ গান আছে, যেমন—'বিকচ সরোজ', 'কাচা কাঞ্চন', 'গোরা বড় পতিতপাবন', 'কালিয়াদমন', 'জয়রে জয়রে গোরা' ইত্যাদি। গড়াণহাটি ঘরানায় এ গানগুলি অনেকই এখন লুপ্তপ্রায়।

তালটির ঠেকা—

+	.	০	.	০	.	০	.
ঝাখি	ঝাখি	ঝাখি	ঝা	ঝাখি	ঝাখি	ঝাখি	ঝাগুরু
২	.	০	.	০	.	০	.
ঝাখি	তা	তাত্‌	তা	তাত্‌	তা	খিখি	তাখি
৩	.	০	.				
ঝাঝা	ঝাঝা	গুরর	—				
৪	.	০	.	০	০	০	.
ঝাখি	তা	তাত্‌	তা	তাত্‌	তা	খিখি	তাখি

দশকোশী তালের নানাবিধ ব্যবহার আছে যেমন ভাংগা ভাংগা ছন্দে ব্যবহৃত হ'লে বলা হয় কাটা দশকোশী, আবার আড় ছন্দে ব্যবহৃত হলে বলা হয় বিরাম দশকোশী, তা ছাড়া গৌরচন্দ্রিকার পদের শেষ চরণটি দশকোশী তালাশ্রিত করে

বার বার গাওয়া হয়। এক্ষেত্রে নানাবিধ বাদ্য ব্যবহৃত হয় যা'কে বলা হয় **মাথট** বা **কাটালোম**। এগুলি সবই মধ্যগতির। বড় দশকোশীর একটি বিশেষ ছন্দ প্রাচীন কালে ব্যবহৃত হ'ত বলা হত **'ঝুমড়া'**। বিভিন্ন নাম সম্বলিত আঠার কাটানের বোল অথবা আঠাশ কাটানের বোল ব্যবহৃত হত। এগুলির নাম ছিল শ্রুতি, পোট, মণ্টক, প্রতিমণ্টক, পাকছটা ইত্যাদি। কেবল নির্দিষ্ট কয়েকটি গানে এ ছন্দটি ব্যবহৃত হ'ত। এটির ব্যবহারে ডমরু যতির রূপ পাওয়া যায়, দশকোশী তালটি রুদ্রতালান্তর্গত নবম তাল। তালটির প্রাচীন সূত্র—

"একতালমেকশূন্যমিত্যবঞ্চ ভবেৎ ক্রমাৎ।
বিরাম একতালঞ্চ বাগ্‌ভেদে দশকোষিকা ॥"

অনেকে বলেন তালটির অপর নাম কন্দর্পতাল, কিন্তু রুদ্র একাদশ অন্তর্গত ষষ্ঠতালটির নাম কন্দর্প বলে পাওয়া যায়। এটির সূত্র—

"সমতালং যথা দৃষ্টং তথা কন্দর্প সংজ্ঞিতম্।
সমতালে ভবেৎ শূন্যং কন্দর্পে নাস্তি তৎপুনঃ ॥"

এ বিচারে সমতাল এবং কন্দর্পতাল একই, কেবলমাত্র সমতালে যে তালের পর শূন্য বা ফাঁক থাকে কন্দর্পে তা থাকবে না। অর্থাৎ সমতাল যদি মধ্যগতির হয় তবে কন্দর্প হবে দ্রুতগতির তাল। অবশ্য সম, যতি বা যোতসোম দশকোশী তালেরই রূপবিশেষ বলে পরিচিত। অতীত গ্রহ হলে অর্থাৎ প্রথম তালের পর গান শুরু হলে দশকোশী বলা হয়, দ্বিতীয় তালের পর গান শুরু হলে হয় যতি বা যোতসোম, আবার অনাগত গ্রহ হলে অর্থাৎ চতুর্থ তালের পর গান শুরু হলে বলা হয় সমতাল। গানের ধরনভেদে তালের নামান্তর হয়—কীর্তনাঙ্গীয় এ তালটির এটি একটি অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য। অনুরূপ ব্যবহার অবশ্য দেখা যায় **বিষম পঞ্চম** এবং **খামসা** তালের সম্পর্কে। অবশ্য এ নামান্তর যুক্তিটি না মেনে পৃথক তাল বলেই গণ্য করা উচিত কারণ যতি তাল বর্দাস অষ্টতালের তৃতীয় তাল। এটির সূত্র—

"প্রথমং যুগলং তালং একএকস্তথা পরে।
কলাভেদে গান ভেদং যতিস্ত পরিকীর্ত্তিতম্ ॥"

প্রথমে জোড়া এবং পরে দু'টি তাল—এই হ'ল তালটির রূপ। আবার সমতাল অষ্টতালের অষ্টম তাল সূত্রটি হ'ল—

"একতালং তথা শূন্যং ক্রমেণ ত্রিবিধং ভবেৎ।
শেষ যুগল তালঞ্চ সমতালং ভবেত পরম্ ॥"

এ সূত্র অনুযায়ী দু'টি ছুটের পর একটি জোড়া। উভয় ক্ষেত্রেই প্রচলিত রূপের সঙ্গে সঙ্গতি আছে। অষ্টতালে ব্যবহৃত তালটির ঠেকা—

+ ২ ০ ৩ ০ ৪ ০
যতি—ধো ধো তাত্‌ধো দেতাখেটা তা গুররধোগা তিনি নাও তিনাও—

+ ০ ২ ০ ৩ ৪
সম— ধোখেটা তাহুধো দেতাখেটা ঘেনাতিনি দাঘিনেতা ঘেনাওউরর
০
তেনাতিৎ

এগুলি দ্রুতলয়, অবশ্য বিলম্বিতলয়ে সাধারণতঃ 'ঝাখি' ঠেকাই বাজান হয়। এ তিনটি তালই প্রাচীন কীর্তনীয়াদের অতি পরিচিত এবং গৌরচন্দ্রিকার শুরুতেই এ তালগুলি ব্যবহার করা হয়। তবে বীরভূম জেলার ময়নাডালের দশকোশী প্রসিদ্ধ বলে জানা যায়।

বীরবিক্রম তালটি ছোট—নয়মাত্রা, মধ্য—আঠার মাত্রা, বড়—ছত্রিশ মাত্রা। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তালটির প্রথমে তিনটি ছুট তারপরে একটি জোড়া। এ তালটির অনুরূপ রবীন্দ্রসৃষ্ট নবপঞ্চ তাল। বীরবিক্রমের নানাবিধ গান প্রচলিত আছে। বদাস অষ্টতালের পরে 'স্ফুরদধর সীধবে'—চরণটি দ্রুতগতির বীরবিক্রম তালে গাওয়া হয়। এ তালটি রুদ্রতালান্তর্গত প্রথম তাল। এটির সূত্র—

"একতালং তথা শূন্যং ক্রমেণ ত্রিবিধং ভবেৎ।
তৎপরং যুগলং তাল মিত্যেবং বীরবিক্রম ॥"

প্রচলিত আকৃতির সঙ্গে সূত্রটি মিলে যায়। **শশিশেখর** তালটি দ্রুতগতি—এগার মাত্রা, মধ্যগতি - বাইশ মাত্রা, এবং বিলম্বিত গতি—চুয়াল্লিশ মাত্রা। ছয়টি তালাঘাতসম্পন্ন তালটিতে প্রথম দুটি ছুট, পরে একটি জোড়া আবার দুটি ছুট। এটি অষ্টতালের চতুর্থ তাল, অপর নাম **চন্দ্রশেখর**।

তালটির সংজ্ঞা—

"চন্দ্রশ্চন্দ্রতথা যুগ্মং তথাচন্দ্রস্তথাপরে।
একতালানি ভবন্ত্যেবং চন্দ্রশেখর ভাষিতম্ ॥"

'চন্দ্র' অর্থে এক, তাই সূত্রানুযায়ী পরপর দুটি ছুট, জোড়া এবং দুটি ছুট—রূপটি প্রচলিত শশিশেখর তালের রূপের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিলে যায়। অষ্টতালে ব্যবহৃত দ্রুতলয়ে তালটির ঠেকা—

+ ০ ২ ০ ৩ ৪ ০
ধো দিত্তা গুররধো দিত্তা ধোধো তাধো দেতাখেটা
৫ ০ ৬ ০
তাগুরধোগা তিনিনাও তিনি —

এ তালের কিছু কিছু গান এখনও প্রচলিত আছে। যেমন বড় শশিশেখরে—"জাগহু বৃষভানু নন্দিনী", "বড়ই মানা করগো" ইত্যাদি এবং মধ্যম শশিশেখরে "কেমনে তোমারসনে পীরিতি করিব হে" ইত্যাদি।

বিষম পঞ্চম বলে যে তালটির উল্লেখ পাওয়া যায় তার অপর নাম **পঞ্চতাল**।

অবশ্য গানের ধরনভেদে তালটির অপর নাম 'খামসা'। এ নামটি অনেক পরবর্তীকালের, কারণ নামটি পারস্য ভাষা প্রভাবিত। বিষম পঞ্চম তালটি দ্রুত-গতি আট মাত্রা, মধ্যগতি ষোল মাত্রা, বিলম্বিতগতি বত্রিশ মাত্রা। তালাঘাত পাঁচটি বলেই বোধ হয় তালটিকে পঞ্চতাল বা বিষম পঞ্চম তাল বলা হয়। তালটি একটি জোড়া, একটি ছুট, আবার একটি জোড়া দ্বারা গঠিত। বদসি অষ্টতালের ষষ্ঠ তাল। দ্রুতগতিতে এ পর্যায়ে ব্যবহৃত ঠেকাটি নিম্নরূপ—

+ ২ ০ ৩ ০ ৪ ৫ ০

ধোধো তাতাধো দেতাখেটা ধো দিৎতা ধোগা তি —

এ তালের গান এখনও কিছু প্রচলিত আছে। খামসা তালের "কোথায় আছিল গোরা এমন সুন্দর", বিষম পঞ্চমতালের "না কর এতেক চাতুরালি" ইত্যাদি পদ প্রসিদ্ধ। তালটির প্রাচীন সূত্র—

"প্রথমং যুগলন্বেক তথাপরং তালমেককং।
শেষে যুগ্মং তথা শূন্যং পঞ্চতালং প্রকীর্তিতং॥"

সূত্রটি প্রচলিত রূপটির সঙ্গে মিলে যায়। **মহামণ্টক তালটি** মধ্যগতি—চব্বিশ এবং বিলম্বিত গতি—আটচল্লিশ মাত্রা। তালাঘাত সাতটি—প্রথম দুটি ছুট, একটি জোড়া, একটি ছুট এবং সর্বশেষে একটি জোড়া। এ তালটি খুব প্রাচীন নয় তবে এটি রুদ্রতালান্তর্গত পঞ্চম তাল 'মণ্ডুক'-এর মতো বলে অনেকে অনুমান করেন কিন্তু 'মণ্ডুক' তালটি ছয় মাত্রা হলেও এটির রূপ সম্পূর্ণ পৃথক। 'মণ্ডুক' তালের প্রাচীন সূত্র—

"প্রথমং একতালশ্চ তৎপরং শূন্যমেককং।
শেষৈকত্র ত্রিতালশ্চ মণ্ডুকস্যগতির্যথা॥"

অর্থাৎ তালের রূপটি হল ১ ০ ২ ৩ ৪ ০।

বিষম সমুদ্র তালটি অপ্রচলিত বলেই মনে হয়, তবে ইদানীং দু'একটি গান প্রচলিত হওয়ায় প্রচলিত তালপর্যায়ে আলোচিত হল। তালটি অতি প্রাচীন এবং এটি রুদ্র পর্যায়ের দ্বিতীয় তাল। প্রাচীন সূত্র—

"যুগ্ম তালং তথা শূন্যং তৎপরং দ্বয় তালকম্।
শেষে চ যুগলং তালং সমুদ্র বিষমং স্মৃতম্॥"

সূত্রানুযায়ী প্রথমে জোড়া, পরে দুটি ছুট, তারপরে আবার জোড়া অর্থাৎ তালের রূপটি হল—১ ২ ০ ৩ ০ ৪ ০ ৫ ৬ ০ অর্থাৎ দ্রুতগতিতে দশ মাত্রা, মধ্যগতিতে কুড়ি মাত্রা এবং বিলম্বিতগতিতে চল্লিশ মাত্রা। প্রাচীন সূত্রে পাওয়া তালটির মধ্যগতির ঠেকা—

+ ০ ২ ০ ০ ০ ৩ ০ ০ ০

থেনা খিউরর থেনা তাতা খি উরর ধেই তা গেদা ঘেনে

৪ ০ ০ ০ ৫ ০ ৬ ০ ০ ০

তাক দাঘি নেতা খেটা তা উরর তাত্ তা খিখি তাখি।

ইন্দ্রভাষ একটি মিশ্রতাল। তালটি ছাব্বিশ মাত্রা (মধ্যগতিতে)। তালাঘাত আটটি। দুটি ছুট এবং পর-পর তিনটি জোড়া। প্রচলিত একটি গান পাওয়া যায়—'কোথা যাওগো গোয়ালিনী'। তালটির প্রচলিত ঠেকা—

\+ ০ ০ ০ ২ ০ ০ ০

ঝা তাখি নেতা খেটা তা তাখি নেতা খেটা

৩ ০ ৪ ০ ০ ০

তা উরর তাত্ তা খিখি তাখি

৫ ০ ৬ ০ ০ ০

ঝেনা দাঘি তাক দাধে ইদা ধেই

৭ ০ ৮ ০ ০ ০

ঝা উরর তাত্ তা খিখি তাখি।

তালটি ইন্দ্রতাল গুচ্ছের ষষ্ঠতাল। প্রাচীন সূত্র নিম্নরূপ—

"সবিরামং চতুস্তালং ত্রিতালং শূন্যমস্ততঃ।
মেঘারম্ভে যথা কেকা হয়স্তে ইন্দ্রভাবিতঃ॥"

সূত্রানুযায়ী তালাঘাত হয় সাতটি। প্রচলিত রূপের সঙ্গে সংগতি নাই। তাই মনে হয় তালটির প্রাচীন নাম রক্ষা করে কোন শিল্পী নতুন রূপ দিয়েছেন। কেউ কেউ বলেন আখরিয়া হরিদাস এ ধরণের কিছু তাল সৃষ্টি করেছিলেন। আবার কারও মতে সুজন মল্লিক নামক একজন প্রাচীন গায়ক নানাবিধ মিশ্রতাল ব্যবহার করে গান করতেন। এ তালটিও তারই সৃষ্টি। অবশ্য সূত্র বিচারে দেখা যায় গানটি রসিকদাসের পিতা অনুরাগী দাসের আমলেও প্রচলিত ছিল। সুজন মল্লিক তাঁর পরবর্তী গায়ক, তাই তালটি প্রাচীন এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

মদনদোলা তালটি বর্তমানে প্রায় অপ্রচলিত। একমাত্র 'মধুকররঞ্জিত' পদটিকেই এ তালে গাইতে শোনা যায়। তালটি বাইশ মাত্রা, ৭টি তালাঘাত। প্রথমে একটি জোড়া, একটি ছুট, আবার দুটি জোড়া অর্থাৎ প্রথমে রূপক, পরে আড় এবং পরে আরেকটি রূপক। তালের রূপটি দাঁড়ায় ১০২০০০৩০০ ০৪০৫০০০৬০৭০০০। কোন কোন মতে পূর্বোক্ত তৃতীয় তালটিই সম এবং প্রথম তাল। সে হিসাবে প্রাচীন সূত্রে পাওয়া ঠেকাটি নিম্নরূপ—

\+ ০ ০ ০ ২ ০ ৩ ০ ০ ০

ঝাগি দাধে ইদা ধেই ঝা গুররর জাবি নাক তেটে তেটে

৪ ০ ৫ ০ ০ ০

ঝা গুরর ঝা তেটে তেটে খেটা

৬ ০ ৭ ০ ০ ০
তা গুরুর তাক তেটে কেটে খেটা।

তালটি অবশ্য ইন্দ্রষষ্ঠী গুচ্ছতালের তৃতীয় তাল। এটির প্রাচীন সূত্র—

"প্রথমেক যুগ্মতালং তৎপশ্চাদেকশূন্যকং বিরামে
শেষে ত্রিত্রয়তালং ভবেতীতি মদনদোলা ॥"

সূত্রটি প্রচলিত রূপের সঙ্গে অসমঞ্জস বলে মনে হয়। প্রাচীন নামানুসারেই মনে হয় পরবর্তীকালে এই প্রচলিত রূপটি সৃষ্টি হয়েছে।

প্রচলিত, অল্প প্রচলিত তালগুলি সম্বন্ধে আলোচনা হ'ল কিন্তু এ ছাড়াও কিছু তাল কীর্তনাঙ্গে প্রচলিত ছিল যা বর্তমানে অপ্রচলিত। যে গুচ্ছতাল-গুলির সূত্র ধরে ঐ তালগুলির পরিচয় পাওয়া যায় সেই গুচ্ছে আরও কিছু তাল আছে যেগুলি নিম্নোক্ত তালিকা থেকে স্পষ্টই বোঝা যাবে।

(ক) অষ্টতাল : সামগ্রিকভাবে পূর্বে আলোচিত—

(খ) রুদ্রতাল : এগারটি তালের সমন্বয়—

১। বীরবিক্রম (আলোচিত) ২। বিষম সমুদ্র (আলোচিত) ৩। ধরণ (আলোচিত) ৪। বীরদশক, ৫। মণ্ডুক (আলোচিত) ৬। কন্দর্প (আলোচিত) ৭। ডাঁস পাহিড়া (আলোচিত) ৮। ধ্রুবচরণ, ৯। দশকোশী (আলোচিত) ১০। গজেন্দ্রগুরু, ১১। ছুট্‌কা।

বীরদশক তালের রূপ—

"একস্তালং তথা শূন্যং ক্রমেণাপি ত্রিধাভবেৎ।
যুগলং যুগলং পশ্চাৎ স বীরদশকঃ স্মৃতঃ ॥"

অর্থাৎ রূপটি হল ১ ০ ২ ০ ৩ ০ ৪ ৫ ০ ৭ ৮ ০।

ধ্রুবচরণ তালটি সংজ্ঞানুযায়ী আট মাত্রা ধরা যায়। প্রাচীন সূত্রটি নিম্নরূপ—

"একতালং তথা শূন্যং ক্রমেণাপি দ্বিধা ভবেৎ।
শেষৈকত্র ত্রিতালঞ্চ ধ্রুবচরণ ভাষিতম্ ॥"

অর্থাৎ রূপটি হ'ল ১ ০ ২ ০ ৩ ৪ ৫ ০।

গজেন্দ্রগুরু তালটির রূপ নয় মাত্রা। প্রাচীন সূত্র—

"যুগলং যুগলং পশ্চাৎ তদন্তে একতালকম্।
শেষে চ যুগ্ম শূন্যঞ্চ গজেন্দ্রগুরু ভাষিতম্ ॥"

তাই রূপটি দাঁড়ায় ১ ২ ০ ৩ ৪ ০ ৫ ০ ০।

ছুট্‌কা তালটি রুদ্র একাদশের শেষতাল। তালটির সূত্র—

"যুগ্মশূন্যং বিরামে চ একতালং ভবেৎক্রমে।
ছুটকাখ্যানকং ধীর সঙ্গীত পরিনিষ্ঠিতম্ ॥"

সংজ্ঞাটি বিশ্লেষণে ছয়মাত্রা বোঝা যায় এবং রূপটি হয় ১ ২ ০ ০ ৩ ০। 'যুগ্ম'

অর্থে জোড়া, 'শূন্য' অর্থে একটি ফাঁক 'বিরাম' অর্থে অপর ফাঁক। তাই উপরোক্ত রূপটি পাওয়া যায়। উপরোক্ত তাল কয়টির প্রচলনকাল স্পষ্ট না জানা গেলেও প্রচলন ছিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

(গ) ব্রহ্মতাল—৪টি তালের সমন্বয় (পূর্বে আলোচিত হয়নি)। তাল চারটি নিম্নরূপ—

১। ব্রহ্ম, ২। বিরাম ব্রহ্ম, ৩। ষট্‌কলা, ৪। সপ্তমাত্রা।

ব্রহ্মতাল নামে একটি তাল হিন্দুস্থানী পদ্ধতিতেও প্রচলিত আছে। সেটির মাত্রা চৌদ্দ এবং তালাঘাত দশটি। প্রথমে একটি তাল একটি ফাঁক, দু'টি তাল একটি ফাঁক, তিনটি তাল একটি ফাঁক এবং চারটি তাল একটি ফাঁক। কিন্তু কীর্তনাঙ্গীয় প্রাচীন ব্রহ্ম চতুষ্টয়ের সঙ্গে এর কোন মিল নেই। প্রথম তালটি ব্রহ্ম যার প্রাচীন সূত্র নিম্নরূপ—

"বিরামশ্চদ্রুতং প্রথমৈকতালং কিঞ্চিদ্বিরামে পুনরেকতালম্।
ব্রহ্মস্য তালশ্চ সঙ্গীত মধ্যে যথা কপোতীহি করোতি শব্দম্॥"

তালটির এ সূত্রটি থেকে একটি অভিনব বিষয় উদ্ভব হ'ল। 'কিঞ্চিদ্বিরাম'—শব্দটির অর্থ নিয়ে। বিরামের একটি স্থায়িত্বকাল মানা যায় কিন্তু 'কিঞ্চিৎ' শব্দটিতে স্থায়িত্বকালের কোন নির্দিষ্টতা পাওয়া যায় না। এর দ্বারা বুঝা যায় কিঞ্চিৎ কাল নির্দিষ্ট করা হবে গানের সুরের গতিতে। এ ক্ষেত্রে বিরামের কোন নির্দিষ্ট সময় নাই বলেই মনে হয়। প্রাচীনকালের বাদকদের অবশ্য সাথ সঙ্গতে সুরের স্থায়িত্ব বিচার করে খোলে আঘাত দিতে দেখা যায়। এক্ষেত্রে লয়ভ্রষ্ট অপরাধ দেখা দিলেও প্রারম্ভিক ক্ষেত্রে সেবাকার্য বলেই ধরা যায় এবং একে একটি নান্দনিক বৈশিষ্ট্য বলেও ধরা উচিত। দ্বিতীয় তাল **বিরামব্রহ্ম**। প্রাচীন সূত্র—

"যুগ্মতালং ভবেদদ্রুতং একত লঘু তৎপরে।
শেষে দ্বিতীয় শূন্যে চ বিরাম ব্রহ্ম তালকম্॥"

রূপটি দাঁড়ায় ১ ২ ০ ৩ ০ ০ অর্থাৎ ছয় মাত্রা। রূপান্তর করে নিলে তিস্র জাতির ঝম্পা তালের রূপ পাওয়া যায়। **ষট্‌কলা** তালটি সাত মাত্রা। প্রাচীন সূত্র—

"প্রথমশ্চৈক তালশ্চ যুগ্মশূন্যং তথা পরে।
শেষৈকত্র ত্রিতালৌতি ষট্‌কলা খলুকথ্যতে॥"

রূপটি হ'ল ১ ০ ০ ২ ৩ ৪ ০।

সপ্ত মাত্রা তালটি দশ মাত্রা। প্রাচীন রূপটি—

"আদৌ যুগ্ম তথা যুগ্মং ত্রিতালশ্চ তথাপরে।
সপ্ত মাত্রা ভবেত্তোষা ব্রহ্মতালান্তরে শুভে॥"

অর্থাৎ রূপটি হল—১ ২ ০ ৩ ৪ ০ ৫ ৬ ৭ ০। এসব তালের প্রচলন

বর্তমানে নাই।

(ঘ) ইন্দ্রতাল : ছয়টি তালের সমন্বয়—

১। দেবসার, ২। দেবচালী, ৩। মদনদোলা (আলোচিত),
৪। গরুগন্ধর্ব, ৫। পাঞ্চালী, ৬। ইন্দ্রভাব (আলোচিত)

'দেবসার' তালটি দশ মাত্রার। সংজ্ঞাটি নিম্নরূপ—

"সবিরামং ত্রিতালঞ্চ এক শূন্যং স্তথাপরে।
শেষে দ্রুতং ত্রিতালশ্চ দেবসার ইতির্যতে॥"

রূপটি হ'ল ১ ০ ২ ০ ৩ ০ ৪ ৫ ৬ ০।

'দেবচালী' তালটি সাত মাত্রা। প্রাচীন রূপ—

"শূন্যং বিরামে ভবতিত্যঞ্চ ত্রিতালানি।
শেষেণ দ্বিশূন্য-মিত্যেবং দেবচালী॥"

অর্থাৎ ফাঁক সমন্বিত দুটি তালের পর তৃতীয় তাল এবং সর্বশেষ দুটি ফাঁক। রূপটি হয়—১ ০ ২ ০ ৩ ০ ০। রূপগত বিশ্লেষণে তেওট তালের দ্রুতগতি অর্থাৎ **'তিওট'** তালের অনুরূপ হয়। যার ঠেকা নিম্নরূপ—

২ ০ ৩ ০ + ০ ০
ঝিনি দাঘি নেতা খেটা তা তা —
২ ০ ৩ ০ + ০ ০
তা তাখি নেতা খেটা ধি ধি —

'গরুগন্ধর্ব' এবং **পাঞ্চালী**—উভয় তালই পাঁচটি তালাঘাতযুক্ত, কেবলমাত্র গতির ভেদ। উভয় তালই দ্রুতগতিসম্পন্ন হলেও 'গরুগন্ধর্ব' অপেক্ষা পাঞ্চালী দ্রুততর। নিম্নোক্ত প্রাচীন সূত্র থেকে তাই বোঝা যাবে—

"একতালং সমারভ্য পঞ্চতালং ভবেৎ তথা।
অত্যুর্দ্ধঞ্চ তথা এস্তং গরুগন্ধর্ব ঈরিতিঃ॥
শ্রাবণস্য যথা ধারাস্তথা তালো ভবেদ্ধীনাঃ।
পঞ্চতালান্তরাগীতি গরুগন্ধর্ব প্রকীর্ত্তিতা॥"

(ঙ) চতুর্দশতাল : চৌদ্দটি তালের সমন্বয়।

১। চিহ্ন, ২। চন্দ্রমাত্রা, ৩। দেবমাত্রা, ৪। অর্দ্ধজ্যোতিকা, ৫। স্বর্গসার, ৬। ক্ষমাষ্ট, ৭। ধরাধর, ৮। বসন্তবাক্, ৯। কাককলা, ১০। কীরশব্দা, ১১। তান্ডবী, ১২। হর্ষধারা, ১৩। ভাষা, ১৪। অর্দ্ধমাত্রা।

চিহ্নতাল সূত্রানুযায়ী হয় এগার মাত্রা—

"একতালঞ্চ শূন্যঞ্চ ক্রমেণ ত্রিতয়ং ততঃ।
শেষে চতুষ্টয়ম্ দ্রুতং চিহ্নতাল ইতির্যতে॥"

অর্থাৎ তালের রূপটি হয় ১ ০ ২ ০ ৩ ০ ৪ ৫ ৬ ৭ ০।

চন্দ্রমাত্রা : সাতমাত্রা। প্রাচীন শ্লোক—

"একশ্চন্দ্রস্তথা যুগ্মং তালং প্রত্যেকতস্ত্রয়ম্ ।
শেষেত্রীণি চ শূন্যানি চন্দ্রমাত্রা ভবেৎ পরা ॥"

অর্থাৎ তালের রূপটি হয়—১ ০ ২ ৩ ০ ০ ০ ।

দেবমাত্রা : পনের মাত্রা । সূত্র—

"প্রথমং ষট্‌তালঞ্চ অত্যূর্ধ্বঞ্চ ভবেৎ ক্রমে ।
শেষে যুগ্মং তথা শূন্যং দেবমাত্রা চ সোচ্যতে ॥"

অর্থাৎ তালের রূপটি হয়—১ ০ ২ ০ ৩ ০ ৪ ০ ৫ ০ ৬ ০ ৭ ৮ ০ ।

অর্ধজ্যোতিকা : সাত মাত্রা । সূত্র—

"চন্দ্রশূন্যং ত্রিতালঞ্চ বিরামেন ক্রমেণতু ।
অত্যূর্ধ্বঞ্চ ভবেত্তোকং অর্ধজ্যোতিরিতি স্থিতিঃ ॥"

অর্থাৎ তালের রূপটি হয়—১ ০ ২ ০ ৩ ০ ০ ।

স্বর্গসার : তালটি নয় মাত্রা । সূত্র—

"একৈক তালান্তর যুগ্মতালাৎ শূন্যত্রয়ং
তৎপরমেকতালম্ ।
কলাভিদা শূন্যভিদা সমাখ্যা তু
স্বর্গসারাখ্য নবীন তালঃ ॥"

অর্থাৎ তালের রূপটি হল—১ ০ ২ ৩ ০ ০ ০ ৪ ০ ।

ক্ষমাণ্ট : ষোল মাত্রা । সূত্র—

"শেষশূন্যং বিরামেন দেবতালমিতি ক্রমাৎ ।
ক্ষমাণ্টাখ্যান্তরে শূন্যমিতি সর্বত্র ভাষিতম্ ॥"

অর্থাৎ 'দেবমাত্রা' তালের অন্তে একটি ফাঁক সংযুক্ত হবে । তবে তালের রূপটি হয়—

১ ০ ২ ০ ৩ ০ ৪ ০ ৫ ০ ৬ ০ ৭ ৮ ০ ০ ।

ধরাধর : তালটি নয় মাত্রা । সূত্র—

"নবাম্বুদে দামিনী শীঘ্রবানং তথা সুসম্বন্ধ সুতাল ভাসম্ ।
যুগ্মং সত্রস্তৎ ক্রমতশ্চতালং শেষে ত্রিতালঞ্চ ধরাধরাখ্যা ॥"

অর্থাৎ রূপটি হল—১ ২ ০ ৩ ০ ৪ ৫ ৬ ০ ।

বসন্তবাক্ : বার মাত্রা । সূত্র—

"একতালশ্চ শূন্যশ্চ ক্রমেণাপি চতুষ্টয়ম্ ।
ক্রমাৎ তালত্রয়শ্চৈব বসন্তবাক সমুদাহৃত ॥"

অর্থাৎ রূপটি হল—১ ০ ২ ০ ৩ ০ ৪ ০ ৫ ৬ ৭ ০ ॥

কাককলা : এগার মাত্রা । সূত্র—

"সবিরামং স্বয়ং তালং যুগ্ম তালং তথা পরে ।
শেষৈকত্র ত্রিতালশ্চ ভবেৎ কাককলেতিসা ।"

অর্থাৎ তালের রূপটি হল—১ ০ ২ ০ ৩ ৪ ০ ৫ ৬ ৭ ০।

কীরশব্দা : দশমাত্রার তাল। সূত্র—

"ত্রিতালশ্চ ভবেৎ দ্রুতং তৎপরংস্বেক তালকম্।
শেষেঽপি চ ত্রিতালশ্চ কীরশব্দা প্রচক্ষতে॥"

অর্থাৎ তালটির রূপ হল—১ ২ ৩ ০ ৪ ০ ৫ ৬ ৭ ০।

তাণ্ডবী : এগার মাত্রার তাল। সূত্র—

"যুগ্মং যুগ্মং তথা যুগ্মং তালস্তেকং ভবেৎক্রমাৎ।
শেষশূন্যং কলা ভেদে তাণ্ডবীতি ভবেৎপৃথক্॥"

অর্থাৎ তালের রূপটি হল—১ ২ ০ ৩ ৪ ০ ৫ ৬ ০ ৭ ০।

হর্ষধারা : দশমাত্রার তাল। সূত্র—

"সবিরামং দ্বয়ং তালং যুগ্ম শূন্যশ্চতৎপরম্।
শেষোদ্ধ'শ্চ ত্রিতালশ্চ হর্ষধারা প্রকীর্ত্তিতা॥"

অর্থাৎ তালটির রূপ হল—১ ০ ২ ০ ০ ০ ৩ ৪ ৫ ০।

ভাষা : এ তালটি সাত মাত্রা। সূত্র—

"চন্দ্রশূন্যং বিরামেন দ্বয়ং তালং ভবেদ্ ক্রমাৎ।
অত্যুদ্ধ'শ্চ ভবেৎ দ্রুতং ভাষাখ্যাং তালমুত্তমম্॥"

অর্থাৎ তালের রূপটি হল—১ ০ ০ ৩ ০ ৪ ০।

অর্ধমাত্রা : তালটি আট মাত্রা। সূত্র—

"অভ্যুদ্ধ'শ্চ ত্রিতালশ্চ দ্বয়ং তালং বিরামকম্।
ইত্যর্দ্ধমাত্র বিজ্ঞেয়া সংগীত ভূবিসর্বতঃ॥"

অথাৎ রূপটি হ'ল—১ ২ ৩ ০ ৪ ০ ৫ ০।

এ তালগুলির বিশ্লেষণ সহ উল্লেখ পাওয়া যায় দামোদর সেন কৃত সংগীত দামোদরে। অবশ্য অবিকল ঐ শ্লোকগুলি সংগীত দামোদরের উল্লেখ সহ শব্দকল্পদ্রুম অভিধানে তাল শব্দ বিষয়ে উক্ত আছে। এই তালগুলির অন্য কোন সংগীত পদ্ধতিতে প্রচলন নাই। তাছাড়া এই গুচ্ছ তালের অংশগুলি কীর্তনেই প্রচলিত, সুতরাং অন্যান্য তালগুলিও কীর্তনাঙ্গীয় ছিল বলেই আমার অনুমান।

পূর্বালোচিত তালগুলি সবই গানের সঙ্গে ব্যবহার করা হয় কিন্তু কীর্তনাঙ্গীয় পদ্ধতিতে গান ছাড়াও তালাশ্রয়ে বাদ্য বাজাবার রীতি দেখা যায়। যেমন—গান শুরু হ'বার আগেই আট মাত্রার ছন্দে খোল বাজানো শুরু হয় যাকে বলা হয় **জুম্মানী** বা **হাতুটি**। প্রথমে নিম্নলিখিত আটমাত্রার বাজনা দিয়ে শুরু হয়—"ঘি তেটে ঘেনা ঝা ঘি তেটে ঘেনা ঝা ঘেনা ঝা"। পরে ক্রমশঃ দ্রুত হয়ে স্রোতগতা যতির ন্যায় বিন্যাস করা হয় এবং "জাগুরর জাগুরর জাগুর', বাজনার পর তেহাই দেওয়া হয়। তারপর নিম্নলিখিত নির্দিষ্ট বাজনাটির আশ্রয়ে

নানাবিধ হাতুটি ঘাতবাদ্য বাজান হয়। নির্দিষ্ট বাজনাটি হ'ল—

ঝা উরর দাদ্ধেনা দাগুররদা গুররধেনা দাগুররদা গুররধেনা দাগুররাদা গুররধেনা (ঝা) ইত্যাদি।

এসব বাজনার সংগে করতালের তিনটি আঘাত ছন্দে ছন্দে ব্যবহার করা হয়। অতঃপর শুরু হয় আপত্তন। এর বাজনাটি শুরু হয় বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই কুড়ি মাত্রার বিলম্বিত লয়ে। বাজনা প্রায় নির্দিষ্টই থাকে। প্রথমতঃ 'তা তা তা'—এই তিনটি খোলের ডাহিনার আঘাত দ্বারা ছন্দ রাখা হয়, পরে 'জাঝি নাঝি নাগ জাজা ঝেইয়া জাঝেই তা'—ইত্যাদি বোলের মাধ্যমে নানাবিধ ছন্দ সৃষ্টি করে মাতন তোলা হয়। তাছাড়া গৌরচন্দ্রিকা শেষ হলে কৃষ্ণলীলা বিষয় শুরু করবার আগে সকলে সমস্বরে 'রেথে রীনা'—শব্দাদির দ্বারা সাতমাত্রার ছোট দশকোশীর ছন্দে সুরমিল করে থাকে। এক্ষেত্রেও নির্দিষ্ট বোল দিয়ে বাদ্য শুরু করা হয়।

কীর্তনাংগীয় তালপদ্ধতিতে করতাল ব্যবহারের নিয়মটিও নির্দিষ্ট। সব সময়ে করতাল বাজাতে দেখা যায় না, কেবল মাতন অংশে করতাল বাজে খোলা এবং জোড় শব্দে। বিলম্বিত ও মধ্যগতির প্রতি দুই মাত্রায় তিনটি আঘাত দেওয়া হয় ১ ২ ৩—। এ সময়ে আর কোশী, কাল ইত্যাদি ক্রিয়াগুলি দেখানো হয় না। ত্রিমাত্রিক তাল লোফাতে প্রতি তিন মাত্রায় দু'টি আঘাত করা হয় যেমন ১ ২—। আবার দুঠুকি তালে দেওয়া হয় ১ ২—১ ২ ৩—, একতালি ঠিক উল্টো যেমন ১ ২ ৩—১ ২—। তাছাড়া অন্যান্য তালে প্রতি মাত্রায় করতালের আঘাত দিয়ে মাতন অবস্থাকে জমিয়ে তোলে। আবার 'পাকছটা' ইত্যাদি ছোট দশকোশীর ছন্দ সমন্বিত তালে বাজান হয় ১ ২ ৩—১ ২ ৩—১ ২ ৩ ৪ ৫—। করতাল কেউ কেউ ধারে বাজায় কিন্তু তা কীর্তনের বিধি নয়। করতাল যন্ত্রটি কাংস্য নির্মিত প্রাচীন ঘন জাতীয় বাদ্যযন্ত্র। এটিকে ব্যবহার করা হয় তালের ছন্দ রক্ষার জন্য, অর্থাৎ গায়ক এবং বাদকের মধ্যে সংগতি রক্ষার জন্য।

কীর্তনাংগীয় তালপদ্ধতির সংশ্লিষ্ট কতিপয় পরিভাষা এ পদ্ধতির অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য। এ পরিভাষাগুলির অন্য কোন সংগীতপদ্ধতিতে ব্যবহার নাই। কোন কোন উপাদান ব্যবহারিকভাবে অন্য সংগীতপদ্ধতিতে প্রচলিত থাকলেও সেগুলি ভিন্ন নামে প্রচলিত। হিন্দুস্থানী পদ্ধতিতে যাকে বলা হয় ঠেকা তা হল তালটি শুরু হলেই প্রতিটি মাত্রাবৈশিষ্ট্য রক্ষা করে সমগতিতে প্রতি আবর্তে সমের ঝোঁকসম্পন্ন এক আবর্তে প্রকাশিত বোল। অনুরূপ তালের প্রারম্ভিক বাদ্যটিকে কীর্তনীয় পদ্ধতিতে বলা হয় 'লওয়া' বা 'লগ্না'। পরিভাষাটি সম্পূর্ণ বাংলা এবং প্রয়োগবিচারে এর অর্থ করা যায় 'শুরু করা' অর্থাৎ তালক্রিয়া শুরু হলে বাদ্য আরম্ভ হ'ল—গায়ক এবার গানের সেবার নিমিত্ত বাদ্য গ্রহণ করো বা লও তাই হ'ল 'লওয়া'। হিন্দুস্থানী তালপদ্ধতিতে ঠেকাগুলি সাধারণতঃ এক

আবর্তে থাকে কিন্তু কীর্তনাঙ্গীয় পদ্ধতির বেশীরভাগ 'লওয়া'ই গুরু এবং লঘু প্রকারে দু'আবর্তে তৈরী। হিন্দুস্থানী ঠেকায় প্রতি মাত্রায় সাধারণতঃ একটি বা দু'টি বাণী থাকে কিন্তু কীর্তনাঙ্গীয় 'লওয়া'য় চারগুণ বাণীও ব্যবহৃত হয় এবং প্রতিমাত্রায়ই একটি নির্দিষ্ট ছন্দ প্রকাশ করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ ছোট দশকোশীর লওয়া প্রথমমাত্রা—'ঝা···ঝি' দ্বিতীয় মাত্রা 'নাগঝিনী' তৃতীয় ও চতুর্থ মাত্রায় বোল অনুরূপ, পঞ্চমমাত্রা 'ঝা—গুরগুর' এবং ষষ্ঠ মাত্রা 'জাঘিনাক' সপ্তম মাত্রা 'তেটে তেটে' ইত্যাদি গুরু অংশ বিশ্লেষিত হ'ল। লঘু অংশও অনুরূপ। বিশ্লেষণ থেকে স্পষ্টই দেখা যায় যে 'লওয়া' নয় যেন একটি 'পেশকার'। প্রতি মাত্রার এক চতুর্থাংশে বাদ্য প্রয়োগ করে ছন্দ প্রকাশে অভিনবত্ব সৃষ্টি করা হয়েছে। অনুরূপ অনেক তালের লওয়াতেই এ ধরনের বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। তাছাড়া 'লওয়াতে' 'গুড় গুড়' বাণী প্রয়োগ দ্বারা লয়ের সমতা ক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ শিথিলতা লক্ষ্য করা যায়। বড় ঘর অর্থাৎ বিলম্বিত তালগুলির জোড়া অংশে 'গুড়-গুড়ে'র স্থায়িত্বকাল অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় স র সম্পর্কিত। অবশ্য গাণিতিক চিন্তায় এ প্রয়োগ অনেকের নিকটে নিন্দনীয়। কিন্তু রীতি প্রাচীন এবং নান্দনিক যুক্তিসম্পন্ন অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের সুমিতি তত্ত্বের প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায় বলে শৈল্পিক চিন্তায় গ্রহণযোগ্য বলেই আমার মনে হয়। শিল্প যেহেতু প্রযুক্তি-বিদ্যা থেকে পৃথক এক আনন্দ-বিদ্যা এবং আনন্দই যাব আশ্রয় ও বিষয় সেহেতু ঘড়িস্বীকৃত সময়ের মাপের চুলচেরা বিচার দিয়ে 'লওয়ার' লয় নির্ধারণ ঠিক নয়। সামাজিক আনন্দ সৃষ্টির কারণ গায়ক বাদকের পারম্পরিকতা রক্ষা হেতুই লয়ের প্রয়োগ। কেবলমাত্র সময়ের একক বৈশিষ্ট্য রক্ষাকল্পে লয়ের সমতা স্থাপন দ্বারা সংগীতের নান্দনিক উৎকর্ষ স্থাপন হতে পারে না। যদি তাই হ'ত, সবার 'লয়' সমান হ'ত, সব তালের লয় সমান হ'ত, সব সময়ের লয়ও সমান হত। কীর্তনাঙ্গীয় তালপদ্ধতিতে 'লওয়া' প্রয়োগের মধ্যে বিশেষ নান্দনিক ব্যুৎপত্তি আছে কারণ নির্ধারিত লওয়ার বোলটি হ'ল দিকদর্শন মাত্র। গানের সুর, রস এবং প্রকার অনুযায়ী আঘাতের পরিবর্তন করে বাদকেরা নান্দনিক বুদ্ধি প্রতিপন্ন করে থাকেন। এজন্য রাঢ়দেশে প্রবাদ আছে 'দক্ষিণ-খণ্ডের গায়ক, এবং উত্তরখণ্ডের বাদক'—অর্থাৎ মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের গায়কদের প্রসিদ্ধি এবং উত্তরখণ্ড অর্থাৎ বীরভূম অঞ্চলের বাদকদের প্রসিদ্ধি। হিন্দুস্থানী পদ্ধতিতে ঠেকার মধ্যে মাঝে মাঝে ছোট 'টুকরা' ব্যবহার করা হয় কিন্তু মধ্যগতি বিলম্বিতগতির তালের 'লওয়া'তে কীর্তনে এমন কোন প্রয়োগ দেখা যায় না। কীর্তনের গানগুলির প্রথম চরণের মূল অংশ অনেক সময় বেশ কয়েকটি আবর্তে বাঁধা থাকে তখন লওয়াকেও আনুপাতিকভাবে ব্যবহার করা হয়। বড়-তালের 'লওয়া' অনেক ক্ষেত্রেই চাপড়ে অর্থাৎ বড় হাতে বাজান হয়, মধ্যগতির লওয়ায় টিপের প্রয়োগ আছে। মধ্যমা আঙুলটি ডাহিনার গাবের উপরে চেপে রেখে

তর্জনী মধ্যমার পিঠের উপর থেকে চেপে গাবের উপর ফেলে শব্দ করাকে বলা হয় 'টিপ' বাদ্য। গানের মূল অংশকে রূপায়িত করবার জন্য যে বাদ্য প্রাথমিক স্তরে ব্যবহার করা হয় তাকেই বলা হয় 'লওয়া'। এরই মধ্যে থাকে বিভিন্ন ছন্দ —দম, ক্ষম, দুন দৌড়, চৌদুন ইত্যাদি।

তাল প্রয়োগের দ্বিতীয় পর্যায়ে ব্যবহৃত হয় 'লহর'। শব্দটি ঢেউ ক্ষেত্রে বা অঙ্গভূষণ মালা ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। মালার একটির পর একটি স্তরকে বলা হয় লহর। প্রকৃত পক্ষে 'লহর' পর্যায়ের বাদ্যগুলি একের পর এক মালার স্তরের মত প্রয়োগ করা হয় বলেই মনে হয় নামকরণটি যথার্থ হয়েছে। সংগত ক্ষেত্রে গানের লক্ষণ বিচার করে লহর প্রয়োগ করা হয়। মূল গানের এক একটি অংশের পর তার অন্তর্নিহিত ভাব বা অর্থের পরিপুষ্টি সাধনকল্পে প্রাচীন গায়কগণ অপেক্ষাকৃত সহজ ভাষায় সুর এবং তালের আশ্রয়ে সংগীতাকারে যে পদ সংযোজন করে থাকেন তাকে বলা হয় আখর। 'আখর'ও স্তরে স্তরে এক, দুই, তিন বা অনেক কয়টি ব্যবহার করা যায়। 'আখর' সংযোজনার স্তরগুলিকেই আবার 'কাটান' বলা হয়। 'কাটানে'র স্তরবিন্যাসের সংগে সংগে বাদ্যের বিভিন্ন 'লহর' স্তরে স্তরে ব্যবহার করা হয়। ঐ পর্যায়েই গীতাংশের চূড়ান্ত ছন্দবিন্যাস হয়ে থাকে। 'লহর' চাপড়েও হতে পারে যেমন 'জাঝি নাঝি নাগঝিনি, দাদ্‌ধেনা দাদ্‌ধেনা দাদ্‌ধেনা তা—ইত্যাদি, আবার 'টুকি' অর্থাৎ দু'আঙুলের বাজনাও হ'তে পারে। তবে নানাবিধ ছন্দ প্রকরণই এ বাজনার উদ্দেশ্য। লহরের পরিণত অবস্থায় বাজানো হয় 'মাতন'। শব্দার্থ থেকে অনুমান করা যায় যে সংগতের শেষ পর্যায়ে যখন সার্বিক মত্ত অবস্থার সৃষ্টি হয় তখনই সজোর আঘাতসম্পন্ন দৌড় ছন্দে বা চৌদুন ছন্দে যে বাদ্য প্রয়োগ করা হয় তারেই নাম 'মাতন' যেমন 'জাঝাঘে নাঘেনা জাধেনা ঘেনাও'। 'মাতন' বা 'লহরে'র সংগে একপ্রকার বায়াপ্রধান বিভিন্ন ছন্দপ্রযুক্ত সজোর বাদ্য প্রয়োগ করা হয় যাকে বলা হয় 'ঘাত'। এই শব্দটি বাংলা ভাষার 'আঘাত' শব্দের অপভ্রংশ বলেই মনে হয়। ঘাতের বিভিন্ন অংশ-গুলিকে বলা হত 'হাত'। টুকির 'হাত' বাদ্যগুলিকে আবার বলা হয় লণ্টন হাত। এসব বাদ্য বিশ্লেষণের দ্বারা আস্বাদনের চরম অবস্থা সৃষ্টির পর যে বাদ্য দ্বারা পর্যায়ের সমাপ্তি বোঝানো হয় তাকে বলা হয় 'মূর্ছনা'। শব্দটি বাংলা ভাষার 'মূর্ছা' বা 'মূর্ছন' শব্দ থেকে সৃষ্টি, কারণ রসাস্বাদনের অন্তে মূর্ছিত অবস্থা অনুমান করাই স্বাভাবিক। ঐ মূর্ছনা বাদ্যের প্রস্তুতি ক্ষেত্রে যে বাদ্যাংশটি ব্যবহৃত হয় তাকে কেহ কেহ 'মান' বলে থাকেন। এসব পরিভাষাগুলি কীর্তনের সহযোগী আনদ্ধ যন্ত্র খোলের বাদন প্রসংগে প্রযোজ্য। অবশ্য তুলনা-মূলকভাবে বলা যায় যে হাত, লণ্টন হাত, ঘাত ইত্যাদি বাদ্যপর্যায়গুলি যথাক্রমে তবলায় ব্যবহৃত 'টুকরা', কায়েদা, গত ইত্যাদির অনুরূপ। সংগতক্ষেত্রে উপরোক্ত পর্যায়ক্রম যে-কোন প্রাচীন বাদকই মেনে চলতেন।

কীর্তনাঙ্গীয় তালপদ্ধতিতে যেসব প্রাচীন নিদর্শন আছে তার মধ্যে 'বদসি-অষ্টতাল' উল্লেখযোগ্য। তালটির প্রকৃতনাম অষ্টতাল এবং গানটির পদ কবি জয়দেব বিরচিত "বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচি কৌমুদি, হরতিদরতিমির-মতি ঘোরম্।" ঐ কথা কয়টি পূর্বালোচিত অষ্টতালের এক আবর্তে নিম্নরূপ তাললিপিতে গাওয়া বিধেয়।

+ ০ ২ ৩ ০ + ০ ২ ০ ৩ ০
এ ব দসি য দি ই কি ইন্ চি ইই দপি ই
+ ২ ০ ৩ ০ ৪ ০ + ০ ২ ০
দ অন্ ত রু উ চি ই ক অউ মু উ
৩ ৪ ০ ৫ ০ ৬ ০ + ০ ২ ০
দি ই ও কৌ মু উ দি হ অ র অ
৩ ০ ৪ ০ + ২ ০ ৩ ০ ৪ ৫ ০
তি ই দ অ র তি ই মি র ম তি মতি
+ ২ ০ + ১ ০ + ০ ২ ০ ৩ ৪ ০
ঘো ও ও র অম্ ওঘো র অ অ অ অ অম্ (এ)

কীর্তনাঙ্গীয় তালপদ্ধতির প্রতিটি উপাদানই প্রাচীনতার ছাপ বহন করে। করতাল প্রয়োগ, ক্রিয়া প্রয়োগ, কাঁধে ঝোলানো আনদ্ধ বাদ্য ব্যবহার ইত্যাদি প্রাচীন সংস্কারসঞ্জাত। কলাভেদ বা মার্গপ্রয়োগবিধি লক্ষণীয় তালগুলির ছোট, মধ্য এবং বড় শ্রেণীবিভাজন ক্ষেত্রে। ডমরু যতির প্রয়োগ আছে বড় দশকোশীর ঝুমড়ায়। তাছাড়া সংগতক্ষেত্রে ও লহরবাদনক্ষেত্রে অনেকে লয়কে ক্রমশঃ দ্রুততর করে স্রোতগতা যতির নিদর্শন দেখিয়ে থাকেন। তাছাড়া অষ্টতালের মত গুচ্ছতালের প্রয়োগ। অষ্টতাল ছাড়াও দু'একটি গুচ্ছতালের সন্ধান পাওয়া যায় যেমন "আরে ধনী প্রবেশিলরে কুঞ্জ কুটিরে, রাধাশ্যাম দুই-জনে বৈঠল একাসনে, হেরি সখি আনন্দে বিভোর"। এই কথা কয়টি এক আবর্ত করে চারটি বিভিন্ন তালে গাওয়া হয়। এ তাল কয়টি হ'ল শশিশেখর, রূপক, গঞ্জন ও সোমতাল। তাললিপিটি নিম্নরূপ—

+ ০ ০ ০ ২ ০ ০ ০ ৩ ০ ৪ ০
আরেধনী প্রবে — এ — সি ল রে এ — কুন্ জ —
০ ০ ৫ ০ ০ ০ ৬ ০ ০ ০
অ — কু উ টি ই রে — — —
+ ২ ০ + ২ ০ + ২ ০
রাধা শ্যা ম দুই জ নে বৈ ঠ ল
+ ২ ০ + ০ ২ ০
একা স নে হেএ এরি স খি

৩ ০ ৪ ০ + ০ ২ ০
আ নন্ দে আনন্দেবি ভোও ওও ওও ওও
৩ ৪ ০
ওর রে আরেধনী

কীর্তনাঙ্গীয় তাললিপিপদ্ধতিরও একটি সন্ধান পাওয়া যায়। এ পদ্ধতিতে তালচিহ্নগুলি দণ্ডমাত্রিক পদ্ধতির ন্যায় অক্ষরের উপরে একটি ছোট '।' চিহ্ন দেওয়া হয়। মধ্যগতি তালের কুশীগুলিকে দেখান হয় '০' চিহ্ন দিয়ে, অবশ্য ফাঁকগুলিতেও একই চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। বিলম্বিত গতির তালে কালের প্রয়োগ আছে। এই কালচিহ্ন দেখানো হয় '॥' চিহ্ন অর্থাৎ একটি সুস্পষ্ট বিন্দু দিয়ে। অর্ধ মাত্রা বা সিকি মাত্রার প্রয়োগ নাই বলেই বোধ হয় কোন চিহ্ন নাই। মধ্য ও বড় গতির তালের ছুট চিহ্নগুলি যথাক্রমে। ০ ০ ০ এবং।০০॥০॥০০, তা'-ছাড়া জোড়গুলি দেখানো হয় পূর্বের ও পরের তাল সমন্বিত মাত্রা দুটির উপর যথারীতি দণ্ড চিহ্ন দিয়ে দুটি দণ্ডের মস্তক বক্ররেখা দিয়ে যুক্ত করে। মধ্যগতির জোড়ার রূপ। ॰ । এবং বড় গতির জোড়ার চিহ্ন ।॰০॰। সমচিহ্ন হিন্দুস্থানী পদ্ধতির মতই '+' চিহ্ন দিয়ে বোঝানো হয়। দুঠুকি তালের মাত্রা দুই অংশে চৌদ্দমাত্রা, কিন্তু তাললিপি দেখানো হয় ।।.০০.এই ভাবে। অর্থাৎ তালটির ছন্দ জানা চাই, কেবলমাত্র কথাগুলির বিভাগ এইরূপে দেখানো হয়। অনুরূপ একতালির তালচিহ্ন। ০। ০ এক্ষেত্রে দণ্ডটি চার মাত্রা সমন্বিত এবং '০' টি তিন মাত্রা সমন্বিত। লোফা জাতীয় ত্রিমাত্রিক তালেও একতাল একফাঁক অর্থাৎ। ০।০ — এমন চিহ্ন দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে অবশ্য দণ্ড এবং শূন্য উভয়ই তিন মাত্রার প্রতীক। ইদানীং অবশ্য কেউ কেউ স্বরলিপি প্রচলন করবার জন্য হিন্দুস্থানী পদ্ধতির দণ্ডমাত্রিক বা ভাতখণ্ডে নিয়ম অবলম্বন করেছেন। তাললিপি করার সময় শব্দাক্ষর ক্ষেত্রে অক্ষরপ্রয়োগ, স্বরের স্থিতিকালক্ষেত্রে মাত্রানুযায়ী '—' চিহ্ন এবং স্বর ধরে রাখার ক্ষেত্রে অ, ই, উ, এ ইত্যাদি স্বরবর্ণ প্রয়োগ করে দেখানো হয়। রসিকদাসের করা তাললিপি পরীক্ষা করে এসব চিহ্নগুলি পাওয়া গেছে। তাই রসিকদাসের পিতা অনুরাগী দাস বা তাঁর সমসাময়িক রাধিকা সরকার, এমনকি তাঁর গুরু দামোদর কুণ্ডুর সময়েও এ তাললিপি প্রচলিত ছিল অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেও এ লিপিপদ্ধতির চলন ছিল। গদাধর পণ্ডিতের পাট ভরতপুরে রক্ষিত একটি প্রাচীন পাণ্ডুলিপিতে কেবল তালচিহ্নগুলি এবং জোড়ার চিহ্নগুলি পাওয়া যায়। শোনা যায় নিকুঞ্জবিহারী মিত্র ঠাকুরও অনুরূপ তাললিপি ব্যবহার করতেন। তাললিপিটির চলতি নাম গানের 'অঙ্কপাত'। গানকে অনুকরণ করে মনে রাখার নিমিত্তই অনুরূপ লিপিপদ্ধতি অষ্টাদশ শতকের প্রথমভাগে প্রচলিত হয়েছিল, কারণ ইতিপূর্বে গায়কদের পাণ্ডুলিপিতে তালচিহ্ন দেখা যায় না।

এই তালপদ্ধতি মূলত প্রাচীন তালপদ্ধতির ভিত্তির উপর গড়ে উঠেছে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই তবে এর প্রচলনের ঐতিহাসিক উল্লেখ কবি জয়দেবের পরবর্তীকাল অর্থাৎ ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকেই পাওয়া যায়। গীত-গোবিন্দ উল্লিখিত রূপক তাল, নিঃসার তাল, শঙ্করাভরণ তাল, একতালি, যতি তাল, অষ্টতাল ইত্যাদি তালগুলির বেশীরভাগই প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। পরবর্তী উল্লেখযোগ্য গায়ক বিদ্যাপতি এবং চণ্ডীদাস সংগীতক্ষেত্রে পূর্বরীতি লঙ্ঘন করেছেন বলে মনে হয় না, কারণ কবি হিসাবে তাঁরা ছিলেন জয়দেবের অনুগামী তাই সাংগীতিক প্রকরণে তাঁকে উপেক্ষা তাঁরা করেন নাই। পঞ্চদশ শতাব্দীর তালগুলিও বিলম্বিত প্রকৃতির ছিল বলে মনে হয়, কারণ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু গম্ভীরা লীলায় যখন 'দীনদয়াদ্র্নাথ' গান আস্বাদন করতেন তখন তিনি নিজেই 'ঐ দীন ঐ দীন কহে বার বার'। একই শব্দ বারবার বলা হয় কেবল তালটি বিলম্বিত হলেই। তাই রসাস্বাদনের জন্য বিলম্বিত তালই প্রযোজ্য ছিল। তবে দ্রুতলয়ও প্রচলিত ছিল কারণ কোন কোন কীর্তনে নৃত্যও ছিল। খুব বিলম্বিত লয়ে নৃত্য সম্ভব নয়।

কীর্তনের পরিভাষা

১। গানের মুখ

গানের আঙ্গিক সম্পর্কে চলতি পরিভাষাগুলি দীর্ঘদিন যাবৎ প্রচলিত। বিশেষত রাঢ়দেশের কীর্তন প্রকরণের সঙ্গে এই পরিভাষাগুলি বিশেষভাবে জড়িত।

প্রতিটি গানের মূল পরিচয়ই হল গানটির প্রথম স্তবকের প্রথম দু'টি চরণ। এই অংশটিকেই বলা হয় গানের মুখ-অংশ। প্রথম চরণটির পরিচয়ে গানটির পরিচয়, যেমন—'অরুণিত চরণে' গান, 'মুখ মণ্ডল' গান, 'চূড়াটি বাঁধিয়া' গান ইত্যাদি। গানের মুখ হল প্রথমাংশের চরণ দুটি, যার প্রথম চরণটিকে বলা হয় পূর্বার্ধ এবং দ্বিতীয় চরণটিকে বলা হয় উত্তরার্ধ। যে-কোন গানেরই মুখ-অংশটি বিলম্বিত করে গাইবার নিয়ম, বিশেষত মনোহরসাই গানে। কারণ গড়াণহাটি গানে সম্পূর্ণ গানটিই একই তালে এবং একই লয়ে গাইবার নিয়ম। পূর্বার্ধের প্রচলন এখনও অনেক গানে আছে তবে উত্তরার্ধের প্রচলন বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই উঠে গেছে। উত্তরার্ধ বিধিসম্মতভাবে না গাইলে পূর্বার্ধ গানের রূপ যথার্থ অনুভব করা যায় না। পূর্বার্ধ এবং উত্তরার্ধ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে একই তালে গাওয়া হয়। যেমন—

পূর্বার্ধ—'অরুণিত চরণে রণিত মণি মঞ্জির'—মধ্যম দশকোশী

(৪ জোড়ের গান)

প্রথম আখর "নাগরের গো অরু"—দ্বিতীয় আখর "শ্যাম বিনোদিয়া নাগরের গো"—তৃতীয় আখর "বিনোদিয়া নাগরের গো শ্যাম বিনোদিয়া" ইত্যাদি।

এরপর উত্তরার্ধ একই তালে—

"আধ আধ পদ চলনি রসাল"—মধ্যম দশকোশী (৩ জোড়ের গান)

প্রথম আখর—"কিবা সে গমনের ভঙ্গি কিয়ে আধ" দ্বিতীয় আখর "খঞ্জনগতি চলে যায় কিবা সে গমনের ভঙ্গী"।

এসব ক্ষেত্রে পূর্বার্ধ উত্তরার্ধ একই তালে গাওয়া হয় বিশেষত গড়াণহাটি গানে এটি অনেকটা নির্ধারিত রীতি। বড় দশকোশী তালের গৌরচন্দ্রিকাগুলিরও পূর্বার্ধ উত্তরার্ধ একই তালে গাইবার নিয়ম ছিল। যেমন : 'মরমে লেগেছে গোরা না যায় পাসরা'—এই পূর্বার্ধটি সমতালের আখর মাতন হয়ে যাবার পর উত্তরার্ধের পদ—"নয়নে অঞ্জন হয়ে লাগিয়াছে প্যারা" এটিও সমতালে গাওয়ার রীতি। বর্তমানে অবশ্য গৌরচন্দ্রিকার উত্তরার্ধ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই মধ্যম দশকোশী করে গাওয়া হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম আছে যেমন—"কোথায় আছিলা গোরা এমন সুন্দর" এই পূর্বার্ধ অংশ খামসা তালের গান, উত্তরার্ধ পদ—"ও

রূপে মুগধ কৈল নদীয়া নগর"—এটি বড় দশকোশী। এর আখর ভিন্ন। এসব গানের প্রচারের ধারা আছে, গুরুপরম্পরা ইতিহাস আছে, তবে প্রতিটি গানেরই অন্তত দু'শ বছরের অতীত সুস্পষ্ট, 'অরুণিত চরণে' গরাণহাটি গান 'রাধিকা সরকারের' প্রিয় গান। আর পরবর্তী কালে এ গান সবচেয়ে বেশী সুন্দর ফলাও হ'ত শচীনন্দন ঘোষের মুখে এবং আরও পরবর্তী কালে তাঁরই পুত্র কমলের মুখে। তবে লেখকের সংগীতগুরু রাধারমণ কর্মকার মহাশয়ের মুখে গানটি একটি অপূর্ব রূপ পরিগ্রহ করত বলে সব প্রাচীন শ্রোতাগণই স্বীকার করেছেন। লেখকের আরও এক সংগীতগুরু প্রয়াত হরিদাস কর মহাশয় গানটি অপূর্ব গাইতেন, তিনি শিখেছিলেন শ্রীখণ্ডের গৌরগুণানন্দ ঠাকুর মহাশয়ের কাছে। কর মহাশয়ের গান অত্যন্ত সুস্পষ্ট এবং তিনি এর স্বরলিপি প্রকরণও করেছেন। তবে মুখের পার্থক্য হ'ল—রাধারমণদা গান ধরতেন—"আমার গোবিন্দের অরু" এইভাবে আর 'হরিদা' গান ধরতেন "অরুণি"—এইভাবে।

'কোথায় আছিল গোরা'—গড়াণহাটি গান। গানটি কলকাতায় এসেছে গদাধরদাস বাবাজীর সূত্রে। বৃন্দাবন থেকে এসে কলকাতায় কিছুদিন থেকে যে দু'এক জনকে গান শিখিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন প্রয়াত সুরেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁরই সূত্র ধরে এ গানটির পূর্বার্ধ উত্তরার্ধ কলকাতায় প্রচারিত হয়েছে লেখক প্রমুখ কয়েকজনের কাছে। রাঢ়দেশের গানের অনেক ক্ষেত্রে আবার দুই অর্ধে তালফেরতা লক্ষ করা যায়। যেমন—"মুখ মণ্ডল জিতি শারদ সুধাকর"—এই পূর্বার্ধটি চব্বিশ চাপড় ধরাতালে গাওয়া হয়। আবার "তনুরুচি তরুণ তমাল"—এই উত্তরার্ধটি গাওয়া হয় মধ্যম দশ-কোশী তালে। অনেক গান আছে যে গানের পূর্বার্ধ অপেক্ষা উত্তরার্ধের গুরুত্ব বেশী। যেমন গোষ্ঠলীলার একটি তুকগান—

"গোপাল না কি যাবে দূরবনে।
তবে আমি না জীব পরাণে॥"

এই পূর্বার্ধটি মধ্যম দশকোশী তালে গাওয়ার প্রসিদ্ধ গান। উত্তরার্ধের পূর্ণস্তবকটি বড় দশকোশীর গান।

"দধি মন্থন কালে সম্মুখে বসিয়া খেলে
আঙিনার বাহির নাহি করি।
আঙিনার বাহির হৈয়া যদি গোপাল খেলে গিয়া
তবে প্রাণ ধরিতে না পারি॥"

আবার কোন কোন ক্ষেত্রে পূর্বার্ধ উত্তরার্ধ বিচার না করে গানের দ্বিরা-বৃত্তি দেখা যায়। অর্থাৎ গানের একই পদকে দুইবার দুইরকম তালে ও দুই-রকম সুরে গাওয়া হয়। যেমন গড়াণহাটি ঘরের একটি প্রসিদ্ধ গান—"দুটি

ভুরু কামের কামান"—বড় বীর বিক্রম তালে এ 'পদটি গাইবার পর আবার দ্বিরাবৃত্তি করে—

"দুটি ভুরু কামের কামান,
নট কৈলে কুল অভিমান।"

এই অংশটি মধ্যম রূপক তালে গাওয়া হয়।

২। আখর

কীর্তনগানের সূত্রে যে কেবলমাত্র পদসাহিত্যের বিকাশ হয়েছে তা নয় এর সঙ্গে সংগে ঘটকালি ও আখর সংযোজনার সূত্রে একপ্রকার অলিখিত সাহিত্যেরও উদ্ভব হয়েছে যাকে বলা যায় 'আখর সাহিত্য'। আভিধানিক অর্থে 'আখর' শব্দটি হ'ল 'অক্ষর' কিন্তু কীর্তনগানে এর প্রয়োগ দেখে শব্দটিকে এত সংকীর্ণ অর্থে প্রয়োগ করা যুক্তিসংগত নয়। এর প্রয়োগে কীর্তনীয়ার সৃজনশীল মানসিকতার যেমন পরিচয় পাওয়া যায় তেমন কীর্তনের গানটিরও আভিজাত্য বর্ধিত হয়। আখরকে যদি শুধু কথার তান বলে অভিহিত করা হয় তবে তাকে সীমিত করা হয়। কারণ তান অর্থে নিরর্থক বর্ণপ্রয়োগে সংগীতের উজ্জ্বলতা সৃষ্টি করা কিন্তু আখর হল অর্থবাহী ভাবোদ্দীপক শব্দগুচ্ছের সংকলনে কীর্তনের সাংগীতিক উৎকর্ষ স্থাপন করা। আখরকে সাহিত্য বলতে আপাত আপত্তিটি হল এ সাহিত্য অলিখিত তাই লৌকিক। লোকসাহিত্যের পর্যায়েও একে ফেলা যায় না কারণ এরও কতগুলি রীতি-নীতি আছে, তা ছাড়া বেশীর ভাগ আখরেরই ভাষাসমৃদ্ধি আছে। লৌকিক ভাষা নাই এ কথা বলা যায় না কারণ—'হেইমা হেইমা লাজের কথা', 'আলো সইলো সই', 'মো মেনে মরিয়ালো যাই', 'আ-ছি, লাজে মইলাম'—ইত্যাদি ভাষার মধ্যে লোকসাহিত্যের ছাপ আছে কিন্তু বেশীর ভাগ আখরেই আভিজাত্যের ছাপ দেখি। আখরের সূত্রে মূলপদের ভাব ও ভাষার একটি অপূর্ব বিন্যাস করা হয় যার ফলে সঞ্চার সার্থক হয়, শৈল্পিক সৃষ্টিচাতুর্য ফুটিয়ে তোলে ও লীলাবিন্যাসকে নাটকীয় করে। ছোটগানে অর্থাৎ লোফা, দাসপ্যারী, দোঠুকী, ঝাঁতি বা ঝাঁপতালের গানে অল্পকথায় আখর সংযোজন করা হয় ছন্দ রক্ষা করে। কোন কোন ক্ষেত্রে পদান্ত মিলও রক্ষা করা হয়, যা ইদানীং রথীন ঘোষ মহাশয় করে থাকতেন এবং হরেকৃষ্ণ সাহিত্যরত্ন মহাশয়ও এর পক্ষেই ছিলেন। অবশ্য ছোটগানের ক্ষেত্রে এ-গুলি সম্ভব হলেও বড়গানে এমন প্রয়োগ দেখা যায় না। আখর সংযোগ করার বিধি খুব প্রাচীন নয়, কারণ প্রাচীনকালে যদি এ নিয়ম থাকত তবে যেসব পদরচয়িতা গায়ক ছিলেন তাঁরা স্বয়ং আখর দিতেন এবং তাঁদের আখরগুলি লেখাও থাকত। পরবর্তীকালে যখন গায়কগণ আর পদরচনা করতেন না কারণ মহাজনদের তালিকা অনেকটা নির্দিষ্ট হয়ে গেল তখনই গায়কগণ তাঁদের স্বকীয়

অনুভূতিকে ভাষার মাধ্যমে সুর ও তালের আশ্রয়ে মূলগানের সংগে সংযোজিত করতে শুরু করলেন এবং তখন থেকেই ক্রমশ আখরও মূলপদের অংশবিশেষ বলে কীর্তনীয়াদের নিকট বিবেচিত হতে শুরু করল। অলিখিত বলে সাহিত্যিকদের নজর এড়িয়ে গেল। আখর সম্পর্কে আরও একটি কথা বলা যায় যে আখর শুধু কাব্যের শোভা নয় এটি হল সংগীতের উজ্জ্বলতা, কারণ ছোট-গানের বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় করে তিন ধাপে যে আখর প্রয়োগ করা হয় তার প্রথমটি অপেক্ষা দ্বিতীয়টি চড়া, আরার দ্বিতীয়টি অপেক্ষা তৃতীয়টি আরও চড়া। কীর্তনগানে তুকের সংখ্যা কম, বড়জোর দু'টি—স্থায়ী ও অন্তরা যাকে বলা হয় পূর্বার্ধ এবং উত্তরার্ধ। তাই সুরের একঘেয়েমি কাটাবার জন্যও আখরের প্রয়োজন। এর জন্যই মনে হয়, মূলগানের সুরের থেকে আখরের সুর পৃথক। আখরবৈশিষ্ট্য সবচেয়ে বেশী ফুটে ওঠে মনোহরসাই গানে এবং শেষ পর্যায়ে মুর্শিদাবাদের গানে আখরের একটি ধারা আছে। সকলের ধারণা গায়কেরা ইচ্ছামত আসরে আখর দিয়ে থাকেন কিন্তু ঠিক তা নয়, বিশেষ বিশেষ গানগুলির ক্ষেত্রে আখরও নির্দিষ্ট এবং দীর্ঘকাল যাবৎ গুরুপরম্পরায় একই আখর চলে আসছে। কে বা কারা কখন এ আখর যুক্ত করেছিলেন তা নির্দিষ্ট করে বলা দুঃসাধ্য। তবে আখরের স্রষ্টা হিসাবে কিছু কিছু কীর্তনীয়ার নাম পাওয়া যায়, যেমন বলা হয়—রসিকদাসের আখর, গণেশদাসের আখর, যামিনী মুখুজ্যের আখর ইত্যাদি। তা ছাড়া আখরে প্রসিদ্ধ ছিলেন রাধিকা সরকার, দামোদর কুণ্ডু, আখরিয়া হরিদাস, ফটিক চৌধুরী প্রমুখ। প্রার্থনা কীর্তনে আখর সংযোজনায় শ্রেষ্ঠ ছিলেন ইদানীং রামদাস বাবাজী মহারাজ, প্রাণগোপাল গোস্বামী, গৌরগোপাল গোস্বামীপ্রভু প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। এ আখর সংযোজনার কোন পরিধি নাই। ভাবোদ্দীপনার চরম পর্যায়ে পৌঁছবার জন্য চৈতন্য চরিতামৃত, চৈতন্যভাগবত, নরোত্তম ও অন্যান্য পদাবলীর ভাষা অবলম্বন করে আত্মনিবেদনাত্মক, প্রার্থনাত্মক অভিব্যক্তিগুলি একের পর এক সংযোজন করা হয়। অবশ্য লীলাকীর্তনের ক্ষেত্রে আখর সংযোজন কঠিন কাজ কারণ সে ক্ষেত্রে রসাভাসের দিকে লক্ষ্য রাখতে হয়। প্রসিদ্ধ কীর্তনীয়া গণেশ দাস শ্রদ্ধেয় প্রাণ-কিশোর গোস্বামী মহাশয়কে এ প্রসঙ্গে বলেছিলেন—"প্রথম আখর যখন দিলাম, গাছের মূলকাণ্ড থেকে যেন শাখায় গেলাম, দ্বিতীয় আখর দিলে শাখা থেকে পত্রে গেলাম, তৃতীয় আখর সংযোজনায় তাই ভয় হয়—বুঝি পড়েই গেলাম।" মনে হয় পরবর্তীকালের কিছু সংস্কৃত পণ্ডিত ও ভাষাবিদের সূত্রে এ আখরের কলেবর অনেকটা বৃদ্ধি পেয়েছে। আখর ব্যবহারের সাধারণ নিয়ম হল মূল-গানের কিছু অংশ কেটে সে স্থানে প্রথম আখরটি ব্যবহার করা হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে মূলগানের যে অংশটি প্রথম আখরের সময় ছিল সেটি বাদ দিয়ে সেই স্থানে দ্বিতীয় আখরটি দিতে হয়। শেষ পর্যায়ে প্রথম আখরটির স্থানে তৃতীয়

আখরটি সংযোজিত হয় এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় আখর দুইটি একসঙ্গে বহুবার পুনরাবৃত্তি হতে থাকে সেই সঙ্গে নানাবিধ 'লহর' বাজাবার পর শেষ পর্যায়ে 'মাতন' শুরু হয়। ক্রমশ মূলগানের পদকে কাটিয়ে আসরে গাওয়া হয় বলেই এ অংশটিকে 'কাটান'ও বলা হয়। মূলগান থেকে কেটে যখন আখর সংযোজিত হয় তখন বাজনার ক্ষেত্রেও মূলঠেকার থেকে কাটিয়ে প্রথম লহর সংযুক্ত করা হয় এবং পরিণত অবস্থায় মূলগান বা মূলঠেকা থেকে সম্পূর্ণভাবে গান ও বাক্য সরে যায় এবং এজন্য একে বলা হয় শেষ কাটান। ঠিক বিপরীত পথে 'মূর্ছনে'র পর আবার সরে যেতে হয় অর্থাৎ আবার মূলগান আবার মূল ঠেকা। এই হল কীর্তনগানের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।

ছোটগানের ক্ষেত্রে ছোট ছোট আখর তিন ধাপে ব্যবহার করা হয়। যেমন—

১। দেখে এলাম তারে সই দেখে এলাম তারে (মূল পদ)
(ক) এই এখনই দেখে এলাম,
আখর : (খ) যমুনার জল আনতে গিয়ে,
(গ) ভুবনমোহন রূপখানি (দাসপাারীতাল)

২। সুন্দরী শুনহ আজুক কথা (মূলপদ)
(ক) এক শুভবার্তা দিতে এলাম,
(খ) শুনে বড়ই আনন্দ হবে,
(গ) আমার মুখের কথা শুনে (দোঠুকী)

৩। কৃষ্ণ নাম লব মুখে জনম যাইবে সুখে (মূলপদ)
(ক) সুখে কাটাব, বাকী কটা দিন,
(খ) কৃষ্ণ নাম গেয়ে গেয়ে,
(গ) শ্রীধাম বৃন্দাবনের পথে, (লোফা)

৪। এ হেন সুন্দরী যদি মোরে মিলাইত বিধি
বসায়ে রাখিতাম সোনার খাটে। (মূলপদ)
(ক) বসায়ে রাখতাম,
(খ) যে খাটে বসালে খাটে।
(গ) সোনা নয় উপাসনার খাটে (ঝাঁপি)

এসব গানে অল্প কথায় আখর, তবে আখরের ক্ষেত্রে একই কথা দু'বার বা দুটি গানেই একধরনের আখর ব্যবহার করা শৈল্পিক দিক থেকে ঠিক নয়। বড় গানের আখরের ক্ষেত্রে সাহিত্যের প্রভাব বেশী দেখা যায়। সেক্ষেত্রে মূলপদের কথাটি ছোট হলেও আখরের স্তরে স্তরে একটি বিস্তৃত বিন্যাস করা হয়ে থাকে। যেমন—

মূলপদ—তনুরুচি তরুণ তমাল—(মধ্যমদশকোশী)

আখর : (ক) নবতমাল জিনি তনুরুচি, চাঁদ জিনি
বদনচাঁদ, হঠাৎ দেখে আমার এই মনে হয়,
যেন একটি তমাল গাছে, অকলঙ্ক
ষোলকলাপূর্ণ চাঁদ ফলেছে, হেইমা
কিবাই বা তার (তনুরুচি তরু)

(খ) শ্যামের বদন নয় যেন একটি বিকচ সরোজ,
তাহে দুটি দিঠি নয় যেন দুটি খঞ্জন পাখী,
হঠাৎ দেখে আমার এই মনে হয় যেন
একটি বিকচ সরোজ মাঝে, দুটি খঞ্জন
পাখী নাচছে হেইমা কিবাই বা তার
(তনুরুচি তরু)

(গ) শ্যামের বদন নয় যেন একটি নীল কমল,
তাহে চূর্ণকুন্তল অলকাবলী, হঠাৎ দেখে আমার
এই মনে হ'ল যেন নীলকমলের ধারে ধারে,
শতশত অলি বসে হেইমা কিবাই বা তার
(তনুরুচি তরু)

অনুরূপ 'শিকলী' কাটান ধরাগানের পর মধ্যম দশকোশীর বেশীর ভাগ অংশে থাকে। যেমন 'আধল প্রেম' গানের দ্বিতীয়ার্ধ—

'সো বহুবল্লভ কান'—মূলপদ

আখর : (ক) সখীরে আমি এতদিন জানতাম, সে
শুধু আমার একার বল্লভ, এখন
দেখি তা নয় তা নয়, তার আমার মত,
কত শত কেনা দাসী আছে
মানে জানাইলে (সো বহুবল্লভ)

(খ) তার নাম রাধাকান্ত, রাধাবিনোদ, তাই
ভাবলাম সে বুঝি একাই রাধার কিনা
একাই আমার, এখন দেখি তা নয়—
তা নয়, তাকে মনেপ্রাণে যে ডাকে
যে ভজে গোবিন্দ আমার
তারই হয় মানে জানাইলে (সো বহুবল্লভ)

(গ) সে যে বহুজনবল্লভ, বহুজনের কাছে আদরে
আদরে ফিরে, আমার মত অভাগিনী
রাধার কাছে এত অনাদরে রইবে কেন,
মানে জানাইলে (সো বহুবল্লভ)।

শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগের মধ্যম দশকোশী তালের একটি প্রসিদ্ধ তুকগান—

"সে যে ধনী রমণী মুকুটমণি,
রূপে গুণে ত্রিভুবনে, বৃন্দাবনে নাম হল যার
রাইরঙ্গিণী"—

গানটির আখর প্রয়োগ করা হয় অত্যন্ত সুন্দরভাবে মধ্যম দশকোশীর এক আবর্তে। আখরগুলি হল—

আখর : (ক) যদ্যপি তোমার রূপে ভুলে ত্রিভুবন,
তাও সত্য মেনে নিলাম, কিন্তু আমার
রাধার রূপে ভুলায় তোমার নয়ন
(সে যে ধনী রমণী মুকুট)

(খ) যদ্যপি তোমার অঙ্গগন্ধ হরে
সবার মন, তাও সত্য মেনে নিলাম
কিন্তু আমার রাই অঙ্গগন্ধ ভুলায়
তোমার মন (সে যে ধনী রমণী মুকুট)

(গ) যদ্যপি তোমার বংশীরবে মাতায়
ত্রিভুবন, তাও সত্য মেনে নিলাম,
কিন্তু আমার রাইয়ের কণ্ঠ হরে
তোমার মন (সে যে ধনী রমণী মুকুট)।

দানলীলার বড় শশিশেখর তালের প্রসিদ্ধ তুকগান—

"বড়াই মানা করগো দানী যেন
না ছোঁয় আমায়।"

আখর : (ক) কি ক্ষেণে বাড়াইলাম ঘর হতে পাগো,
তাতো আগে জানি না, বড়াই তোর কথা শুনে,

(খ) তুই সে নাটের গুড়িলো, ওগো বড়াই বুড়িলো,
আছি, ছি ছি রাখাল হয়ে দানী আমায়
ছুঁইতে আসে, মানা করনা কেন, দেখে
তোমার কি আনন্দ লাগছে হে।

স্পষ্টই বোঝা যায় যে মূলগানের কথায় অপ্রকাশিত কিছু বক্তব্য থাকে তাকে সুস্পষ্ট করে প্রকাশ করাও আখরের কাজ। যেমন, 'কলহান্তরিতা' পালার মধ্যম দশকোশী গান— "স্বর্ণ বর্ণ বিবর্ণ ভৈ গেও
পূর্ণ বিধুমুখ তূর্ণ নিরসল"।

গানটির নানাবিধ আখর আছে, যেমন :

(ক) বরণ কেনে মলিন হ'ল গো, ছিলি কাঁচা
সোনার অঙ্গ

(খ) এই না কথা কইতেছিলি, তুইকি প্রেমের
হাট ভাঙবি নাকি, কৃষ্ণ রূপগুণের এইত স্বভাব—
যে সদাই কৃষ্ণকথা ভাবে তার ভাবতে ভাবতে
কৃষ্ণ বরণ ধরে, বুঝি ভাবায়ে পরখি দেখছে।

'দানলীলা' পর্যায়ের গানে এমন নানাধরনের আখর দিয়ে নাটকীয়তা সৃষ্টি করে মূল কাব্যের অপ্রকাশিত অংশটুকু রসায়িত করে আখরের সাহায্যে উপস্থাপিত করা হয়।

মধ্যম শশিশেখর তালের প্রসিদ্ধ গান—

"কেমনে তোমার সনে পীরিতি করিব হে
ওহে ও তাই বল কানাই।"

আখর সংযোজন করে বলা হয়—

"তুমি হ'লে গোঠের ধেনু চরান রাখাল,
আর আমি হ'লাম রাজার ঝি হে
(এই কথা) লোকে শুনলে বলবে কি,
রাখালের সঙ্গে রাজনন্দিনীর প্রেমের কথা।

এমনভাবেই গানকে সম্পূর্ণ করে আখর। প্রাচীন কাল থেকে প্রচলিত আখরগুলির সহায়তা না নিয়ে কেবলমাত্র মূলগানের কাব্যচরিত্র বিশ্লেষণ করলে রক্তমাংসহীন অস্থির বিন্যাসই করা হয়।

৩। ঘটকালি

আখরকে ব্যবহারভেদে 'ঘটকালি' বলা হয়। এর সূত্রেও সাহিত্যিক উপকরণ নানাভাবে ফুটে উঠেছে। আখর গাইতে হয় তালের আশ্রয়ে এবং আখরের একটি নির্দিষ্ট সুর থাকে। এর ব্যবহার সর্বদাই হয় মূল গানের পদাবৃত্তির পরে সংযোজনস্বরূপ। আখর মূলগায়েন শুরু করে দেয়, দোহারগণ তার পুনরাবৃত্তি করে অর্থাৎ উভয়ে মিলেই গানের অন্য অংশের মতই গেয়ে থাকে। অপর পক্ষে ঘটকালি তালের বন্দিসে রেখে গাওয়া হয় না, হয়ত তালটি যথারীতি চলছে, ঠেকাও চলছে, সেইসঙ্গে কিছু সময় গানটির সুরে সুরে যে একটি সার্বিক মূর্ছনা তৈরী হয়েছে সে মূর্ছনার সুরটিকে অবলম্বন করে ভেঙে ভেঙে কথাগুলিকে সাজানো হয়। এগুলি সাধারণত মূলগায়েনই গেয়ে থাকে, দোহারগণ শুধু সুর মিলিয়ে যায়। এ ঘটকালি দিয়েই অনেক সময় বিভিন্ন গায়কের পালাপর্যায়ের বৈশিষ্ট্য বিচার করা হয়। এ সূত্রেই রসিকদাসের পর্যায়, বাঁড়ুজ্যে মশাইয়ের পর্যায়, মুখুজ্যে মশাইয়ের পর্যায় ইত্যাদি বিভিন্ন পর্যায়ের পার্থক্য দেখা যায়। একই পালা ভিন্ন ভিন্ন গায়কের কাছে ভিন্ন ভিন্ন রূপে ফুটে ওঠে এই 'ঘটকালি' আর আখরের পার্থক্যের জন্যই। 'ঘটকালি' সাধারণত

ব্যবহার হয় গানটি শুরু করার মুখে পূর্ববর্তী গানের সংগে সংগতি রাখার জন্য। যেমন—

'খণ্ডিতা' পালার প্রসিদ্ধ তেওট গান

"ভাল হইল আরে বন্ধু আইলে সকালে।
প্রভাতে হেরিলাম মুখ দিন যাবে ভালে ॥"

গানটির শুরুতেই তেওটের ঠেকা রেখেই 'ঘটকালি' শুরু হয়—

"কে তুমি রাম নও, তোমায় চিনতে পারি নাই বলে
মনে কিছু কইরো না, তুমি রাম নও, তবে তুমি
কি সেই গুণের বধু, আমার প্রাণের
বধু, প্রভাতকালে যদি এলে নাথ, তবে আর
ওখানে দাঁড়ায়ে কেন'—
এর পরেই শুরু হ'ল—'ভালই হইল আরে··· ।

'কলহান্তরিতা' পর্যায়ের প্রসিদ্ধ একতালি গান—

"হরি বড় গরবী গোপীমাঝে বসই।
ঐছে করবি যৈছে বৈরী না হাসই ॥"

অর্থাৎ সখী যখন কৃষ্ণ অন্বেষণ করতে যাবেন তখন সখীকে সাবধান করে দিচ্ছেন শ্রীমতী রাধারানী। কিন্তু গানটির শুরুতেই 'ঘটকালি'

"দূতি যাবি যারে, কৃষ্ণ আনতে যাবি যারে,
যাবি যা রে, যেয়ে যেন আগে কথা,
গরবী বধুর সনে যেন আগে কথা কহিস্
না, সে যে আমার আমার হরি'

এমন অসংখ্য উল্লেখযোগ্য নিদর্শন আছে প্রারম্ভিক 'ঘটকালির'। আবার গানের মাঝখানে যে 'ঘটকালি' ব্যবহার তাও অপূর্ব। যেমন, দানলীলায় আড়তালের প্রসিদ্ধ গান—"দানী দেখি কাঁপিছে শরীর"

মো যদি জানিতাম আগে এ পথে কণ্টক আছে
তবে ঘরের না হইতাম বাহির।
ঘর হতে পা বাড়াতে ও চাল ঠেকিল মাথে
হাচি জ্যাঠি না মানিলাম বাধা।
হরিণী পলাইয়া যাইতে ঠেকিল ব্যাধের হাতে
তেমনি ঠেকিয়া গেল রাধা।"

ঝাঁতি তালের এ শেষাংশটি গেয়ে আখর জোড়া হয়—"এইত নিয়ম, এই পথের।" এরপরে 'ঘটকালি' শুরু হয়।

(ক) "একবার যদি মনে করা হইল শ্রীধাম বৃন্দাবনে যাব,
শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ দরশন করব, সাথে সাথে

শত-বাধা আমায় এমন করে ঘিরে ফেলে,
যে তখন ব্রজে যাওয়া ত দূরের কথা, আমার
প্রাণ নিয়ে টানাটানি—আখর চলবে—
'এইত নিয়ম এই পথের'।

(খ) "কিন্তু হা রাধে, এমন শত শত বাধা বিঘ্নকে
না মেনে কেউ যদি তোমার মত গোবিন্দ
যা কর বলে ঘর হতে পা বাড়ায়
তবে তার আর"—আখর শুরু—
বেশী দূরে যেতে হয় না।
(তার লাগি) পথের মধ্যে দাড়ায়ে থাকে,
দুই বাহু পসারিয়ে।

আখর আর ঘটকালি মিলেই হল পালা কীর্তন। কীর্তনীয়ারা সকলে সাহিত্যিক ছিলেন না কিন্তু তাঁদের সাহিত্যিক অভিজ্ঞতার সংগে অন্তর মিশে গিয়ে ব্রজরসের যে অপূর্ব অনুভূতির সৃষ্টি হয়ে থাকে তাকে সুর ও তালের নিবন্ধতার মধ্যে অভিনব ভাষা সংকলনের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। অন্যান্য রাজ্যেও কীর্তন প্রচলিত আছে কিন্তু সেখানে এ আখরগুলি গানের অংশ বলেই চিহ্নিত করে রাখা আছে। ওড়িশার কীর্তনে বা মণিপুরের কীর্তনে আখর হল গানের সংশ্লিষ্ট অভিন্ন পদসমন্বয় মাত্র, সেখানে সৃষ্টির দায়িত্ব গায়কগণ বেশী নিতে চান না। কিন্তু বাংলার গায়কদের ঐ সাহিত্য সৃষ্টি একটি পেশা এবং সহজ পেশা কারণ আখর সংযোজনার পদ্ধতি বাংলার মাটিতেই সৃষ্টি হয়েছে তাই এখনও বাঙালী গায়কগণ অনায়াসে আখর সংযোজন করে যেতে পারে। 'আখর' ও 'ঘটকালির' ভাষা, অলংকার বা ছন্দের সাহিত্যিক পর্যায়ে আলোচনার সূত্রে অনেক নূতন তথ্যের সন্ধান পাওয়া যেতে হতে পারে। তবে তা বিশেষ গবেষণাসাপেক্ষ।

৪। পর্যায়

পালাকীর্তনের পর্যায়-প্রকরণ বলতে ঘটনা বিশ্লেষণের শৈল্পিক শৈলী, তথ্যের অভিনবত্ব সংযোজন এবং নূতন পদাবলীর সংকলনকে বোঝায়। অর্থাৎ একই লীলাপ্রসঙ্গের গান বিভিন্ন গায়কের বিভিন্ন ধরনের পর্যায়। যেমন 'দান-লীলা' ক্ষেত্রে একটি পর্যায় শুরু হয় 'বরজবালক সংগে' ধরাগান দিয়ে অর্থাৎ নায়ক শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠের খেলাতে আজ মনোনিবেশ করতে পারছেন না তাই দান-লীলা প্রকট করবার জন্য যথাবিহিত ব্যবস্থা নিচ্ছেন। অন্য আর একটি পর্যায়ে আছে—গিরি গোবর্ধন যজ্ঞ হবে—এমন শুভসংবাদ নিয়ে যোগমায়াস্বরূপিণী বুড়ীমাই ঘাটে উপস্থিত। যোগমায়ার সঙ্গে সখীসহ রাধারানীর অভিসার

ইত্যাদি। দু'টি বিষয় মূলত এক কিন্তু পর্যায়প্রকরণ ভিন্ন। পর্যায় তৈরীর ক্ষেত্রে সকলেরই কমবেশী বৈশিষ্ট্য থাকে। পর্যায়ভেদেই লীলার আকর্ষণ বেশী হয়। বিশেষভাবে বলা হয়—যামিনী মুখুজ্যের পর্যায়, বাঁড়ুজ্যে মশাইয়ের পর্যায় ইত্যাদি বিভিন্ন গাইয়েদের বিভিন্ন ধরনের পর্যায় থাকে। ফলত এক মাথুর পালায় কমপক্ষে ভাবী, ভবন নিয়ে মোট চারটি পর্যায় আছে। দানে তিনটি, মানেই আছে সবচেয়ে বেশী। কলহান্তরিতা লীলার একটি পর্যায়ে এক অন্ধমুনির উপাখ্যান সংযোজন করা হয়। কৃষ্ণ উপস্থিত হয়ে রাধাকুণ্ডের তীরে অপেক্ষা করছেন। ঐখানে এক অন্ধমুনি বসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের কথোপকথনের সূত্রে পর্যায়ে অভিনবত্ব সৃষ্টি করা হল :

"কুণ্ড পূর্বদিকে এক অন্ধমুনি বৈসে।
রাধা রাধা নাম জপে মনের হরিষে॥
রাধা নাম শুনি শ্যাম বাহির হইল।
মুনির অগ্রেতে হরি আসি দাঁড়াইল॥
মুনি কহে কেবা তুমি অগ্রেতে আইলা।
নন্দের নন্দন বলি পরিচয় দিলা॥
তাহা শুনি সেই মুনি বসে পাছু হইয়া।
হাসিয়া কহেন তখন শ্যাম বিনোদিয়া॥
কেনবা ফিরালে বদন কহ তাহা শুনি।
মুনি কহে রাধা অপরাধী ইত জানি॥
মুনি কহে কৃষ্ণ তুমি সর্বশক্তিধর।
আমার অন্ধতা দূর যদি তুমি কর॥
তোমার কৃপাতে আমি যদি নাম পাই।
রাধা অপরাধীর বদন হেরব এমন নয়নে কাজ নাই॥"

৫। কাটান

কাটান শব্দটি কীর্তনে একটি সমবেত প্রক্রিয়ার দ্বারা সৃষ্ট পরিবেশকে বোঝায় যে পরিবেশে শ্রোতা মূলগানের আবেশ মূলঠেকার আস্বাদন থেকে সাময়িক বিচ্যুত হন। মূলগায়েন পদকর্তা বিরচিত মূল পদ থেকে সরে গিয়ে যথাবিহিত আখর সংযোজন করেন স্তরে স্তরে আর সেইসঙ্গে বাদক প্রয়োজন অনুযায়ী ছোট ছোট হাতের 'লহর' নামক সংস্করণগুলি প্রয়োগ করতে থাকেন। লহরের সূত্রে আসে দ্রুততা আর আখরের সূত্রে আসে বিষয়ের সুবোধ্যতা, তাই কাটানের পরিবেশটি শ্রোতাদের কাছে খুবই কাম্য পরিবেশ। এ সময় বাদকের স্বাধীনতা ঘোষিত হয়। তাই বাদক সুবিধামত আনন্দদায়ক বাদ্য প্রয়োগ করে, এই পরিবেশটিকে মাধুর্যমণ্ডিত করে থাকেন। গানের আখরকেও কাটান

বলা হয় আবার বাজনার লহরাকেও কাটান বলা হয়। কাটানের স্তর প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ইত্যাদি আছে। তাছাড়া বড়গানে লঘু কাটান, গুরু কাটান বলে দু'রকমের কাটান আছে। লঘু কাটানে টুকি বাজনার পর 'লম্টন হাত' বাজাতে হয়। আবার গুরু কাটানের ক্ষেত্রে লহর, হাত, ঘাত ও মাতন পর্যন্ত বাজাতে হয়। মূলগানের চেয়ে শ্রোতারা কাটানেই বেশী আনন্দ পায় তাই কাটান হল কীর্তন গানের একটি আকর্ষণীয় অংশ।

৬। ভনিতা

কীর্তনের মূলপদগুলি বৈষ্ণব মহাজনগণ লিখেছেন এবং তাঁদের নাম পদের শেষ স্তবকের সাধারণত শেষ চরণে বা অন্য কোন চরণে লেখা থাকে। এই নামোল্লেখের অংশটিকেই বলা হয় ভণিতার অংশ। এর থেকেই রচয়িতার নাম সুস্পষ্ট পাওয়া যায়। যেমন—

"ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারী।
সুজনক দুঃখ দিবস দুই চারি॥"

আবার অনেক পদ আছে যার ভণিতা অংশে দুইজন রচয়িতার নাম থাকে। যেমন—

১। "বিদ্যাপতি কহ নিকরুণ মাধব
গোবিন্দ দাস রসপুর॥"

২। "রায় সন্তোষ মধুপ অনুসন্ধিত
নিন্দিত দাস গোবিন্দ॥"

এসব ক্ষেত্রে প্রকৃত পদকর্তা নির্ণয় করা চিন্তার বিষয়। কোন কোন পদকর্তা আবার দুই নামে পরিচিত থাকেন। যেমন—নরহরি চক্রবর্তীর অপর নাম ঘনশ্যাম দাস; শ্রীখণ্ডের কবিরঞ্জন যাঁর অপর নাম ছোট বিদ্যাপতি ইত্যাদি। ভণিতায় পদকর্তার নামটি উচ্চারণকালে প্রথা অনুযায়ী হাতজোড় বা মাথা নিচু করে, বা প্রণাম করে পদরচয়িতাকে সম্মান জানাবার বিধি প্রচলিত আছে। কোন কোন গানে আবার ভণিতা উচ্চারণ করলে সে অংশে মাতন বাজাতে হয় এমনও প্রচলন আছে।

৭। আপত্তন

আপত্তন হল সুরের আলাপ। কীর্তন গান শুরু হবার আগে, সবে মিলে বিধিসম্মত উপায়ে 'আ' 'আ' ইত্যাদি স্বরবর্ণের সাহায্যে নিম্নতম পর্যায় থেকে ক্রমশ উচ্চতম পর্যায় পর্যন্ত নানাবিধ গমকের সাহায্যে স্বর আলাপ করে একটি সুরকে মূর্তিমান করে থাকেন। শাস্ত্রে একেই বলা হয়—

"আলাপি আলাপি রাগ মূর্ত্তিমন্ত কৈল।"

আলাপের সম্পূর্ণ পদ্ধতিটিকেই বলা হয় আপস্তন। আপস্তনের মূলত তিনটি ভাগ—১। পূর্বরূপ, ২। আলাপচারী, ৩। জমাট। আলাপের প্রথম অংশটি সাধারণত শুরু হয়—মধ্যসপ্তকের সা থেকে। ক্রমশ এই আলাপ রে গা পর্যন্ত গিয়ে আবার নিচের দিকে নি ধা পর্যন্ত আসে আবার উপরে মা পর্যন্ত গিয়ে নেমে আসে উদারার পা পর্যন্ত আবার ক্রমশ স্তরে স্তরে উপরে মধ্যসপ্তকের পা পর্যন্ত গিয়ে আবার নেমে সা-এ এসে যেন বিশ্রাম চায়, তখন সঙ্গে সংগে খোলে একটি মূর্চ্ছনা বাজিয়ে এই অংশটির সমাপ্তি ঘোষণা করতে হয়। এটি হ'ল 'পূর্বরূপ'। সংগে সংগেই ক্রমশ করতালের তিনটি করে আঘাত দেখিয়ে 'আ' 'আ' 'আ' এমন তিনটি করে বর্ণ উচ্চারণ করে এক স্বর থেকে অন্য স্বরে নানারকম গমকের আশ্রয়ে ক্রমশ উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করে আলাপ এগিয়ে যায় চড়ার দিকে। এর গতি কমপক্ষে তারার পঞ্চম পর্যন্ত। করতালের তিনটি আঘাতের সংগে মিলিয়ে খোলবাদক দাঁড়িয়ে ডাইনায় তিনটি করে আঘাত করে থাকেন—'তা' 'তা' 'তা'। কখনও সুরের গতি বুঝে বাঁয়া সংযুক্ত জোরালো শব্দও করে থাকেন। ঘুরে এসে সুর যখন মন্দ্রসপ্তকের পঞ্চমকে আশ্রয় করে বিশ্রাম চায় তখন একটি মূর্ছনা দিতে হয়। মধ্যসপ্তকের পা-কে সুর করে আবাহন জমাট শুরু হয়। বোল থাকে—"ও এস হে, ও গৌর হে, গৌর হে, ও, গৌর হে এ এ এ এ এ এ এ এ ও গৌর হে—এই শেষ জমাটে মাতনের তিন আঘাতে করতাল বাজাতে হয় আর কতকগুলি নির্দিষ্ট খোলের বোল পর পর বাজিয়ে বিলম্বিত ঘরকে একেবারে দ্রুত লয়ে পর্যবসিত করতে হয়। এটিই হল আপস্তনের জমাট। ঐ জমাটির বাজনা—

জাঝিনাঝি, নাগ জাজা ঝেইয়া জাঝেই তা জাঝি নাঝি নাগ জাজা ঝেইয়া জাঝেই তা জাঝি নাঝি নাগুরের জাঝি নাঝি নাগ জাজা ঝেইতা তাখেটা থেইতা তা জাঝি নাঝি নাগ জাজা ঝেইয়া, জাঝেই তা তাথি নেতা খেটাতিনি খেটা তাখি তা— এইভাবে মাত্রা বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন ছন্দে বাজানো হয়। যেমন—

১। ধেই তাতা খেটা তাতা খেটা তাখি তা

২। দাগুরের ধেই ইন্দা দাধেই য়া

৩। দাঘিনাগ দাঘিনাগ দাঘিনাগ দাঘিনাগ

ইত্যাদি নানাবিধ বাদ্যান্তর মাতন দিয়ে মূর্ছন দিলে আপস্তন শেষ। আপস্তনের পরেই শুরু হয় গৌরচন্দ্রিকা। আপস্তনের সময় থেকেই গায়ক বাদক সকলেই

দাঁড়িয়ে পড়েন। আপত্তনে নানাবিধ সুর ফুটে ওঠে অবশ্য নির্দিষ্ট হিন্দুস্থানী বা দক্ষিণ ভারতীয় কোন রাগের আলাপ এর মধ্যে নেই। তবে এর সুত্রে একটি সুরের আমেজ সমগ্র আসরকে প্রভাবিত করে। বিভিন্ন কালীন বা বিভিন্ন লীলা-প্রসঙ্গের আপত্তনের সুরের পার্থক্য আছে। যেমন কুঞ্জভঙ্গের আপত্তন, দানের আপত্তন, রূপের আপত্তন বা মাথুরের আপত্তন। এই আপত্তন প্রকরণ সম্পূর্ণই গড়াণহাটি প্রকরণ এবং প্রাচীন 'রাগালপ্তির' ধারা সমন্বিত। রাগগীতির বিশেষত ধ্রুপদের আলাপের সঙ্গে এই আপত্তনবিধির কিছুটা প্রথাগত মিল আছে। আপত্তনের বিষয়টি ছিল প্রাচীনকালের আবশ্যকীয় বিধি। কিন্তু বর্তমানে এর অস্তিত্ব নাই বললেই চলে।

৮। সুরমিল

গৌরচন্দ্রিকা গান শেষ হলে অর্থাৎ কাটা সমের জমাট, বাজিয়ের বাজনা ইত্যাদি শেষ হলে গায়ক বাদক সব বসে পড়েন। এরপর নূতন করে আবার সকলে মিলে বিশেষ ধরনের সুরের আলাপ করে থাকেন। এ আলাপের একটি নির্দিষ্ট ধারা আছে। এ ধারা মেনে আলাপটি করলে এটিকে বলা হয় 'সুর মিল'। আপত্তনের আলাপটি যেমন রাগালপ্তির অপভ্রংশ স্বরূপ তেমন সুরমিল হল প্রাচীন রূপকালপ্তির অপভ্রংশস্বরূপ। সুরমিল হয় নির্দিষ্ট সাত মাত্রার একটি তালের দু আবর্তে প্রথম বন্দেজ বা স্থায়ভঞ্জনী, এরপরে এক আবর্তে বাট করে রূপকভঞ্জনী বা সুরমিল জমাট করা হয়। 'রেথে তা না রেথে রিনা' ইত্যাদি নির্দিষ্ট বর্ণ ব্যবহার করা হয় সুরমিলে। তালটি ছোট দশকোশীর মত, জোড়াতেই গান ধরা। গানের বিভাগটি নিম্নরূপ—

(রেথে)	৩	৪	০	+	০	২	০
	তায়	নায়	নায়	তায়	নায়	নায়	নায়
	৩	৪	০	+	০	২	০
	নায়	নায়	নায়	তা	আয়	না আয়	রেথে

এভাবে শুরু করে পরে এক আবর্তে ক্রমশ চড়ার দিকে নিয়ে যাওয়া হয়। এবং শেষে বাট করা হয়—

৩	৪	০	+	০	২	০
তায়	নায়	রেথে	রিনা	রিনা	রিনা	রিনা

এর উপরেই জমাট বাজানো হয়। 'সুরমিলে' অনেকটা দেশ রাগিণীর আমেজ পাওয়া যায়। সবচেয়ে চড়া মাতন হয়ে যাবার পর ক্রমশ সুরটি টেনে নিচের দিকে নিয়ে আসা হয়, তখন বাজিয়েকে নির্দিষ্ট বাজনা বাজাতে হয় এবং শেষ পর্যায়ে মূর্চ্ছন ব্যবহার করে সুরমিল সমাপ্ত হয়। শেষ পর্যায়ের বাজনা—

১	+ দিদিধি	0 তেটেতাক	২ দিদিধি	0 তেটেতাক
	৩ দিদিধি	৪ তেটেতাক	0 তেটেতাক	
২	+ জাগুর গুরজা	0 গুরগুর জাগুর	২ জাগুর গুরজা	0 গুরগুর জাগুর
	৩ জাগুর গুরজা	৪ গুরগুর জাগুর	0 গুরজা গুরগুর ।	

এরপর মূর্চ্ছন। এই সুরমিলের প্রচলন এখনও আছে। অনেক গায়ক এটি করে থাকেন।

৯। ভাঁতি

কীর্তনের গানের ক্ষেত্রে রাগ-রাগিণীর কোন সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া না গেলেও পূর্ণাঙ্গ একটি সুরের মূর্চ্ছনা গানের সঙ্গে সঙ্গে ফুটে উঠে। এ মূর্চ্ছনাটি আবার শ্রোতার মনে যে সুরের প্রভাব সৃষ্টি করে তাকেই বলা হয় ভাঁতি। এই ভাঁতির কোন নাম নাই। গানের নামেই ভাঁতির নাম। যেমন 'নীলরতন গানের ভাঁতি', 'স্বর্ণবর্ণ গানের ভাঁতি' এমন বিভিন্ন গানের নামে ভাঁতির নামকরণ। তাছাড়া গায়কের গলায় আশকেও ভাঁতি বলা হয়। সুরের বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন মানসিক প্রতিফলন হয়ে থাকে। যে অংশ সুখপ্রদ এবং কোমলতাপূর্ণ তারই প্রভাব গানের ভাঁতি ফুটিয়ে তোলে। একটি প্রচলিত প্রবাদ আছে—'রাঢ় দেশের ভাঁতি আর কথায় সুর আপনি ফোটে'।

১০। ভিয়ান

প্রতিটি গান পালা প্রকরণে সংযুক্ত করে গাইবার আগে ঠিক তদনুরূপ পরিবেশের মৌখিক বর্ণনা করে নিতে হয়। তাহলে পরবর্তী উপস্থাপ্য গানটির উপলব্ধি সহজ হয়। কথাটি হল রসের ভিয়ান কিন্তু এর সঙ্গে সুরের ভিয়ান এবং কথার ভিয়ান আপনা থেকে যুক্ত হয়ে থাকে। সুরের ভিয়ান বলা হয় সুরের আলাপ ও বিস্তারের মাধ্যমে পরবর্তী গানের সুরের পরিবেশটি তৈরী করা—সেই সঙ্গে পূর্ববর্তী সুরের ছায়াকে কাটিয়ে দেওয়া। ভিয়ান হল প্রস্তুতিপর্ব। পূর্ববর্তী গানের সর্বশেষ বক্তব্যের সঙ্গে পরবর্তী গানের প্রথম বক্তব্যের সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য অন্তর্বর্তী কোন অতিরিক্ত কথা সংযোজন করতে হয় নচেৎ পদাবলীরই কোন নির্দিষ্ট পদ বা পদ্যাংশ সুর করে বলে পদের ভিয়ান করতে

হয়। তাই সুরের ভিয়ান এবং পদের ভিয়ান উভয় মিলে হয় রসের ভিয়ান। পরিবেশ প্রস্তুতিকল্পে অন্তর্বর্তী সংযোজনকেই 'ভিয়ান' বলা হয়।

১১। কোণাকুণি

সুরের 'কোণাকুণি' কীর্তনের বড় বড় কিছু গানে বিশেষ সৌন্দর্য সৃষ্টি করে। যখন কোন একটি নির্দিষ্ট স্বর থেকে শুরু করে শ্রুতির উপর দিয়ে খুব সূক্ষ্মভাবে সুরকে এগিয়ে নিয়ে পরবর্তী কোমল স্বরকে স্পর্শ করে তার পরবর্তী স্বরে গিয়ে পৌঁছায় তখন তাকে বলে 'সুরের কোণাকুণি'। নিতান্তই শ্রুতির আরোপে এবং তিন বা চার স্বর পরিব্যাপ্তির ত্বরিৎগতিসম্পন্ন সূক্ষ্মতম মীড়ের রূপকে 'কোণাকুণি' বলা হয়। এ কোণাকুণি-সুরের প্রয়োগ অনেক গানেই আছে। যেমন—

১। 'চন্দ্রবদনী' গানের 'মৃগ ন—য়নী' 'ন—' এই অংশটিতে কোণাকুণি।

২। 'অরুণিত' গানে—'ওমনি ম অ—অনু' অংশটিতে।

৩। 'জাগহু বৃষভানু' গানে 'মো——হন' এই অংশটিতে। তবে এই অংশের কোণাকুণি আছে অবরোহক্রমে। সাধারণত কীর্তনের 'কোণাকুণি'র প্রয়োগ হয় আরোহক্রমে। হিন্দুস্থানী রাগসংগীতের পরিভাষায় পরিচয় দিতে গেলে কনু স্বর বলা ঠিক নয়—বরং মীড় বলা কিছুটা সংগত।

১২। গমক

কীর্তন গানে গমকের প্রাধান্য খুবই বেশী। গমক বলতে স্বরের কম্পন যার দ্বারা গায়কের মনের বিশেষ একটি অনুভূতি আকস্মিক প্রকাশ পেয়ে যায়। এই প্রকাশে গায়কও যেমন তৃপ্তিবোধ করেন শ্রোতারাও তেমনি আনন্দ পেয়ে থাকেন। কীর্তন ভাবপ্রধান গান, তাই ভাবপ্রকাশের সবরকম উপকরণ যেমন গমক, মীড় প্রভৃতির খুব বেশী ব্যবহার আছে। সাধারণ গমকের মধ্যে 'আহত' গমকের প্রয়োগ খুবই বেশী কারণ বড়গানের মাত্রা ধরে রাখার জন্য যে স্বরবিক্ষেপ ব্যবহার হয় সেক্ষেত্রে আগের বা পরের স্বরটিকে স্পর্শ করে মূল স্বরটিকে স্থাপন করা হয়। গায়ক অনেক সময় মুখ বন্ধ করে বিশেষ ধরনের গমক ব্যবহার করেন—একে বলা হয় 'মুদ্রিত' গমক। এই মুদ্রিত গমক কীর্তনে খুবই ব্যবহার আছে। অনেক সময় মাত্রা ভেঙে ভেঙে অর্ধমাত্রা পরিমাণ স্বরের কম্পন গমকের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়ে থাকে প্রাচীন 'লীন' এবং 'কম্পিত' গমকের মত। আবার অনেক সময় বিলম্বিত লয়ের গানে ধীরে ধীরে ঠিক পরিমাণমত স্বর কাঁপিয়ে গমক ব্যবহার করা হয়। একে বলা হয় স্বরের দোলন, অনেকটা প্রাচীন-কালের আন্দোলিত গমকের মতো। অনেক সময় বেশ কয়েক মাত্রা জুড়ে লম্বা লম্বা গমক স্বরভেদ করে আরোহক্রমে এগিয়ে চলে, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে

অবরোহক্রমে নেমে আসে। এ গমকগুলি চার মাত্রা এমনকি আট মাত্রা ধরে চলে বিশেষত ধরা, বড়দশকোশী, কাটা ধরা এবং দাসপ্যারী তালে। প্রাচীন 'উল্লাসিত' এবং 'মিশ্র' গমকের ধারা পাওয়া যায়। এ ছাড়া আরও নানা ধরনের গমক আছে যেমন বাষ্পাকুল ভাবের গমক, স্ফুরিত গমকের অভিব্যক্তি ইত্যাদি। এই গমকগুলি সম্পর্কে বিভিন্ন মত আছে। কেউ বলেন এর কোন অর্থ হয় না, কেউ বলেন বেসুরো ইত্যাদি। কিন্তু প্রকৃত গুণী ব্যক্তিরা এই গমকগুলিকে খাঁটি ক্ল্যাসিক্যাল গমকের প্রকৃত রূপ বলে স্বীকার করেছেন। কীর্তনের স্বর প্রয়োগের আকর্ষণীয় এইসব বিধিগুলি বাংলাদেশের সব রাগসঙ্গীতের বড় বড় ওস্তাদগণ শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন—একথা অনেকেই জানেন।

১৩। চিতান

'চিতান' পরিভাষাটি কীর্তনের ক্ষেত্রে গানের 'অন্তরা' অর্থটিই প্রকাশ করে। 'চিতান' অর্থে চড়ার তান। যখন নীচু পিচে গান থাকে তার মধ্যে একটি নির্জীবতা এসে যায়। এই নির্জীবতা কাটিয়ে সুরের দাপটে উজ্জ্বলতা স্থাপন করবার জন্য গানের আশ্রয়ে বা বিস্তারে গানকে চড়ার দিকে তান দেওয়ার নাম চিতান। যখন কোন পদকে আশ্রয় করে একজন দোহার বেশ বিস্তার করছেন, তাঁর বিস্তার শেষ হতে না হতেই মধ্য সপ্তকের পা-কে সুর করে আর একজন দোহার আরোহণ করে গিয়ে সা-তে দাঁড়িয়ে গেলেন। তারপর ক্রমশ চড়ার চিতান দিয়ে তারার পঞ্চমে এমনকি ধৈবতে পর্যন্ত দাঁড়িয়ে বিস্তার করেন এবং নামতে নামতে এসে আবার মধ্য সপ্তকের পঞ্চমে দাঁড়ান। চিতান প্রধানত সুরের বিস্তারকে উপলক্ষ করেই হয় তবে এর সঙ্গে দোহারগণ কথা, পয়ার ইত্যাদি সংযোজন করে এটিকে আকর্ষণীয় করেন। গানে হারমোনিয়মের বা কোন সুর-যন্ত্রের ব্যবহার না থাকায় এসব ক্ষেত্রে অনেক সময় সপ্তকচ্যুত হবার সম্ভাবনা থাকে, এবং অনেকসময় হয়েও যায়। কিন্তু আবার যথাস্থানে ফিরে এসে সব ঠিক করে নেয়।

১৪। হাত

শ্রীখোল বাদ্যের প্রকরণজনিত একটি পরিভাষা। শ্রীখোল বাজাবার ডাইনার হাত তিন রকম—১। তিন আঙুলের চাপড় (চাপা কিম্বা খোলা) ২। দু' আঙুলের টুকি (তর্জনী আর মধ্যমা) এবং ৩। পাঁচ আঙুলের বাজ—দুই আঘাতে, (চার আঙুলের এক আঘাত আর অংগুষ্ঠের এক আঘাত)। তাছাড়া বাঁয়ার ক্ষেত্রে খোলা চাপড়, গুপো, গাদা, থাবা। ঝা ধা ঘে ইত্যাদিতে খোলা, ডাইনার টুকি বাদ্যের সঙ্গে ব্যবহার হয় বাঁয়ার গুপো, ঠেকার সময় বাঁ হাতের কনিষ্ঠার

নিম্নাংশের চেটোর উন্নত অঞ্চল দিয়ে বাঁয়ার গাবে চেপে শব্দ তোলার নাম গাদী, আর চেটোর উপরাংশের উন্নত অঞ্চলে জোড় দিয়ে সমগ্র হাতটি পুরোপুরি বাঁয়ার মাঝখানে ফেলে শব্দ করার নাম থাবা। তবে 'হাত' বলা হয় একধরনের বোলকে যে বোল শুধু কেবল ডান হাতে পাঁচ আঙুলের চেটোর সাহায্যে তুলতে হয়, সেইসঙ্গে বাঁয়া থাকে খোলা। বাদনকৌশলের সময় হাতের কব্জি আপনা থেকেই ঘুরতে থাকে। হাতের বাজনাগুলি খুব বড় বা বেশী মাত্রার হয় না। হাত খেলানোর বাজনা বলেই এগুলোকে 'হাত' বলা হয়। এগুলি অনেক বড় বাদ্যের অংশ হিসাবেও ব্যবহার হয়। অনেকটা তবলার টুকরার মত। হাত' বাদ্যে কোন তেহাই বা মান জোড়া থাকে না।

হাতের উদাহরণ—

তেরে খেটা তেরে তেরে খেটা তাক তেরে খেটা

নিং তাক তেরে তেরে খেটা তাক তেরে খেটা

নানাভাবে হাতের কব্জি ঘোরাবার ব্যবস্থা জড়িয়ে যেসব বাজনা বাজাতে হয় তাকে বলা হয় 'পেছ' বাজনা বা 'পেছের হাত'। তাছাড়া টুকি সংযুক্ত বড় হাত হলে তাকে বলা হয় 'লপ্টান হাত'। আবার হাত সাধার সাধারণ সব বোলকেই বলা হয় 'হাতুটি বাদ্য'। সুতরাং 'হাত' হ'ল খোলের একপ্রকার বাদ্য যা সাধারণত সঙ্গতে কাটানের সময় লহরের পর বাজানো হয় অথবা জুয়ানী হাতুটিতে বাজানো হয়।

১৫। ঘাত

ঘাত হল শ্রীখোলের খুব জোরালো বাদ্য। ডাইনা বাঁয়া সমানভাবে ব্যবহার করে বিভিন্ন ছন্দের সমন্বয় করে, কোন একটি তালে ব্যবহারের উপযোগী ঐ তালের এক বা একাধিক আবর্তের মাত্রাসংখ্যার সমান করে, বাদ্যের শেষাংশে তেহাই বা মান যুক্ত করে যে বাজনা বাজানো হয় তাকেই বলা হয় ঘাত। ঘাত বাজনা একদিকে যেমন জোরালো, অন্যদিকে তেমন আকর্ষণীয়। এ বাজনা সঙ্গত্ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে হয় লহরের পর মাতনের মুখে। গৌরচন্দ্রিকা শেষ অংশে জমাট বাজাবার সময় দীর্ঘ সময় ধরে বাদক নানা ধরনের ঘাত বাজিয়ে আসরকে মাতিয়ে তোলেন। এর মধ্যে এক ধরনের ঘাত অর্থাৎ 'ঝা ঝা ঝা ঝা' ইত্যাদি গুরুগম্ভীর বাদ্যঝঙ্কার দিয়ে শুরু করা হয় সেগুলিকে বলা হয় 'মঙ্গল ঘাত'। বড় দশকোশীতে এই মঙ্গল ঘাতের প্রয়োগ আছে।

সাধারণ চৌদ্দ মাত্রার একটি ঘাতের উদাহরণ—

+	0		0		0
ঝাওন	ঝাওন	খিনি	খিনি	তাখি	তেরে খেটা

২ ০ ০ ০
তা খেটা ঝা ওন খিনি খিনি তাখি তেরে খেটা.

৩ ০ ৪ ০ ০ ০
ঝাওন ঝা ওন খিনি খিনি তাখি তেরে খেটা তাখি তেরে খেটা নেতা

+ ০ ০ ০ ০ ২
ঘেঘে ঘে ঘে তেটে তেটে তেটে তেটে থো থো থো থো

০ ০ ৩ ০
তেটে তেটে তেটে তেটে খেটা তাখি তেরে খেটা

৪ ০ ০ ০ +
নিং তাক তেরেখেটে ঝাওন ঝা ওনজাজ (ঝা)

১৬। মাতন

কীর্তনের সংগে শ্রীখোল সংগতের কতকগুলি স্তর আছে। মূল গানের সংগে প্রথমে ঠেকা বাজাতে হয়, মতান্তরে যাকে 'লওয়া' বলা হয়। গায়কের আখর সংযুক্তি শুরু হলে বাদকের 'লহর' সংযুক্তি শুরু হয় এবং মূল ধারা থেকে উভয়েই ক্রমশ সরে আসতে থাকেন বলে এ পর্যায়কে বলা হয় 'কাটান'। কাটানকে পরিণত রূপ দিতে হাত, ঘাত ইত্যাদি বাজানো হয় এবং সর্বশেষ পর্যায়ে বাঁয়াপ্রধান এক ধরনের তালভেদে নির্ধারিত জোরালো বাজনা বাজিয়ে আসরকে মাতিয়ে তোলা হয়—এই শেষ ধরনের মাতানো বাজনাকে বলা হয় 'মাতান'। মাতান ৩।২ ছন্দেও হয় আবার ৩।৪ ছন্দেও হয়। যেমন—

জাজাঘে না ঘেনা জা ঘেনা ঘেনাও···

ইত্যাদি ছন্দ। মাতন হল কীর্তন সংগতের আবশ্যকীয় অংগ অবশ্য বর্তমানে রেডিও, রেকর্ড, টিভি ইত্যাদির মাধ্যমে সম্প্রচারের সূত্রে মাতনের গুরুত্ব কমে গেছে এবং ব্যবহারও নাই। তবে আসরের গানে বিশেষত দলবদ্ধ গানে মাতন বাজাতেই হয়। এ সময় খোল, করতাল এবং উচ্চকণ্ঠের গান সমভাবে জেগে ওঠে বলে ঐ সময়েই কীর্তনের ধ্বনি সৃষ্টি হয়।

১৭। মূর্ছন

শ্রীখোল বাদ্যের প্রাচীন পদ্ধতিতে সংগতের শেষে তবলার মতো তেহাই দেবার নিয়ম নেই। তেহাইর পরিবর্তে বিশেষ এক ধরনের সমাপ্তিসূচক বাজনা প্রয়োগ করা হয় তাকেই বলা হয় 'মূর্ছন'। বিভিন্ন তালের মূর্ছন বিভিন্ন ধরনের, বড় তালগুলির ক্ষেত্রে মূর্ছনের পর 'মান' বলে একটি বাজনাও সংযুক্ত করা হয়। বড় ঘরের তালে সাধারণত যে বোলটি ব্যবহার করা হয় তা হল—

ধেনে তা-খেটা তে নে তা — (মূর্ছন)

+
খিৎ ঝা তে না তাখি (তা) (মান)

মধ্যম দশকোশীর ক্ষেত্রে—

ধো- খেটা তাদ ধো- তাতা খেটা ঘেনা তিনি

দা ঘে নে তা ঘে না উ র র দাদ্‌দা আদ্‌দা

জা জ জা আজ জা (মূর্ছন)

+
খিৎ ঝা তেনে তাথি (তা) (মান)

প্রতিটি তালেরই নির্দিষ্ট মূর্ছন বাদ্য আছে সেটি না বাজালে গায়ক থামবে না। এখন অবশ্য তেহাই দিয়ে, অন্য বাজনা দিয়ে জোর করে থামিয়ে দেওয়া হয় কিন্তু এটা রীতিবিরুদ্ধ।

১৮। হাতুটি

'হাতুটি' হল শ্রীখোলের বাজনা। সাধারণত হাত সাধার যে-কোন বোলকেই হাতুটি বলা হয়ে থাকে, কিন্তু 'হাতুটি' শব্দটির মূল ব্যবহার হল কীর্তনের প্রারম্ভে প্রাচীনতম ধারা অনুসারে মাঙ্গলিক নির্ঘণ্ট হিসাবে আহ্বানসূচক শ্রীখোল বাদ্যের প্রণালীবদ্ধ বোল বাদনের রীতি স্বরূপ। আসরে সকলে বসার পরই শ্রীখোল এবং করতাল বাজনা শুরু হয়—এ বাদ্যধ্বনির ইঙ্গিতে সব রকমের শ্রোতা আকৃষ্ট হ'ন এবং আসরে যোগদান করেন। খেতরী মহোৎসবে 'দেবীদাস' প্রথমে এই খোল বাদনের মাধ্যমে উৎসবের কীর্তনের সূচনা করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রবর্তিত শান্তিপুরের অধিবাস কীর্তনে গোবিন্দ প্রথম এই মৃদঙ্গ বাদ্য শুরু করেন। তাই এই হাতুটি বাজনার মাঙ্গলিক রীতিটি প্রাচীনতম। এই হাতুটি বাজনার মূল তিনটি ভাগ—১। জোয়ানী, ২। হাতুটি এবং ৩। মেল বাদ্য।

জোয়ানী বাদ্য প্রকরণটি শুরু হয়—

ঘি- তেটে ঘে না ঝা- ঘি-তেটে ঘে না ঝা

ঘে না ঝা—এই বোল দিয়ে॥ বহুবার বাজাতে বাজাতে রূপান্তর হয়ে যায়। তারপরে—

জাগুরগুরজা গুরগুরজাগুর জাগুরগুরজা গুরগুরজাগুর

ঐ বাজনাটি আসে। তার থেকে আবার নানা ধরনের ভাঙা ছন্দ সৃষ্টি করা হয় এবং সর্বশেষ তেহাইয়ের মতো বাজানো হয়—

তেরে খেটা গিঘি নাগ ঝা উরর তাত্‌তা

এই বোলটি তিনবার। পরবর্তী অংশটি হ'ল 'হাতুটি' অংশ। হাতুটির জন্য একটি নির্দিষ্ট ঘর তৈরী করে নেওয়া হয়। ঘরটি হল—

ঝা গুরর দাদ্‌ ধেইযা দাগুর গুরদা গুরগুর ধেইয়া

দা গুর গুর দা গুব গুর ধেইয়া দা গুর গুর দা গুর গুর ধেইয়া

ঝা (বার বার)

এই সঙ্গে তিন আঘাতের করতাল সকলে একসঙ্গে বাজাতে থাকেন। ঘরটি বজায় রেখে নানা ধরনের হাতুটি বাজানো হয়। এটি হল হাতুটি অংশ। এইটি বৃহত্তম অংশ বলে এ' বাজনা প্রকরণটিকেই হাতুটি বলা হয়।

এ বাজনার তৃতীয় অংশটি হ'ল 'মেল বাদ্য' বা 'মেল জমাট'। এই নির্দিষ্ট বাজনাটিও একটি হাতুটি, কিন্তু এটি বাজানো হলেই সকলেই বুঝবেন হাতুটি শেষ। বাজনাটি যে গতিতে শুরু হয়, শেষ হয় তার অনেক বেশী দ্রুততে। নানা রকম ভাঙা ছন্দও করা হয়। শেষ পর্যায়ে মূর্ছন বাজানো হয়। মেল বাদ্যটি হ'ল—

ঘেনে নেরে গেদা ঘেনা নেরে ঘেনা নেরে ঘেনা

ঘেনে নেরে গেদা ঘেনা নেরে ঘেনা তা- গেদা

১৯। মূল গায়েন

'মূল গায়েন' শব্দটির প্রকৃত অর্থ হল প্রধান গায়ক। বৃন্দগান প্রসঙ্গে ব্যবহৃত 'মুখ্যগায়ন' শব্দের অপভ্রংশ অর্থাৎ আঞ্চলিক ভাষা হিসাবে বাংলাদেশে 'মূলগায়েন' শব্দটি কীর্তন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। এ থেকেই সুস্পষ্ট যে কীর্তন হল প্রাচীন বৃন্দগানেরই একটি ধারা। বৃন্দগান বলতে দলবেঁধে গান করা। কীর্তন ক্ষেত্রে গানের দল আবশ্যকীয় ব্যাপার। প্রাচীন বৃন্দ ছিল তিন প্রকার—উত্তম বৃন্দ, মধ্যম বৃন্দ এবং কনিষ্ঠ বৃন্দ। গায়ক বাদকের সংখ্যার তারতম্যানুসারে বৃন্দের নামকরণ হয়ে থাকে। যিনি প্রধান গায়ক তিনি 'মুখ্য গায়ন'। যাঁরা প্রধান গায়ককে কণ্ঠ দিয়ে সহযোগিতা করেন তাঁরা হলেন 'সমগায়ন'—কীর্তন ক্ষেত্রে দোহারের সঙ্গে যাঁরা বাদক থাকেন তাঁরা 'মার্দঙ্গিক', বাঁশী যাঁরা বাজান তাঁরা 'বাংশীক'।

উত্তম বৃন্দে—	মুখ্য গায়ন—৪ জন ; সমগায়ন—৮ জন ; গায়িকা—১২ জন ; বাংশীক—৪ জন মার্দঙ্গিক— ৪ জন।
মধ্যম বৃন্দে—	মুখ্য গায়ন ২ জন ; সমগায়ন—৪ জন গায়িকা—৬ জন ; বাংশীক—২ জন মার্দঙ্গিক—২ জন।
কনিষ্ঠ বৃন্দে—	মুখ্য গায়ন—১ জন ; সমগায়ন—৩ জন ; গায়িকা—৪ জন : বাংশীক—২ জন ; মার্দঙ্গিক—২ জন।

কনিষ্ঠ বৃন্দে গায়িকা ৪ জনের পরিবর্তে গায়ক ৪ জন যুক্ত করলে যে দলটি গঠিত হয় তা বর্তমানের কীর্তন দলের অবিকল রূপ। বাংশীক কীর্তন দলেও আগে ছিল। ইদানীং বাংশীকের পরিবর্তে হারমোনিয়ম, বেহালা ইত্যাদি যন্ত্র সংযুক্ত হয়েছে। বৃন্দের যে ছয়টি গুণের উল্লেখ শাস্ত্রে পাওয়া যায় সেগুলি হল ১। মুখ্যানুবৃত্তি অর্থাৎ প্রধান গায়কের অনুসরণ ; ২। মিল অর্থাৎ গানের ক্ষেত্রে বেসাদৃশ্য থাকলে তা মিলিয়ে নেওয়া ; ৩। তাল ও লয়ের অনুসরণ ; ৪। কোন অংশে অংশগ্রহণকারী কারও ত্রুটি থাকলে তা পরস্পর সংশোধন করে নেওয়া ; ৫। পারস্পরিক কণ্ঠ সাবলীলতা প্রয়োগ করে মন্দ্র, মধ্য ও তার ও ত্রিসপ্তকে সুর সঞ্চার করানো ; এবং ৬। সকল গায়কদের কণ্ঠধ্বনিতে সাদৃশ্য। কীর্তনের দল ব্যাপারেও এ ছয়টি গুণই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তা ছাড়া সকলেরই নাট্য সম্বন্ধী এবং অবনদ্ধ সম্বন্ধী জ্ঞান থাকা আবশ্যকীয়। তাই সিদ্ধান্ত করে বলা যায় যে বৃন্দগান সর্বভারতীয় গান কিন্তু তার যে ধারাটি গৌড়বঙ্গে প্রচলিত ছিল সেটিই পদ্ধতিগতভাবে কীর্তনের দলের রূপ নিয়েছে। বৃন্দগানের 'মুখ্য গায়ন পরিভাষাটি থেকেই বাংলায় 'মূল গায়েন' করা হয়েছে। এর থেকে 'বড় মূল গায়েন', 'ছোট মূল গায়েন' এমনকি পদবী হিসাবেও 'মূল গায়েন' শব্দটি ব্যবহার হয়।

২০। দোহার

মূল গায়েনের অবিচ্ছিন্ন সহায়কারী গায়ক বলেই 'দোহার বলা হয়। বৃন্দগানের 'সমগায়ন' শব্দটি যে অর্থে ব্যবহৃত হত কীর্তনে দোহার শব্দটি সে অর্থে ব্যবহার করা হয়। কীর্তন উপস্থাপন ক্ষেত্রে দোহারের ভূমিকা খুবই গুরুত্ব-পূর্ণ এবং পরিবেশনের সাফল্য বহুল পরিমাণে দোহারের উপর নির্ভরশীল। দোহার বৃত্তিটি আনুগত্যের বৃত্তি হলেও এ বৃত্তির যথেষ্ট আভিজাত্য আছে এবং এমন বহু ব্যক্তি আছেন যাঁরা হয়ত অত্যন্ত বিখ্যাত মূলগায়েন হতে পারতেন কিন্তু সারা জীবন দোহার হিসেবে থেকেই কৃতিত্ব লাভ করলেন।

যেমন—বাড়ুজ্জে মশাইয়ের দোহার ছিলেন গৌর দাস, মুখুজ্জে মশাইর দোহার রবীন। নন্দকিশোরদার দোহার দুকড়ি, রাধারমণদার দোহার শরৎ দাস, কানাই দাস প্রমুখ।

দোহারের শ্রেণী আছে, ১। শির দোহার, ২। বায় দোহার, ৩। কান দোহার, ৪। সুর দোহার। দোহারগণ মূল গায়েনের পিছন দিকেই থাকেন তবে তাঁদের প্রধানত থাকে দুটি ভাগ : কয়েকজন ডান দিকে থাকেন, তাঁদের বলা হয়—'ডান দোহার', আবার কয়েকজন বাম দিকে তাঁদের বলা হয় 'বাঁয় দোহার'। আর দুজন দোহার মূল গায়েনের ঠিক পিছনে থেকে সুর সংযোজনে সহায়তা করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে গলা সংযোগ করেন। তাঁদের একজনকে বলা হয় 'সুর দোহার' আর একজন কানের কাছে প্রস্তুত থাকেন প্রয়োজন ক্ষেত্রে গানের কথাও মূল গায়েনের কানে বলে দিয়ে স্মরণ করিয়ে দেন : তাছাড়া সুর ধরে রেখে স্কেল রক্ষা করেন ; কারণ এ পদ্ধতিতে হারমোনিয়ম, তানপুরা ইত্যাদি যন্ত্র ব্যবহার করা হয় না। এই দোহারটিকে বলা হয় 'কান দোহার', এ দোহারদের সঙ্গে মূলগায়েন বা দলপতির একটি নির্দিষ্ট ভাগের ব্যবস্থা থাকে যাকে বলা হয় 'বকরা' ; তা ছাড়া দু'একজন মূল গায়েন আবার বেতন ধার্য করে দোহার রাখতেন। দোহারদের সুকণ্ঠ, সদাচার, সঙ্গীতজ্ঞান, তত্ত্ববুদ্ধি ইত্যাদি আবশ্যকীয়। এই দোহাররাই গানকে পল্লবিত করে এবং রাগরাগিণী বিস্তার করেও উত্তম সংযোজন করে আসরের আকর্ষণ সৃষ্টি করে।

২১। শির বায়েন

কীর্তনের আসরে দোহারগণ যেমন দুই ভাগে থাকেন বাদক অর্থাৎ শ্রীখোল বাজিয়েরাও দুদিকে থাকেন। প্রধান বাদক থাকেন ডান দিকে তাঁকেই বলা হয় 'শির বায়েন'। ঠেকা, জোরা, লহর, মাতন ইত্যাদি বাজনা শুরু করা বিষয়ে কর্তৃত্ব তাঁরই থাকে। আবার বাঁ দিকে থাকেন একজন বা দু'জন। বাঁয়ের বাদকগণ শির বায়েনকে মূলত সহায়তা করেন তাই তাঁদের বলা হয় 'বাঁয়াটি বায়েন'। বাঁ দিকের দ্বিতীয় বাদকটি হলেন আবার বাঁয়াটির অনুগত। তাঁকে বলা হয় 'কোল বায়েন'। বড় বড় দলের শির বায়েনের মর্যাদা মূল গায়েনের চেয়ে খুব কম নয়। শির বায়েন হিসাবে যাঁরা খ্যাতিলাভ করেছিলেন তাঁদের কেউ আর এখন জীবিত নেই। এর মধ্যে অনেকে ছিলেন যাঁরা ভালো গান জানতেন এবং তাঁরা গান শিখিয়ে আসরে বাজিয়ে শ্রেষ্ঠ গায়ক তৈরী করেছেন। যেমন প্রয়াত যতীন দাস, লেখকের গুরু প্রয়াত রাধারমণ কর্মকার মহাশয়ের গুরু এবং তাঁর দলের শির বায়েন হিসাবে দলকে তৈরী করেছেন। এমন অনেক শির বায়েন ছিলেন যাঁরা গান জানতেন যেমন—নবদ্বীপচরণ ব্রজবাসী, ভুবন দাস, খিবার অবধূত বন্দ্যোপাধ্যায়, পরেশচন্দ্র মজুমদার, রাধিকা চক্রবর্তী প্রমুখ।

এ ছাড়া শিল্প বায়েন যাঁরা ছিলেন—বৈষ্ণবচরণ দত্ত, কিংকর দাস, কৃষ্ণচৈতন্য বাবাজী, রাম কুণ্ডু, গৌরদাস মোহন্ত, ফণি মণ্ডল, গোবিন্দ দাস, বৈঁচির মদন দাস, কিশোরী সাহা, পূর্ববঙ্গের সনাতন সাহা, গোপাল বাবাজী, নিতাই নাগা, হরেকৃষ্ণ দাস, কালি গাড়াল, মাখন দাস, বাজিয়ে বিপিন, দিনুবাবু, ভোলানাথ দত্ত প্রমুখ। তাছাড়া জীবিতদের মধ্যে এখনও কয়েকজন প্রখ্যাত বাদক আছেন।

অষ্টম অধ্যায়

কীর্তন ও রস

কীর্তন হ'ল এক প্রকার গান, সে দিক থেকে এ হ'ল ব্যবহারিক তত্ত্ব আর রস হ'ল অনুভব তত্ত্ব। ব্যবহারের সংগে অনুভব সম্পর্কসূত্রে এমন ঘনিষ্ঠ হয়ে আছে যে কীর্তন শব্দটি উচ্চারণের সংগে সংগেই একটি রসময় পরিবেশের ধারণা অন্তরে জেগে ওঠে। এই অবিচ্ছেদ্য ঘনিষ্ঠতার জন্যই পদাবলী কীর্তনের আর এক নাম 'রসকীর্তন'। পদাবলী কীর্তন রূপগত বিচারে হ'ল 'স্বর তাল পদাত্মকং' : অর্থাৎ একদিকে আছে স্বর, তাল, সুর গমক ইত্যাদি সাংগীতিক উপকরণের সমৃদ্ধি, অন্যদিকে আছে পদ অর্থাৎ কাব্যের দ্যোতনা। সংগীত কাব্য উভয়ই সমভাবে রসের আধার তাই কীর্তনের উপকরণ হ'ল রসের উপকরণ। কীর্তনের বিষয় উপস্থাপন পদ্ধতিতে থাকে নাটকীয়তা তাই নাটকের রস পদাবলী কীর্তনের স্তরে স্তরে অবস্থিত। পদাবলী কীর্তনের নায়ক শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং 'রস বৈ সঃ', রসরাজ রূপসম্পন্ন রসিকেন্দ্র চূড়ামণি। নায়িকা শ্রীমতী রাধারাণী হলেন 'রাস রস তান্ডবী' 'সুবিলাসা মহাভাবো পরমোৎকর্ষতর্ষিণী', রসময়ী, রসকাদম্বিনী। এমন অতুল বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন নায়ক-নায়িকার রসময় আচরণ, রসের লীলা আস্বাদনের রাজ্যে অপূর্ব মাধুর্যমণ্ডিত রসের ভাণ্ডার। এই রসোপকরণ নিয়ে শিল্পী এবং শ্রোতারা যখন তম্গতচিত্ত হয়ে পরম অভিধার রাজ্যে বিচরণ করে তখন কেবল কীর্তনের আহ্লাদময় রসসত্তাই আস্বাদময় হয়ে ওঠে। তাই কীর্তনের রসব্যাপ্তি রয়েছে চারটি স্তরে। এগুলি হল—(১) মূল নায়ক-নায়িকা অর্থাৎ বৃন্দাবনের শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁদের অনন্ত রসলীলা, সেইসংগে বৃন্দাবনবাসী সকল ব্রজগোপী, ব্রজমাই, সখা, সখী, মঞ্জরী প্রমুখের লীলা সহায়কারী ক্রিয়াকলাপ। (২) কীর্তনের কাব্য ও সাহিত্যময় রসপ্রাচুর্য, (৩) কীর্তনের সাংগীতিক বিন্যাসপদ্ধতির রসতাৎপর্য, এবং (৪) কীর্তনের গায়ক বা অনুকার নাট্যশিল্পীবৃন্দ ও কীর্তনের অনুকূল শ্রোতাদের অন্তস্থলে সুপ্ত রসসংস্কার সুখময় উপলব্ধি। এই চারটি সূত্রই কীর্তনের রসের সূত্র—এগুলির সমর্থন কিছু আছে শাস্ত্রগ্রন্থে আর কিছু আছে অনুভবের রাজ্যে। এগুলি পড়ে বা শুনে এই বোঝা যায়, কিন্তু সান্নিধ্যে গেলে সমগ্র রস বিষয়টি অপূর্বরূপে অনুভূত হয়।

নায়ক বিচার

নাটকীয় দৃষ্টিভংগীতে কৃষ্ণের নায়কত্ব বিচার করতে গেলে দেখা যায় যে বৃন্দাবন-বিহারী শ্রীকৃষ্ণই হ'লেন শ্রেষ্ঠ নায়ক। নাটকের নায়ক হ'ল তিন প্রকারের—

(১) দিব্য নায়ক, (২) দিব্যাদিব্য নায়ক, এবং (৩) অদিব্য নায়ক। কৃষ্ণকে যাঁরা ভগবৎস্বরূপ বলে মানেন, তাঁদের বিচারে শ্রীরামও ভগবৎস্বরূপ, তাঁরও মানুষোচিত লীলা আছে, কিন্তু তাঁর লীলাগুলি হ'ল 'দিব্যাদিব্য' মিশ্রিত, নায়ক হিসাবে শ্রীরামচন্দ্র হলেন 'দিব্যাদিব্য নায়ক'। অন্যদিকে মহাভারতে বর্ণিত যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডববর্গ দিব্যদেহধারী, তাদেরও মানুষোচিত লীলা আছে কিন্তু সেই লীলাগুলি নিতান্তই মানুষোচিত অর্থাৎ দিব্যত্বের অভাবসম্পন্ন, তাই নায়ক হিসাবে তাঁরা হলেন 'অদিব্য নায়ক'। এদিক থেকে শ্রীকৃষ্ণের আছে যথেষ্ট গুণাতিশয্য। নায়কের সর্ববিধ গুণ ও প্রতিটি প্রকরণই তাঁর মধ্যে লক্ষণীয়, তাঁর প্রতিটি লীলা মানুষোচিত হলে অনন্ত দিব্যগুণসম্পন্ন, তা-ই শ্রীকৃষ্ণই হ'লেন 'দিব্যনায়ক'। এমন 'দিব্যনায়ক' আর কোনও নাটকীয় প্রবন্ধে নেই, তাই শ্রীকৃষ্ণের নায়কত্বের এত উৎকর্ষ এবং এত রসময়তা।

কৃষ্ণলীলার নায়কত্ব বিশ্লেষণ করলে নায়কের ছিয়ানব্বইটি প্রকারভেদ পাওয়া যায়। নায়ক মূলত চার প্রকার—(১) ধীরোদাত্ত, (২) ধীরললিত, (৩) ধীরোদ্ধত ও (৪) ধীরশান্ত। এই চারটি প্রকারই আবার তিন অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে হয় মোট বারটি প্রকার। সেই তিন অবস্থা হ'ল—(১) পূর্ণতম, (২) পূর্ণতর ও (৩) পূর্ণ। এই বার প্রকারের আবার দু'টি ভেদ আছে—(১) পতি ভেদ, এবং (২) উপপতি ভেদ অর্থাৎ এই নায়ক প্রকার হ'ল চব্বিশটি। এই নায়ক আবার (১) অনুকূল, (২) দক্ষিণ, (৩) শঠ ও (৪) ধৃষ্ট ভেদে মোট ২৪×৪ অর্থাৎ ছিয়ানব্বটি প্রকার হয়। কেবলমাত্র কৃষ্ণলীলা বিশ্লেষণেই এই ছিয়ানব্বইটি প্রকরণ পাওয়া যায়। তাই, কৃষ্ণের নায়কত্বই হ'ল শ্রেষ্ঠ নায়কত্ব এবং কৃষ্ণ চরিত্রই হ'ল শ্রেষ্ঠ রস চরিত্র—এটিই সকলের ধার্য সিদ্ধান্ত।

(১) 'ধীরোদাত্ত' নায়কের প্রধান গুণগুলি হ'ল—নায়ক হবে গম্ভীর, বিনয়ী, ক্ষমাশীল, করুণ, সুদৃঢ়ব্রত, আত্মশ্লাঘাশূন্য, গূঢ়গর্ব ও মহা বলবান।

"গম্ভীরো বিনয়ী ক্ষন্তা করুণঃ সুদৃঢ়ব্রতঃ।
অকত্থনো গূঢ়গর্ব্বো ধীরোদাত্তঃ সুসত্ত্বভৃৎ॥

ভঃ রঃ সিঃ ২।১।২২৬

(২) 'ধীরললিত' নায়ক হবে প্রধানতম বিদগ্ধ, নবতারুণ্যযুক্ত, পরিহাসপটু, নিশ্চিন্ত এবং প্রায়শই প্রেয়সীবশ। কন্দর্পের মধ্যে নাটকীয় ধীরলালিত্য থাকলেও প্রকৃত 'ধীরললিত নায়ক' হলেন ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণ।

"বিদগ্ধ নবতারুণ্যঃ পরিহাস বিশারদঃ।
নিশ্চিন্তো ধীরললিতঃ স্যাৎ প্রায়ঃ প্রেয়সীবশঃ॥"

ভঃ রঃ সিঃ ২।১।২৩০

(৩) 'ধীরোদ্ধত' নায়ক হলেন মাৎসর্যযুক্ত, অহঙ্কারী, মায়াবী, ক্রোধী, চঞ্চল

ও আত্মশ্লাঘাপরায়ণ। ভীমসেন 'ধীরোদ্ধত নায়ক হ'লেও শ্রীকৃষ্ণেই এ নায়কত্ব দিব্যরূপে সুস্পষ্ট।

"মাৎসর্য্যবানহঙ্কারী মায়াবী রোষণশ্চলঃ।
বিকত্থনশ্চ বিদ্বদ্ভির্ধীরোদ্ধত উদাহৃতঃ॥"

ভঃ রঃ সিঃ ২।১।২৩৬

(৪) 'ধীরশান্ত' নায়ক হবে শমপ্রকৃতিসম্পন্ন। এমন ধীর শান্ত নায়কের মধ্যে যুধিষ্ঠির উল্লেখযোগ্য হলেও শ্রীকৃষ্ণেই এই নায়কত্বের পূর্ণ প্রকাশ দেখা যায়।

"শমপ্রকৃতিকঃ ক্লেশসহনশ্চ বিবেচকঃ।
বিনয়াদি গুণোপেতো ধীরশান্ত উদীর্য্যতে॥"

ভঃ রঃ সিঃ ২।১।২৩৩

'অনুকূল' নায়ক বলা হয় তাঁকেই যিনি অন্য নায়িকা বিষয়ক স্পৃহা বর্জন করে কেবল একজন নায়িকাতেই অতিরিক্ত আসক্তিযুক্ত হন। 'দক্ষিণ' নায়ক হ'ল সেইসব নায়ক যাঁরা পরম সদগুণবিশিষ্ট অন্য কোন নায়িকার প্রতি রাগবিশেষে সাময়িক আকর্ষিত হ'তে পারেন কিন্তু পূর্ব নায়িকাতেই থাকে তাঁর গৌরব, ভয়, প্রেম ও দাক্ষিণ্য। 'শঠ' নায়কের লক্ষণ হ'ল—যে নায়ক সম্মুখে প্রিয়ভাষী কিন্তু পরোক্ষে বিপ্রিয় আচরণ করেন এবং নিগূঢ় অপরাধে অপরাধী হন তিনিই 'শঠ' নায়ক। 'ধৃষ্ট' নায়ক হলেন তিনিই যিনি অন্য নায়িকার ভোগচিহ্নাদি অঙ্গে নিয়েও নির্ভয়ে পূর্ব নায়িকার নিকট যান এবং মিথ্যা বচনে দক্ষতা প্রকাশ করেন। নায়কের এইসব বৈশিষ্ট্যগুলিই রসোপকরণ।

লীলা প্রকটের জন্য এই নায়কের সহায়ক যেসব চরিত্র থাকে তাঁরা হলেন মূলত পাঁচ প্রকারের—(১) চেট, (২) বিট, (৩) বিদূষক, (৪) পীঠমর্দ এবং (৫) প্রিয়নর্ম। এই পাঁচটি হ'ল সখা-প্রকরণ। যেসব সখার বুদ্ধি খুব প্রখর, বিশেষ সন্ধানী, চতুর এবং নিগূঢ় কর্মপরায়ণ তাঁরাই হলেন 'চেট সখা'। শ্রীকৃষ্ণ-লীলায় তাঁরা বেণু, শিঙ্গা, মুরলী, যষ্টি, পাশা ইত্যাদি বহন করেন এবং যথা সময়ে কৃষ্ণের হাতে জুগিয়ে দেন। 'বিট সখা' হলেন তিনিই যিনি বেশ রচনা ও শুশ্রূষা বিদ্যায় পারদর্শী, ধূর্ত, গোষ্ঠীবিশারদ এবং নারী বশীকরণে সমর্থ ও মন্ত্রৌষধি প্রয়োগে বিচক্ষণ। যেসব সখা ভোজন বিষয়ে খুব সতৃষ্ণ ও কলহপ্রিয়, তা ছাড়া দেহ, বাক্য ও বেশভঙ্গি করে সকলের হাস্য উৎপাদন করেন তাঁরাই হলেন 'বিদূষক সখা'। যেমন কৃষ্ণলীলায় মধুমঙ্গল। যে সখা নায়কের মতোই গুণবান কিন্তু প্রেমভরে নায়কেরই আনুগত্য করেন তিনি হ'লেন 'পীঠমর্দ সখা'। শ্রীকৃষ্ণলীলায় যেমন শ্রীদাম সখা। রসরহস্যের সব কিছুই অত্যন্তভাবে জানেন, সখীভাবাশ্রিত, প্রণয়ীদের মধ্যে বিশেষ প্রিয়—এমন সখাকেই বলা হয় 'প্রিয়নর্ম সখা'। কৃষ্ণলীলায় এ সখা হ'লেন সুবল সখা।

নায়িকা বিচার

নায়িকা বিচারের মূল দৃষ্টিভঙ্গী তিনটি—(১) স্বকীয়া নায়িকা, (২) পরকীয়া নায়িকা এবং (৩) সাধারণী নায়িকা।

রসশাস্ত্রে সাধারণী নায়িকা তেমন বিচার্য নয় কারণ এ নায়িকার বহু নায়কে নিষ্ঠা থাকে। স্বকীয়া ও পরকীয়া নায়িকায় আছে তিনটি ভেদ—(১) মুগ্ধা, (২) মধ্যা ও (৩) প্রগল্‌ভা। এর মধ্যে মধ্যা ও প্রগল্‌ভা নায়িকার তিনটি করে প্রকরণ—(১) ধীরা (২) অধীরা এবং (৩) ধীরাধীরা অর্থাৎ স্বকীয়া এবং পরকীয়া ভেদে 'এ' স্তর পর্যন্ত নায়িকা হ'ল (৩×২+১)×২=১৪+সাধারণী (কন্যা) প্রকরণ ১টি=মোট ১৫ প্রকরণ। নায়িকাদের প্রত্যেকের আবার আটটি প্রকার আছে। এগুলি হ'ল—(১) অভিসারিকা, (২) বাসকসজ্জিকা, (৩) উৎকণ্ঠিতা, (৪) খণ্ডিতা (৫) বিপ্রলব্ধা, (৬) কলহান্তরিতা, (৭) প্রোষিত-ভর্তৃকা এবং (৮) স্বাধীনভর্তৃকা। প্রতিটি নায়িকার আবার তিনটি ভেদ আছে—(১) উত্তমা (২) মধ্যমা ও (৩) কনিষ্ঠা। অর্থাৎ নায়িকার মোট প্রকার ভেদ হ'ল—১৫×৮×৩=৩৬০। এই সব প্রকারগুলিই নায়িকা হিসাবে কেবল শ্রীমতী রাধারাণীতেই বর্তমান। লীলা প্রসঙ্গ রসোপস্থাপন বিষয়ে সখীগণ হলেন পাঁচ প্রকার—(১) সখী—কুসুমিকা, বিন্ধ্যা, ধনিষ্ঠা প্রমুখ। (২) নিত্য-সখী—কস্তুরী ও মণিমঞ্জরী (৩) প্রাণসখী—শশীমুখী, বাসন্তী (৪) প্রিয়-সখী—কুরঙ্গাক্ষী, সুমধ্যা, মদনালসা প্রমুখ। (৫) পরম শ্রেষ্ঠ সখী—ললিতা, বিশাখা আদি।

ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণ এবং বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধার লীলাবিলাস সূত্রে নানা ধরনের রসমাধুর্য সৃষ্টি হয়েছে। এই মাধুর্যের মূল কারণই হ'ল কৃষ্ণ স্বয়ং মাধুর্যময়। তাঁর নাম, ধাম, পরিকর, বসন, ভূষণ, বাণী হাসি—সবই মধুর। সেজন্য তাঁকে গোস্বামীগণ বলেছেন—'মধুরাধিপতে রখিলং মধুরং'। এই মাধুর্য সত্তা আছে বলেই সমস্ত লীলা প্রসঙ্গ রসলীলায় পর্যবসিত হয়েছে, কারণ 'রসই হ'ল 'মাধুর্য'' এবং 'মাধুর্য''ই 'রস'।

> "কোটি কাম জিনি রূপ যদ্যপি আমার।
> অসমোর্ধ্ব মাধুর্য সাম্য নাহি যার॥"

চৈঃ চঃ। আদি ৪।২৪৩

কৃষ্ণের রূপ হ'ল রূপ-রতন, অনন্ত চমৎকারিত্বসম্পন্ন, ভূষণ ছাড়াই নিয়ত ভূষিত, প্রতিটি অঙ্গে থাকে অনঙ্গের নৃত্য। এই সুখময় রূপই পরম মাধুর্যময়।

> "যোগমায়া চিচ্ছক্তি বিশুদ্ধ শুদ্ধ পরিণতি
> তার শক্তি লোকে দেখাইতে।
> ভক্তগণার গূঢ়ধন ঐ রূপ রতন

প্রকাশিলা নিত্যলীলা কৈতে ॥
রূপ দেখি আপনার   কৃষ্ণের হইল চমৎকার
আস্বাদিতে মনে উঠে কাম।
স্বসৌভাগ্য যার নাম   সৌন্দর্যাদি গুণগ্রাম
এইরূপ নিত্য তার ধাম ॥”

চৈঃ চঃ

এই রূপমাধুর্যের ন্যায় বেণুমাধুর্য এবং লীলামাধুর্য। বেণুধ্বনি অনন্ত মাধুর্য সমন্বিত। এই বেণুরব শ্রবণ করলে 'দরশহিদার মুঞ্জরে নব পল্লব', 'যমুনা বহত উজান', 'যোগীরা যোগ ভুলে', 'মুনি ত্যাগ করে মৌনব্রত', আর রাধা আদি গোপিনীবর্গের চিত্ত অধৈর্য হয়ে ওঠে, অনন্তর অভিসারে গমন করেন।' এই অভিসারোদ্দীপনা, মিলনোৎকণ্ঠা ইত্যাদি ক্ষেত্রে মূল প্রেষণাই হ'ল বংশীধ্বনি বা বেণুরব। মা যশোদার নিকট শ্রীদাম বলছেন—

“লৈয়া যাইতে তোমার গোপাল
পাই বড় সুখ।
বেণুরবে ধেনু ফিরে সে বড় কৌতুক ॥

অপরদিকে কৃষ্ণ এবং মাধুর্য যেমন অভিন্ন সত্তা তেমনি মাধুর্যের নির্যাসস্বরূপ 'মাদন' নামক মহাভাবের একান্ত আধার হলেন রাধা বিনোদিনী। তিনিই হলেন মহাভাব স্বরূপিণী। মধুর রসের ক্ষেত্রে স্থায়ীভাব হ'ল মধুরা রতি। এই রতি বর্ধিত হয়ে ক্রমশ—প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ অনুরাগ, ভাব এবং মহাভাবে পর্যবসিত হয়। এই মহাভাব থেকে সৃষ্ট হয়—রূঢ়, অধিরূঢ় মোদন, মোহন এবং মাদন এই পাঁচটি অবস্থা। এই 'মাদন'ই হ'ল 'মাদনাখ্যা' মহাভাব যা কেবলমাত্র শ্রীরাধাতেই বর্তমান। ফলত শ্রীরাধাও পরম মাধুর্য কাদম্বিনী। একদিকে কৃষ্ণ রসরাজ রূপ', অপরদিকে শ্রীরাধা 'মাদনাখ্য মহাভাব' ; এই দুয়ের সম্মিলিত লীলা প্রসঙ্গ স্বভাবাসম্ভভাবেই মাধুর্যরসে পরিপূর্ণ হয়। তাই রাধাকৃষ্ণের লীলা প্রসঙ্গ অনন্ত মাধুর্যমণ্ডিত—একেই বলে লীলামাধুর্য। বৃন্দাবন লীলা যে এত মাধুর্যমণ্ডিত তার কারণ হ'ল এখানে কৃষ্ণের অনন্ত ঐশ্বর্য দর্শন করেও কখনো ব্রজবাসীগণ তাঁকে ঈশ্বর বুদ্ধি করেন নাই। মাতা, পিতা ও বয়স্যবর্গ কৃষ্ণকে গোপাল, নীলমণি অর্থাৎ তাদের প্রাণাধিক প্রিয় বৎস হিসাবেই গণ্য করেছেন। মৃৎভক্ষণলীলা প্রসঙ্গে মা যশোদা শ্রীকৃষ্ণের মুখগহ্বরে অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দেখতে পেলেন, দেখলেন বিশ্বরূপ। কিন্তু তাতেও তাঁর ঈশ্বর বুদ্ধি হয়নি। ব্রজবাসীগণ সকলেই সাক্ষাৎ দর্শন করেছেন 'পুতনামোক্ষণ', 'শকটাসুর বধ', তৃণাবর্ত', অঘাসুর', 'বকাসুর', 'বৎসাসুর' ইত্যাদির নিধন। কিন্তু এসব দেখেও তাঁরা—'ইনি ঈশ্বর, এমন চিন্তার লবলেশও প্রকাশ করেন নাই। বরং নিতান্ত জাগতিক বুদ্ধিতে পুত্রের জন্য ওঝা, বৈদ্য করেছেন স্থান-

ত্যাগাদিও করেছেন। সখাগণ সব কিছু দেখেও কৃষ্ণকে সখা, বন্ধু ভাই জ্ঞানে তাঁর সংগে লীলাবিলাস করেছেন। তাঁর কাঁধে চড়েছেন, উচ্ছিষ্ট ফলও তাঁর মুখে দিয়েছেন, লুকোচুরি খেলা, গো-গোবৎস সেজে খেলা সবই তাঁরা কৃষ্ণের সংগে অনায়াসে করেছেন।

মাধুর্য ভগবত্তা সার ব্রজে কৈল পরচার
তাহা শুক ব্যসে'র নন্দন।
স্থানে স্থানে ভাগবতে বর্ণিয়াছে জানাইতে
যাহা শুনি মাতে ভক্তগণ ॥

চৈঃ চঃ মধ্য ২১।১১০

শ্রীকৃষ্ণের লীলা প্রকরণ দু'টি—(১) মায়িকী ও অপরটি হ'ল (২) স্বরূপ শক্তিময়ী। লীলার এই দ্বিতীয় প্রকারের মধ্যেই আছে রসের সঞ্চয়। এই লীলা প্রকটের জন্য যেমন বৃন্দাবন, মথুরা এবং দ্বারকাদি নির্দিষ্ট স্থান আছে ; লীলা প্রকটের যেমন ষড়ঋতু, অষ্টকাল ইত্যাদি নির্দিষ্ট কাল-বিভাজন আছে, তেমন লীলার জন্য নির্দিষ্ট লীলা পরিকরও আছেন। এদের মধ্যে যেমন বৃন্দাবনের গোপ-গোপীগণ, দ্বারকা ও মথুরার যাদবগণ আছেন তেমন আছেন ব্রহ্মা, ইন্দ্র নলকুবর, মণিগ্রীব দেবগণ, নারদাদি মুনিগণ, কেশি প্রভৃতি দানবগণ, কালিয় প্রভৃতি নাগগণ, শংখচূড়াদি যক্ষগণ সকলেই। তবে রসপূর্ণ সবচেয়ে আস্বাদ্য লীলাগুলি প্রকাশ হয় মা যশোদার সংগে ; শ্রীদাম, সুদামাদি সখাদের সংগে ; সর্বোপরি শ্রীমতী রাধারানীর সংগে। মা যশোদার সংগে শ্রীকৃষ্ণের বহু বাল্যলীলা তার মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত হয়েছে মা যশোদার 'দধিমন্থন', 'শ্রীকৃষ্ণের ননীচুরি' 'দামবন্ধন', 'যমলার্জুনভঞ্জন', 'মৃৎভক্ষণ', 'গমনগোষ্ঠ' ইত্যাদি। এই প্রতিটি লীলার মধ্যে প্রকাশ রয়েছে মাতৃস্বরূপিণী যশোদার অনুগ্রহময়ী রতি। এরই নাম 'বাৎসল্য'। এর স্বভাব হ'ল লালন, মংগলাশীর্বাদ দান, চিবুক স্পর্শন ইত্যাদি।

"এবং গুণস্য চাস্যানুগ্রাহ্যত্বাদেব কীর্তিতা।
প্রভাবানাস্পদতয়া বেদ্যস্যাত্র বিভাবতা।"

ভঃ রঃ সঃ ৩।৪।৫

এ স্থলে মা যশোদা ও পিতা নন্দের পুত্রত্ব ; উপনন্দ, অভিনন্দ, প্রমুখের ভ্রাতুষ্পুত্রত্ব অভিমান ; এবং রোহিণী প্রমুখ মাতৃস্থানীয়া বর্গে'র পুত্রবৎ অভিমান এবং তা থেকে উদ্ভাবিত স্নিগ্ধতাই হ'ল বাৎসল্য। এই হ'ল বাল্যলীলাময় বাৎসল্যের প্রকাশ। কখনো 'মা কোথায়, মা কোথায়' বলে কৃষ্ণ কাঁদছেন, সময় অসময়ে স্তনপানের জন্য ক্রোড়ে উপবিষ্ট হচ্ছেন, অন্যদিকে 'গোপাল গেলি কই,' 'হেদে, ওগো রামের মা ননীচোরা গেল কোন পথে'—বলে মা যশোদা, পিতা নন্দ তাঁদের প্রাণের প্রাণ নীলমণিকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

এরই বিন্যাস হয়েছে লীলা প্রসংগের স্তরে স্তরে।

শ্রীদাম, সুদাম, দাম, বসুদাম, সুবল, মধুমঙ্গল, স্তোককৃষ্ণাদির সংগে নিরন্তর প্রাতরোত্থানের পর থেকে 'উত্তরগোষ্ঠ' অর্থাৎ গৃহে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত সারাদিন লীলা বিহার, পরস্পরের মধ্যে সখারূপ অভিমান—একে অপরকে ছেড়ে না থাকতে পারা, সমকর্মে নিয়োজিত সকলেই একসংগে বিভিন্ন ধরনের খেলাতে প্রবৃত্ত, কৃষ্ণের কাঁধে চড়ছেন, কৃষ্ণকে উচ্ছিষ্ট ফল খাওয়াচ্ছেন, তাঁকে কখনও বানর, কখনও মহিষাদি পশু সাজাচ্ছেন—এসব লীলাবিলাসের মধ্যে কেবলমাত্র সখারূপ অভিমান ছাড়া আর কিছুই নেই। কীর্তনের গোষ্ঠলীলায় বিভিন্ন স্তরে —অর্থাৎ 'গমনগোষ্ঠ', দেবগোষ্ঠ', 'গোষ্ঠলীলা', 'উত্তরগোষ্ঠ' ইত্যাদি প্রসংগে এই সখ্যভাবের বিন্যাস অপূর্ব উপজীব্য হয়ে থাকে। নিরন্তর কৃষ্ণসংগের সময় তাঁদের মধ্যে কৃষ্ণের অনিষ্ট নিবারণের তীব্র প্রচেষ্টা, তাঁর হিতে প্রবর্তন, এবং তাঁর ব্যসনে পরিত্যাগ না করা ইত্যাদি লক্ষণগুলিই প্রবল। এঁরা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের তুল্যত্বাভিমানময় রতিযুক্ত অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সংগে সমভাবপ্রযুক্ত—এটিই হ'ল তাঁদের পূর্ণ রসময় সখ্যভাব। কীর্তনের পদ বর্ণনায় গায়কের গায়কীতে এসব কেতাবী ভাবনা অপূর্ব রূপ ধারণ করে থাকে।

শ্রীরাধার সংগে শ্রীকৃষ্ণের বিলাসের রস পরিসীমা বা রসতাৎপর্য অনন্ত। ভাষায় তাকে প্রকাশ করা অসম্ভব। বৃষভানুনন্দিনী, রমণীর শিরোমণি, কৃষ্ণ প্রেম সায়রের মরালিনী, মাধুর্য কাদম্বিনী, মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীমতী রাধা কৃষ্ণ ছাড়া কিছুই জানেন না। কৃষ্ণই তাঁর প্রাণবঁধু, কৃষ্ণই তাঁর পতি, কৃষ্ণই তাঁর সর্বস্ব ধন এবং 'যাহা যাহা নেত্র পড়ে তাহা তাহা কৃষ্ণ স্ফুরে'—এমন মধুর ভাবে বিভাবিত রাধা শ্রীকৃষ্ণের সংগে ভাববিলাসের মাধ্যমে অনন্তসসমৃদ্ধ। কৃষ্ণও লীলা উপস্থাপনকল্পে শ্রীরাধাতেই আত্মসমর্পিত ; এই অভিন্নত্বই মাধুর্যের প্রাণ। প্রেমের স্বরূপ হ'ল—'কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা'—এ বাঞ্ছায় কেবল গোপীগণই সিদ্ধ। আর প্রেমের স্বরূপকে ফুটিয়ে তুলবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা অভিন্ন হয়েও ভিন্ন স্বরূপ ধারণ করেছেন।

"রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি।
অন্যোন্যে বিলাসে রস আস্বাদন করি।"

চৈঃ চঃ।

রাধাকৃষ্ণ প্রেমমাধুর্য মহান, জ্ঞানসূত্রে দুর্বোধ্য, কেবলমাত্র অনুভববেদ্য, এ প্রেম অসীম কিন্তু বৃন্দাবনেই সীমিত, নৃলোকে অসংঘটনীয় কিন্তু সাধারণের আস্বাদ্য এই অপূর্ব সম্পর্কজনিত লীলাই হল রসলীলা।

অভিসারিকা

বংশীধ্বনি শ্রবণমাত্র এমনকি ভূষণাদি যথাস্থানে পরিধান করবার পূর্বেই বিভ্রম অবস্থায় শ্রীমতী রাধা সখীগণ সংগে যাত্রা করেন প্রাণবঁধুর সন্নিধানে।

"বংশীরব লাগিল কানে, চিতে না ধৈরজ মানে
অমনি চলিল রসবতী।
কে যাবি কে যাবি সংগে বিপিন বিহার রংগে
ভেটিবারে গোকুলের পতি ॥

বিভিন্ন কালের বিভিন্ন অভিসার। তিমিরাভিসার, বর্ষাভিসার, জ্যোৎস্নাভিসার, হিমাভিসার ইত্যাদি নানাবিধ অভিসার আছে। তাছাড়া আছে দিবাভিসার, নিশাভিসার, প্রাতরাভিসার, মধ্যাহ্নাভিসার ইত্যাদি। রাসের অভিসারে দেখা যায় প্রেমের বিভ্রম অবস্থা। গোবিন্দদাস বর্ণনা দিয়ে বলেছেন—

"শুনত গোপী প্রেম রোপ,
মনহি মনহি আপনা সোঁপি,
তাহি চলত যাহি বোলত
মুরলীক কল কলনী ॥
বিছুরী গেহ নিজহি দেহ
এক নয়নে কাজর রেহ—
বাহে রঞ্জিত কংকন এক
এক কুণ্ডল দোলনী ॥
শিথিল ছন্দ নিবিক বন্ধ
বেগে ধাওত যুবতী বৃন্দ
খসন বসন রসন চোলি
গলিত বেণী লোলনী।
ততহি বেলি সখীনি মেলি,
কেহু কাহুক পথ না হেরি,
ঐছনে মিলল গোকুলচন্দ্র
গোবিন্দদাস বোলনী ॥"

এই বিভ্রম অবস্থাপ্রাপ্ত নায়িকার অভিসারকে বলা হয় অসমঞ্জসাভিসার। রসশাস্ত্রে এই অভিসারলীলার মোট আটটি প্রকরণ আছে। সেগুলি হ'ল— ১। জ্যোৎস্নাভিসার, ২। তামসাভিসার, ৩। বর্ষাভিসার, ৪। দিবাভিসার, ৫। কুজ্ঝটিকাভিসার, ৬। তীর্থযাত্রাভিসার, ৭। উন্মত্তাভিসার, এবং ৮। অসমঞ্জসাভিসার। নায়ক ও নায়িকা উভয়েরই অভিসার হয়। তার মধ্যে রাধার অভিসারেই রসের আধিক্য। বংশীধ্বনি শ্রবণ করে বা অন্য কোন সংকেত পেয়ে প্রাণনাথের সংগে মিলনের আকাংক্ষায় সংকেত কুঞ্জের দিকে গমন করেন।

সখীগণ পরিবৃত হয়ে শ্রীমতী রাধারাণী। এই গমনের ভংগীর সীমা নাই। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অভিসারের বিভিন্ন বেশভূষাই হলো বিভিন্ন অভিসারিকার লক্ষণ। যেমন, জ্যোৎস্নাভিসারের বেশে আছে—

১। "নীল বসন গোরী গায়, ঘোমটা করিছে তায়,
বেণীর আগে দোলে সোনার ঝাপা।"

২। "নীলাম্বর পরি পটাম্বর কিঙ্কিণী তাহি বাজে।

৩। "নীল বসন রতন ভূষণ জলদে দামিনী সাজে।"

৪। "সঙ্গিনী সব রঙ্গে পহিরে রঙ্গিম নীল শাড়া।"

ইত্যাদি।

শরৎকালীন অভিসারে আবার বিশেষ বিশেষ সময়ে আছে সাদা শাড়ি।

"ধবল বিভূষণ অম্বর বোলই।
ধবলিম কৌমুদী মিলি তনু চলই॥"

'বর্ষাভিসারে'র ক্ষেত্রে সমগ্র দেহে নীল মৃগমদ লেপন করে, তার উপর নীল শাড়ি পরিধান করে থাকেন।

"নীল মৃগমদ তনু লেপহ মোর।
তাহি পহিরায়হ নীল নিচোল॥"

আবার অন্ধকারে হাসিতে যখন মুখচন্দ্রমা বিকাশিত হবে তখন আলো ফুটে উঠবে। তাতে বিপত্তি ঘটতে পারে! তাই রাধারাণী হাতের কঙ্কণ খুলে রেখে মুখ ঢেকে অভিসার করলেন।

"আঁচরে ঝাপহ আনন চন্দ।
দূরে করে মোতিম কিঙ্কিণী বন্ধ॥
নূপুর মুখ ভরি ওনক পুঞ্জ।
মন্থর গতি চল কোল নিকুঞ্জে।"

'তিমিরাভিসার' ক্ষেত্রে সব আভরণই নীল।

"নিলীম মৃগমদে, তনু অনুরঞ্জই
নিলীম হার উজোর।
নীল বলয়াগণ, ভুজযুগ মণ্ডিত
পহিরলি নীল নিচোল॥"

এই রূপাভিসার পর্যায়টির প্রাচীনকালের শ্রেষ্ঠ গায়কদের মধ্যে প্রধান ছিলেন পাঁচথুপির কৃষ্ণদয়াল চন্দ মহাশয়। এ গান শুনেছেন এমন কোন ব্যক্তির সাক্ষাৎ না পাওয়া গেলেও এটি সকলের মুখেই শোনা যায় যে "চন্দজীর অভিসার হ'ল রাঢ়দেশের জৌলুষ।" এ ছাড়া ময়নাডালের প্রসিদ্ধ গায়ক রাসবিহারী মিত্র ঠাকুর, শান্তিপুরের অবধৌত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের অভিসার গানের খ্যাতি সর্বজনবিদিত।

বাসকসজ্জিকা

যে নায়িকা কান্তের ইচ্ছাবশত আপন কুঞ্জে অবস্থান করে তাঁর আগমন প্রতীক্ষায় নিজের দেহ ও গেহ সুসজ্জিত করেন তিনিই হলেন "বাসকসজ্জিকা" নায়িকা। এমন নায়িকা সর্বদাই কান্তের আগমনপথ নিরীক্ষণ করেন, সখীদের সংগে পারস্পরিক বিনোদনাত্মক বাক্য বিনিময় করেন এবং ঘন ঘন দূতীর প্রতি নিরীক্ষণ করেন। এই 'বাসকসজ্জা' পালা পৃথকভাবে তেমন গাওয়া হয় না, 'মানভঞ্জন' পালায় প্রথম পর্যায়ের অংশ হিসাবে দু'একটি গান গাওয়া হয়। এর মধ্যে গোবিন্দদাস বিরচিত প্রসিদ্ধ একটি পদ হ'ল—

"সাজল কুসুম, শেয পুন সাজই
জারই জারল বাতি।
বাসিত খপুরে, কর্পূর পুনঃ বাসই
ভৈ গেল মদন ভরাতি॥
আজু রাই সাজল বাসক সেজ।
মনমথ লাখ, মনোরথে ধাবই
অংগে অংগে নাহি তেজ॥
ঘন ঘন আভরণ অংগে চড়ায়ই
ক্ষণে ক্ষণে তেজই তায়।
সচকিত নয়নে, চমকি খেনে উঠই
হেরই নিজ তনু ছায়॥
কাতর বচনে, সম্ভাষই সহচরী
কাহে বিলম্বায়ত কান।
গোবিন্দ দাস, কহই অব না শুনিয়ে
সংকেত মুরলী নিসান॥"

এ গানটি সবচেয়ে ভাল পরিবেশন করতেন দক্ষিণখণ্ডের প্রয়াত যামিনী মুখোপাধ্যায়।

উৎকণ্ঠিতা

কান্তের আগমনে বিলম্ব দেখে যে নায়িকা উৎসুকচিত্তা হয়ে পথ নিরীক্ষণ করেন এবং বিশেষ বিরহ উপভোগ করেন তাঁকেই বলা হয় 'উৎকণ্ঠিতা' নায়িকা। এ নায়িকা যে কয়টি বিশেষ অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে থাকেন, সেগুলি হ'ল—হৃত্তাপ, কম্প, হেতু বিতর্ক, অরতি, বাষ্পমোচন এবং নিজের অবস্থা বর্ণনাদির চেষ্টা। এ পালাটিও মানের অংশবিশেষ। 'খণ্ডিতা' পালায় প্রথমে দু'একটি উৎকণ্ঠিতা পালার গান অনেক গায়ক গেয়ে থাকেন। এ পালায় বিশেষ পরিচিত এবং প্রসিদ্ধ গানগুলি হ'ল—

"বন্ধুর লাগিয়া, সেজ বিছায়নু
গাঁথিনু ফুলের মালা।
তাম্বুল সাজনু, দীপ উজারনু
মন্দির হইল আলা॥
সই পাছে এ সব হইবে আন।
সে হেন নাগর গুণের সাগর
কাহে না মিলল কান॥
শাশুড়ী ননদে বঞ্চনা করিয়া
আইনু গহন বনে।
বড় সাধ মনে এ রূপ যৌবনে
মিলিব বন্ধুর সনে॥
পথপানে চাহি কত না রহিব
কত প্রবোধিব মনে।
রস শিরোমণি আসিব এখনি
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভনে॥"

এ ছাড়া আর প্রসিদ্ধ গানগুলি হ'ল—

১। "মেরো অঙ্গনে আওয়ব যব রসিয়া।
পালটি হেরব হাম ঈষত হাসিয়া॥"

২। "কানুক সন্দেশ বেশ বনি আয়লু
সঙ্কেত কেলি নিকুঞ্জে।"

বিপ্রলব্ধা

কান্ত কুঞ্জে আসবেন এমন সঙ্কেত করেও যদি দৈবাৎ কোন কারণে না আসতে পারেন, তবে যে নায়িকা অত্যন্ত ব্যথিতা হন তিনিই হ'লেন বিপ্রলব্ধা। এই নায়িকার কয়েকটি দশা লক্ষণীয়। এগুলি হ'ল—নির্বেদ, চিন্তা, খেদ, অশ্রুপাত, মূর্ছা, দীর্ঘনিঃশ্বাস ইত্যাদি। বিপ্রলব্ধা নায়িকার অবস্থার অপূর্ব বিন্যাস পাওয়া যায় বলরামদাসের একটি পদে। রাধারাণী সারা নিশি প্রতীক্ষা করে হতাশাগ্রস্ত হয়েছেন এবং সখীকে বলছেন—

"তেজ সখী কানু আগমন আশ।
যামিনী শেষ ভেল সবহুঁ নৈরাশ॥
তাম্বুল চন্দন গন্ধ উপহার।
দূরহি ডারহ যমুনাক পার॥
কিশলয় সেজ মণি মাণিক মাল।
জলমাহা ডারহ সবহুঁ জঞ্জাল॥"

যামিনী অতিক্রান্ত হ'লে নাগর শ্রীকৃষ্ণ অন্য কুঞ্জে নিশিযাপন করে প্রত্যাগমন করলেন। সখীগণ কৃষ্ণের প্রতি নানা ধরনের কটু বাক্য বললেন। এ প্রসঙ্গে প্রসিদ্ধ গান—

"শুন শুন মাধব নিরদয় দেহ।
ধিক রহু ঐছন তোহারি সুলেহ॥
কাহে কহলি তুহুঁ সঙ্কেত বাত।
যামিনী বঞ্চলি আনহি সাথ॥
কপট লেহ করি রাইক পাশ।
আন রমণী সঞে করহ বিলাস॥"

বিদ্যাপতির এ পদটি 'অনুখন হেরি সখা'-র জোড়া গান। মধ্যম দশকোশী তালে গাইতেন যামিনী মুখোপাধ্যায়।

খণ্ডিতা

নায়ক শ্রীকৃষ্ণ রাধারাণীর কুঞ্জে রাত্রি যাপন করবেন—এমন সঙ্কেত করেছিলেন। কিন্তু কার্যত অন্য নায়িকার কুঞ্জে সারা নিশি যাপন করে অঙ্গে রতিচিহ্নসহ প্রাতঃকালে শ্রীরাধার কুঞ্জে উপস্থিত হয়েছেন। এই রূপ দর্শন করে শ্রীরাধার যে মানসিক অবস্থা তা-ই হ'ল 'খণ্ডিতা' নায়িকার লক্ষণ। এমন অবস্থায় নায়িকার কয়েকটি বিশেষ চেষ্টা প্রকাশিত হয়। যেমন, রোষ, ঘন ঘন নিঃশ্বাস-ত্যাগ, তুষ্ণীভাব ইত্যাদি। এই খণ্ডিতা প্রসঙ্গের বহু প্রসিদ্ধ গান আছে। যেমন—

১। "চন্দ্রাবলী রতি ছরমে ঘুমাওল
কোকিলা কুহু নিশি ভোর।
ঐছন সময়ে চতুর বর নাগর
তেজল তাঁকর কোড়॥"

গানটি 'মধ্যম দশকোশী' অথবা 'বড় লোফা' তালে গাওয়া হয়।

২। "ভাল হইল আরে বঁধু আইলা সকালে।
প্রভাতে হেরিলাম মুখ দিন যাবে ভালে॥
বন্ধু তোমার বলিহারি যাই।
ফিরিয়া দাঁড়াও আগে চাঁদমুখ চাই॥"

'তেওট' তালের এ গানটির অপূর্ব বিন্যাস। শুরু হয় "কে তুমি রাম নও, তোমাকে চিনতে পারি নাই বলে মনে কিছু কইরো না···ঘটকালি দিয়ে। গানটিকে বলা হয় "প্রভাতী তেওট"। এর জোড়া গানগুলি হ'ল—

১। "শারি শুক দুহুঁ জনে উঠিয়া বিহানে।"
২। "কানন দেবীত হেরি নিশি অবসান।"

এ গানের ভিয়ান সবচেয়ে ভালো করতেন কোকিলকণ্ঠ গণেশ দাস ও পরবর্তীকালে যামিনী মুখুজ্যে।

৩। "প্রভাতে পরের বাড়ী কোন লাজে আইস।"

মধ্যম শশিশেখর তালের প্রসিদ্ধ গান।

৪। "ছিল নীলোৎপল শ্রীমুখ মণ্ডল
ঝামরু কাহে ভেল।"

এটি বর্তমানে লোফা তালে গাওয়া হয়। শোনা যায়—প্রাচীনকালে এ গানটি 'ধরা' তালে গাওয়া হ'ত।

৫। "হেদে হে নিলাজ বন্ধু লাজ নাহি বাস।"

মধ্যম দশকোশী গান, অনেকে একতালি তালেও গান করেন।

৬। "রাধে জয় রাজপুত্রি,
মম জীবন দয়িতে।"

গড়াণহাটি তেওট হিসাবে প্রসিদ্ধ গান।

এ গানটির পদকর্তার নাম পাওয়া যায় না। এটি তুকগান হিসাবেই প্রসিদ্ধ। তবে গানটির প্রতিটি চরণের একটি ছত্র সংস্কৃতে অপরটি বাংলায়। যেমন—

"কিঞ্চিত্তব কস্মিন্নপরাধং ন করোমি।
সঙ্কেত করি আন ঘরে যাহ
নিশি জাগরি হামি॥
মানময়ি মুঞ্চ প্রিয়ে বচনং শৃণু ধীরে।
শুনিবার কিবা কাজ আছে চিহ্ন
দেখা যায় সব শরীরে॥"

এমন রচনায় পারদর্শী ছিলেন শ্রীখণ্ডের রাখালানন্দ ঠাকুর শাস্ত্রী। তাই মনে হয় এ পদটিও তাঁরই লেখা।

৭। "উঠে যেতে বলগো উহার
নামে নাই মোর সুখ।"

মধ্যম দশকোশী তালের প্রসিদ্ধ গান।

এ গানের শ্রেষ্ঠ গায়ক ছিলেন অবধৌত বন্দ্যোপাধ্যায়।

৮। "রাইক হৃদয় ভাব বুঝি মাধব
পদতলে ধরণী লোটায়।"

প্রাচীন পদ্ধতির গানটি ধরা তালের 'আধল প্রেমের' জোড়া গান। বর্তমানে গাওয়া হয় তেওট তালে।

৯। "নখপদ হৃদয়ে তোহারি।"

মধ্যম দশকোশী তালের প্রসিদ্ধ গান।

১০। "রাইক অনাদর হেরি রসিক বর
অভিমানে করল পয়ান।"

বীরবিক্রম তালের গান, আখরিয়া হরিদাসের ঘরের।

খণ্ডিতা পর্যায়ে এমন বহু গান ছিল এবং বর্তমানেও আছে। এ পালাটির সুসংগঠিত বিন্যাস গায়ক ফটিক চৌধুরী এবং পরে যামিনী মুখার্জী করতেন।

কলহান্তরিতা

যে নায়িকা অভিমানবশত পাদপতিত বল্লভের উপরেও রুষ্ট হয়ে তাঁকে পরিত্যাগ করেন এবং পরে সখীদের নিকট অনুতাপ করেন তাঁকেই বলা হয় 'কলহান্তরিতা' নায়িকা। কলহান্তরিতা নায়িকার বহুবিধ চেষ্টার মধ্যে প্রলাপ, সন্তাপ, গ্লানি, দীর্ঘনিঃশ্বাস ইত্যাদির প্রকাশই প্রধান। কলহান্তরিতা পালায় প্রচলিত ও অপ্রচলিত গানের সংখ্যানির্ণয় করা কঠিন। অতি প্রচলিত কয়েকটি প্রসিদ্ধ গানের তালিকা নিম্নরূপ।

১। "মান বিরহ জ্বরে পহুঁ ভেল ভোর।"

গৌরচন্দ্রিকার এ গানটি প্রাচীনকালে গাওয়া হ'ত বড় রূপক তালে। গানটি জানতেন নবদ্বীপের নিতাই দাস বাবাজী। বর্তমানে এ গানটির প্রচলিত রূপ হ'ল—যোত সোম তালের জাতগানের মতো।

২। "সারী প্রতি শুক তখন কহিছে বচন।"

দাসপ্যারী তালের এটি উল্লেখযোগ্য গান। রাঢ়দেশে প্রচলিত এ গানটির মুখে মাতন ব্যবহার করা হয়।

২। "কুঞ্জস নিকসই মানিনী রাই।"

একতালি গান, ভীমপলশ্রীর মতো সুর। 'ঘরের বাহিরে' গানের জোড়া একতালির জাতগান।

৩। "আধল প্রেম পহিলে নাহি হেরনু
সো বহুবল্লভ কান।"

প্রথম চরণ ধরা তালের চব্বিশ চাপড়ের গান। 'সো বহুবল্লভ' কাটা দশকোশী। কলহান্তরিতার খুবই আকর্ষণীয় গান।

৪। "চরণ লাগি হরি হার পিন্ধায়ল
যতনে গাঁথি নিজ হাতে।"

'আধল প্রেমের' জোড়া গান। ধরা তালে গাওয়া হয়।

৫। "তিল এক শয়নে স্বপনে যো মঝু বিনে—"

ধরা তালের গান।

৬। "স্বর্ণ বরণ বিবর্ণ ভৈ গেল।
পূর্ণ বিধু মুখ তূর্ণ নিরসল॥"

মধ্যম দশকোশী তালের অতি প্রসিদ্ধ দাগী গান। রসিক দাসের ঘরের গান।

৭। "চরণ নখর মণি রঞ্জিত ছাঁদ।"

প্রসিদ্ধ মধ্যম দশকোশী তালের গান।

৮। "কি কহিলি কাঠিনি কালিদহে পৈঠবি
শুনইতে কাঁপই দেহা।"

প্রসিদ্ধ, মধ্যম দশকোশী তালের দাগী গান।

৯। "শুনইতে কানু মুরলী রব মাধুরী
শ্রবণে নিবারলু তোয়।"

মূলত মধ্যম দশকোশী তালের গান—'চূড়াটি বাঁধিয়া' গানের সুরে গাওয়া হ'ত। বর্তমানে মায়ুর তেওট হিসাবেই গাওয়া হয়ে থাকে।

১০। "কৈছে চরণ কর পল্লব ঠেলালি
বেলালি মান ভুজংগে।"

বড় গানটি অপ্রচলিত। রাধারমণ কর্মকার মহাশয় গাইতেন 'বিষম পঞ্চম' তালে। প্রথম গানটি আসরে শোনালেন কালীপদ চট্টোপাধ্যায়ের গড়পারের বাড়িতে।

১১। "সীদতি সখি মম হৃদয়মধীরমু।"

প্রসিদ্ধ তেওট তালের দাগী গান, 'আলেয়া তেওট' বলে পরিচিত। পরেশচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ দু' একজন এ গানটির প্রাচীন ধরা তালের রূপটি জানতেন।

১২। "হরি বড় গরবী গোপী মাঝে বসই।"

একতালি গান, ঘটকালি সমেত গানটি অপূর্ব দাগী গান।

১৩। "চাহ মুখ তুলি রাই চাহ মুখ তুলি।"

গঞ্জন তালের প্রচলিত একমাত্র গান। বড় দাসপ্যারী গঠনেই বর্তমানে গাওয়া হয়ে থাকে।

১৪। "কি ছার দারুণ মানের লাগিয়া
বন্ধুরে হারায়ে ছিলাম।"

প্রথমে বীরবিক্রম ও পরে মধ্যম রূপক তালের প্রসিদ্ধ গান। এটি দাগী গান।

১৫। "বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচি কৌমুদী।"

কলহান্তরিতা পালার সবচেয়ে প্রসিদ্ধ গান। এটি অষ্টতালে গাওয়া হয়। পরপর আটটি তাল হ'ল—আড়, দোজ, যতি, শশিশেখর, গঞ্জন, পঞ্চম, রূপক, সম। গানটির দ্বিতীয় চরণ—

"স্ফুরদ অধর সীধবে"—গাওয়া হয় ছোট বীরবিক্রম তালের চার আবর্তে,

ময়নাডালের ঘরে পাঁচ আবর্তে। এ গানের ঠেকা পৃথক। 'প্রিয়ে চারুশীলে' থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত মূল আটটি তালের বড় প্রকরণে আখর দিয়ে গাওয়া হয়।

'কলহান্তরিতা' পালায় এমন অসংখ্য দাগী ও জাত গান আছে। বিভিন্ন গায়কের মুখে বিভিন্ন গানের বিন্যাস বিশেষরূপে ফুটে উঠত। এ পালাটি অনেকেই ভালো গাইতেন। তবে শোনা যায়—রসিক দাস, রাধেশ্যাম দাস এবং তাঁদের ঘরের গায়ক নন্দকিশোর দাস পণ্ডিত এ পালাটির অপূর্ব উপস্থাপনা করেন।

প্রোষিতভর্তৃকা

'প্রোষিত' শব্দের অর্থ প্রবাসগত। যে নায়িকার কান্ত দূরদেশে অর্থাৎ প্রবাসে গিয়েছেন সে নায়িকাকে বলা হয় 'প্রোষিতভর্তৃকা'। কৃষ্ণলীলার প্রবাস দুই প্রকারের—নিকট প্রবাস এবং সুদূর প্রবাস। নিকট প্রবাস বলা হয় প্রভাসাদি স্থানে গমন, দূর প্রবাস হ'ল মথুরাদি স্থানে গমন। মথুরায় শ্রীকৃষ্ণের অবস্থান জনিত বিরহব্যঞ্জক বৃন্দাবনলীলাকে বলা হয় মাথুর লীলা। এই সময়ে নায়িকার দেহে আটটি বিশেষ অনুভাব লক্ষ্য করা যায়। এগুলি হ'ল—প্রিয়সংকীর্তন, দৈন্য, কৃশতা, জাগরণ, মালিন্য, অস্বাস্থ্য, জাড্য ও চিন্তা। এ অবস্থায় নায়িকা সাধারণ অভ্যাস থেকে কিছু কিছু বর্জন করে থাকেন। যেমন—হাস্য, ক্রীড়া ও শরীর সংস্কার।

প্রোষিতভর্তৃকা নায়িকার দশটি দশা উপস্থিত হয়। এগুলি হ'ল—

"লালসোদ্বেগ জাগর্য্যা ক্ষীণতাং জড়িমাত্রতা।
বৈয়াগ্র্যং ব্যাধিরোন্মাদো মোহমৃত্যুর্দশা দশঃ॥"

অর্থাৎ ১। কান্তদর্শন জনিত লালসা, ২। কান্তের আগমনে বিলম্ব হেতু উদ্বেগ, ৩। নিদ্রাহীন নিশি যাপন, ৪। বিচ্ছেদ জনিত ভাবনায় তনুর ক্ষীণতা প্রাপ্তি, ৫। দৈহিক জড়তা, ৬। নিরন্তর ব্যাকুলতা, ৭। দেহে ব্যাধির লক্ষণ প্রকাশ, ৮। সমাজ জীবনে উন্মত্তের ভাব, ৯। মোহগ্রস্ত অবস্থা এবং ১০। মৃত্যু-দশা অর্থাৎ কান্তবিচ্ছেদ জনিত বেদনায় চেতনারহিত—মৃত্যুসম অবস্থা প্রাপ্তি। এই দশটি দশারই উল্লেখ আছে জ্ঞানদাস বিরচিত একটি প্রসিদ্ধ দুঠুকী তালের গানে।

"অপরূপ তুয়া মুরলী ধ্বনি।
লালসা বাড়ল শব্দ শুনি॥
কিরূপে এরূপ দেখিয়া সেহ।
উদ্বেগে ধরিতে না ধরে দেহ॥
জাগিয়া হইল শরীর ক্ষীণ।
অসিত চান্দের উদয় দিন॥

জড়িম হৃদয়ে করত ভেদ।
অতি বেয়াকুল করত খেদ॥
পাণ্ডুর চবণ বেয়াধি বাধা।
মুরছি নিশ্বাস হরল রাধা॥
অব যদি তুহুঁ মিলহ তায়।
গোকুল মঙ্গল সভাই গায়॥
জ্ঞানদাস কহে শুনহ শ্যাম।
জীবন ঔষধি তোহারি নাম॥"

স্বাধীন ভর্তৃকা

নিজের কান্ত যখন নায়িকার অধীন হয়ে তার নিকটে অবস্থান করেন তখন সে নায়িকাকে বলা হয় 'স্বাধীনভর্তৃকা'। এ অবস্থায় নায়ক স্বহস্তে নায়িকার মনের মতো বেশভূষা, অলঙ্কারাদি দ্বারা মণ্ডনক্রিয়া সম্পন্ন করেন। তাছাড়া, নায়িকার সুখের নিমিত্ত তারই আদেশে বনবিহার, জলকেলি, কুসুমচয়ন ইত্যাদি কর্ম করতে প্রবৃত্ত হন। এই স্বাধীনভর্তৃকা নায়িকার অবস্থা কীর্তন গানের বিভিন্ন পালায় নানাভাবে বর্ণিত হয়ে থাকে। কুঞ্জভঙ্গ পালাতে প্রসিদ্ধ দুঠুকী গান আছে—

"হাব নিজ আচরে রাই মুখ মুছয়ি
কুঙ্কুমে তনু পুন মাজ।
অলকা তিলকা দেই কেশ বনায়ই
চিকুরে কবার পুন সাজি॥
সিন্দুর দেয়ল সিঁথে।
কতহুঁ যতন কাব উরপর লেখই
মৃগমদ চিত্রক পাঁতে॥
মণি মঞ্জীর চরণে পরাওলি
উরপর দোলি হার।
কপূর তাম্বুল বদন ভরি দেয়লি
নিছই তনু আপনার॥
নয়নক অঞ্জন করল সুরঞ্জন
চিবুকহি মৃগমদবিন্দু।
চরণকমল তলে যাবক লেখই
কি কহব দাস গোবিন্দ॥"

অনুরূপ 'স্বাধীনভর্তৃকা' পর্যায়ে এত বেশী গান আছে যে এটি একটি পালা হিসাবেও গাওয়া হোত। এর অন্যান্য প্রসিদ্ধ গানগুলির মধ্যে আছে—

২। "রাইমুখ পংকজ কুংকুমে সাজল
বসনহি পুলক অগোর॥"

২। "চিরহী নিরখি চমকি ঘন পুলকিত
কাজরে কাঁপয়ে কাম।"

এর মধ্যে প্রথমটি মধ্যম দশকোশী তালের এবং দ্বিতীয়টি তেওট তালের প্রসিদ্ধ গান। এ পর্যায়ে বিশেষ বিশেষ কিছু গান সংরক্ষিত ছিল হাওড়া রামকৃষ্ণপুর অঞ্চলের প্রয়াত গৌরগোপাল গোস্বামী মহাশয়ের নিকট। তাঁর সূত্র থেকে কিছু গান আহরণ করেছিলেন লেখকের সংগীতগুরু প্রয়াত রাধারমণ কর্মকার। তাঁর নিকট আরও বড় গানের মধ্যে ছিল—বড় রূপক তালের গান "পদ্মাবলী হৃদি মম" বড় আড়তালের গান "আনন্দে সুবদনী কিছু নাহি জান"। ইত্যাদি।

অষ্টনায়িকার এসব রসবিন্যাস ছাড়াও আরও বহুবিধ রসবর্ণনার লক্ষণ কীর্তন গানের সূত্রে প্রচারিত হয়। যেমন—"প্রেমবৈচিত্ত্য"। এ অবস্থায় নায়ক ও নায়িকা পরস্পরের সন্নিধানে উপস্থিত থেকেও প্রেমের উৎকর্ষতা হেতু বিচ্ছেদ-জনিত সাময়িক বিরহব্যাকুল হয়ে ওঠে। প্রেমবৈচিত্ত্যের লক্ষণ মিলনের পর লক্ষ্য করা যায়। রসালস, ঝুলন ইত্যাদি লীলাপর্যায়ে এমন অনেক গান আছে।

মানান্তে মিলনের পর বিশেষ একতালি তালের গান আছে যাতে শ্রীরাধার প্রেমবৈচিত্ত্য লক্ষণ দেখা যায়—

"রোদতি রাধা শ্যাম করি কোর।
হরি হরি কাহাঁ গেও প্রাণনাথ মোর॥
জানলু রে সখি প্রেম অগেয়ান।
নাগরী কোরে নাগরী নাহি জান॥"

আলস পর্যায়ে প্রেমবৈচিত্ত্যে সুপ্রসিদ্ধ দশকোশী তালের গান হ'ল—

"শ্যামক কোরে যতনে ধনী শুতলি
মদন মদালসে ভোর।
ভুজে ভুজে বন্ধন নিবিড় আলিংগন
জনু কাঞ্চন মনি জোর॥"

ঝুলনলীলা প্রসংগে আছে—"দুহুঁ কোলে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া। ইত্যাদি।" এমন আরও বহু গানের সন্ধান আছে। এছাড়া কীর্তন গানের মাধ্যমে 'কিলকিঞ্চিৎ' ভাবের প্রকাশ আছে। যে অবস্থায় আনন্দ হেতু ভাবের সাতটি লক্ষণ যুগপৎ বা কয়েকটি লক্ষণ সমন্বিতভাবে নায়িকার মধ্যে প্রকাশিত হয় সে অবস্থাকেই বলা হয় কিলকিঞ্চিৎ ভাব। এমন ভাবের বিন্যাস বেশী দেখা যায় দানলীলা প্রসংগে। এই সাতটি ভাব হ'ল—গর্ব, অভিলাষ, রোদন, হাস্য, অসূয়া, ভয় এবং ক্রোধ। এরই মিশ্রিত প্রকাশে কিলকিঞ্চিৎ ভাবের লক্ষণ পাওয়া যায়।

নবম অধ্যায়

কীর্তন গানের বাদ্যযন্ত্র

প্রাচীনতম কাল থেকে ভারতীয় বাদ্যযন্ত্রগুলিকে চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। এগুলি হ'ল :

১। তত যন্ত্র—তন্ত্র বা তারযুক্ত বাদ্যযন্ত্র। —বীণা, সেতার ইত্যাদি।

২। সুষির যন্ত্র—বায়ুচালিত বাদ্যযন্ত্র। —বংশী, শঙ্খ ইত্যাদি।

৩। আনদ্ধ যন্ত্র—চর্মাচ্ছাদিত বাদ্যযন্ত্র। —মৃদঙ্গ, মুরজ ইত্যাদি।

৪। ঘন যন্ত্র—ধাতুনির্মিত বাদ্যযন্ত্র। —ঘণ্টা, করতাল ইত্যাদি।

"ততম্ চৈবানদ্ধম চ ঘনম সুষিরমেব চ।
চতুর্বিধম তু বিজ্ঞেয়মাতোদ্যম লক্ষণান্বিতম্॥
ততম্ তন্ত্রীগতম জ্ঞেয়মবনদ্ধম তু পৌষ্করম্।
ঘনম্ তালস্তু বিজ্ঞেয়ঃ সুষিরোঃ বংশ উচ্যতে॥"

(নাট্যশাস্ত্র ২৮ অধ্যায়ের ১—২)

অতি প্রাচীনকাল থেকেই কীর্তন বা কীর্তন জাতীয় গানে এই চার প্রকার বাদ্যযন্ত্রই ব্যবহার করা হ'ত। কীর্তনে ব্যবহৃত 'তত' শ্রেণীর যন্ত্রের মধ্যে ছিল 'বীণা', 'সপ্তস্বরা', 'তম্বুরা', 'কপিলাস' ইত্যাদি। পরবর্তীকালে বেহালা, এসরাজ ইত্যাদি যন্ত্রও ব্যবহার হ'ত। বৈঠকী গানের ক্ষেত্রে এসব 'তত' যন্ত্রের প্রয়োগ ছিল অত্যাবশ্যক কিন্তু মনোহরশাহী পালাগানে, নগর কীর্তনে বা প্রাচীন পদ্ধতির নামকীর্তনে এ যন্ত্রের প্রয়োগ নাই। বৈঠকী গানের বড় গায়কদের মধ্যে ছিলেন বনমালী দাস, রাসবিহারী মিত্র ঠাকুর, সুজন মল্লিক, গৌরগুণানন্দ ঠাকুর প্রমুখ। তাঁদের অনেকেই তানপুরা ব্যবহার করতেন। কিন্তু মনোহরশাহী ধারার মূল ধারক হলেন—কৃষ্ণদয়াল চন্দ, দামোদর কুণ্ডু, অনুরাগী দাস, অবধৌত বন্দ্যোপাধ্যায়, ফটিক চৌধুরী, যামিনী মুখোপাধ্যায় প্রমুখ এবং তাঁদের পুত্র পৌত্রাদি ও শিষ্যবর্গ। তাঁদের কেউই তানপুরা, বীণা, বেহালা ইত্যাদি যন্ত্র গানের সঙ্গে ব্যবহার করতেন না। বৈঠকী গায়কদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন ধ্রুপদ গানে পারদর্শী। কাহিনী সূত্রে জানা যায় যে গিরিধারী দাস নামক সুবিখ্যাত কীর্তনগায়ক ধ্রুপদ গান বিশেষভাবে শিক্ষা করার পর নবদ্বীপ আসেন। সেখানে ছিলেন গৌরগোবিন্দ ভাগবতস্বামী। তিনি ছিলেন অত্যন্ত উচ্চমার্গের সাধক ও গুরু, তাছাড়া, তিনি নিজেও বাল্যবয়সে ধ্রুপদ গানের চর্চা করেছিলেন বলে জানা যায়। গিরিধারী দাসজী নবদ্বীপে শ্রীভাগবত—স্বামীকে ধ্রুপদ গান শোনালে স্বামীজি তাঁকে বৃন্দাবনে গিয়ে ভক্তিচরণ দাসের সঙ্গে থেকে কীর্তন গান শিখতে উপদেশ দেন। তারপর থেকেই তিনি কীর্তনীয়া

রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। ভক্তিচরণ দাসজী, পণ্ডিত দাসজী—এঁরা সকলেই সংগীতজীবন শুরু করেন ধ্রুপদ গান শিক্ষার মাধ্যমে। তাই তাদের কণ্ঠ ছিল সুরে ভরা, নানা ধরনের 'গমক' উৎপাদনে পটু, ধ্রুপদী পদ্ধতির দুই স্বর থেকে সাত স্বর পর্যন্ত নানা ধরনের ছোট বড় 'মীড়' প্রকাশে সক্ষম। কীর্তনের প্রয়োজনীয় 'গিটকিরি' ও 'জমজমা' প্রয়োগেও তাঁরা ছিলেন পারদর্শী। সপ্তকের মূল স্বর সম্পর্কে তাঁদের সচেতনতা ছিল অনেক বেশী, তাছাড়া দোহারের কণ্ঠে গানগুলি ধরে রাখা হ'ত, তাই স্কেল পরিবর্তনের কোন সম্ভাবনা থাকত না। সবগুলি গলাই মোটামুটি সুরের থাকত তাই তারযন্ত্রের তেমন কোন প্রয়োজনীয়তা অনেকেই বোধ করেন নাই। মূল গায়ক, দোহার এবং বাজিয়ে—সকলকে দাঁড়িয়ে মনোহরশাহী পদ্ধতির পালাগান গাইতে হয়। সেজন্যই সম্ভবত কীর্তনের সঙ্গে এ ধরনের বাদ্যযন্ত্র প্রয়োগ কমে গিয়েছিল।

কোকিলকণ্ঠী গণেশ দাসের দলে কোন তারযন্ত্র ছিল না। রসিক দাস বলতেন—"গলাই হ'ল সবচেয়ে বড় যন্ত্র। ও সব কাওলাতি গানের যন্ত্র শুনে কি মহাপ্রভুর প্রেম হয়?" অনেকে বলতেন "হারমনিয়ম জাতীয় যন্ত্র থেকে উৎপন্ন স্বরগুলির তীব্রতা সাধনবিরোধী এবং কামোদ্দীপক।" এ ধারণাগুলি ব্যক্তি-বিশেষের মতামতভিত্তিক, সার্বজনীন কোন ধারণা নয়। অবশ্য এসব ধারণার জন্যই আজ পর্যন্ত অনেক নাটমন্দিরে এসব যন্ত্র বাজানো হয় না।

অন্যদিকে বাঈ সম্প্রদায়ের যেসব কীর্তন গায়িকা ছিলেন তাঁরা তানপুরা, বেহালা, হারমোনিয়ম, ক্ল্যারিওনেট ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করতেন। পান্নাবাঈ-এর দলে থাকত জুড়ি হারমনিয়ম অর্থাৎ দু'টি যন্ত্র, পটলবাঈ-এর দলে সব যন্ত্রই থাকত। কমলা ঝরিয়ার দলে হারমনিয়ম, বেহালা ইত্যাদি সবই থাকত। ধ্রুপদ ও অন্যান্য রাগসংগীতে অসাধারণ পারদর্শী ছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র দে। কীর্তন গানে তিনি প্রথিতযশা হয়েছিলেন। তিনি তানপুরা, হারমনিয়ম ইত্যাদি ব্যবহার করতেন। যেসব গায়ক বা গায়িকা ঢপগানের ধারা অবলম্বন করে গান করেছেন তাঁরা সকলেই যন্ত্র ব্যবহার করেছেন। যেমন ছিলেন কৃষ্ণযাত্রার প্রসিদ্ধ রচয়িতা ও গায়ক কৃষ্ণকমল গোস্বামী, কীর্তনীয়া নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়, কীর্তনীয়া মুকুন্দদাস, কীর্তনীয়া বনো সম্প্রদায়, কীর্তনীয়া রামকমল ভট্টাচার্য, কলকাতার কীর্তনীয়া ভূপেন বসু প্রমুখ আরও অনেকে। তাছাড়া কীর্তন-ধর্মী মংগল গান ও রামায়ণ গানের ক্ষেত্রেও তারযন্ত্রবাদন ছিল আবশ্যকীয়। গায়কের যুক্তিতে বা গানের খাতিরে এসব যন্ত্র প্রয়োগে কোন বাধা থাকা উচিত নয় কিন্তু ভক্তদের অনুভবজনিত নির্দেশেই সংস্কার গড়ে উঠেছে, সেজন্যই বিশেষ বিশেষ মন্দিরে এসব যন্ত্র নিষিদ্ধ। হারমনিয়ম ব্যবহার সম্পর্কে অনেক গায়কের বিশেষ আপত্তি আছে কারণ তাঁদের মতে কীর্তন গানে বহু ধরনের শ্রুতির ব্যবহার এবং মীড়ের প্রাধান্য আছে। এসব শ্রুতির অবস্থান ও মীড়ের প্রয়োগ

হারমনিয়ম দ্বারা সম্ভব নয়, কেবলমাত্র খালি গলায়ই এসব প্রয়োগ সম্ভব।

'সুষির' শ্রেণীর যন্ত্রের মধ্যে বাঁশী, শিঙ্গা, ক্ল্যারিওনেট যন্ত্রগুলি কীর্তন গানে প্রাচীনকাল থেকেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বিশেষত নামকীর্তন ও নগর সংকীর্তনে এসব যন্ত্র আবশ্যকীয় হিসাবে গণ্য হয়ে থাকে। প্রাচীনকালের বৃন্দগানেও বাংশিক রাখা হোত। পরবর্তীকালে সানদার বা সানাই ও ক্ল্যারিওনেট বাদক কীর্তনের সংগীতিয়া হিসাবে থাকত। অক্ষয় গোলদারের দলে সানাইবাদক ছিলেন রাধিকা, মেদিনীপুরের বড় মুল গায়েনের দলে ছিলেন পা-কাটা তুলসীচরণ, বাঁশীতে প্রসিদ্ধ ছিলেন সূর্য শীল (বাঁশীয়াল), কেষ্ট কাউলাত, কাটোয়ার নকড়ি দাস প্রমুখ অনেকে। এঁরা সকলেই মূলত কীর্তন দলের বাদক ছিলেন। অবশ্য কখনও কখনও যাত্রার দলেও যেতেন। বরিশালের সদানন্দ বৈরাগীর দলে আড়বাঁশীওলা ছিলেন, পান্নার দলে, নট্টদের দলে, বুনোদের দলে ওস্তাদ আড়বাঁশীওলা ছিল। তাঁরা কীর্তন গানের সহকারী হলেও সব ধরনের গানেই পারদর্শী ছিলেন।

করতাল

ঘন শ্রেণীর যন্ত্রের মধ্যে কীর্তনে বহুল প্রয়োগ হয় 'করতাল', 'ঝাজ', 'জগঝম্প', 'রাম করতাল', 'কাঠ করতাল', 'খঞ্জনী', 'মন্দিরা', 'নূপুর', 'কাঁসর',



'পেটাঘড়ি' ইত্যাদি। তাছাড়া 'চটা বাজনা' 'লোহার পাতি' ইত্যাদিও কীর্তনের সঙ্গে ব্যবহার হয়ে থাকে। 'করতাল' ছাড়া কীর্তন হওয়া উচিত নয়, কারণ এটি কীর্তনের আবশ্যকীয় যন্ত্র। চৌত্রিশ পদাবলীতে উল্লেখ আছে—"খেলিবার প্রবন্ধে কৈলেন খোল করতাল", অর্থাৎ প্রচলিত করতালের রূপটিও

শ্রীচৈতন্যের সৃষ্ট। প্রাচীনতম কীর্তন গোষ্ঠীর বর্ণনায়ও পাওয়া যায়—

"গোবিন্দ মৃদঙ্গ লৈয়া বাজায় তাত্তা থৈয়া থৈয়া
করতালে অদ্বৈত চপল।"

কীর্তন গান তালপ্রধান, তাই তালের দিশা দেখাবার জন্য করতাল যন্ত্রটি একান্ত আবশ্যকীয়। কীর্তন গানে যখন 'মাতন' শুরু হয় তখন করতাল জগঝম্প ইত্যাদি সবই একসঙ্গে বেজে উঠে। এর দরুন কীর্তন গানের ধ্বনি সুদূরপ্রসারী হয়ে থাকে। কীর্তনীয়াদের প্রায় সকলের হাতেই একজোড়া করে করতাল রাখার বিধি সুপ্রাচীন কাল থেকেই চ'লে আসছে। প্রাচীন পদে করতালের 'ঝন ঝন' 'রন রন' ইত্যাদি ধ্বনি উৎপাদনের উল্লেখ আছে। 'করতাল' মূলত শ্রীখোল যন্ত্রের সহায়ক হিসাবেই ব্যবহার হয়।

করতালের নিজস্ব কোন বোল নাই তবে শব্দের তারতম্য করার পদ্ধতি আছে। করতাল জোড়া হাতে ধরবার জন্য দু'টির মধ্যস্থলের ছিদ্র দিয়ে দুটি নরম কাপড়ের দাঁড় ঢুকিয়ে রাখা হয়। সাধারণত ঐ দাঁড় দুটি দু'হাতের তর্জনীতে জড়িয়ে নিলে করতাল ছুটে যাবার ভয় থাকে না। না জড়িয়েও কেবল অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনী দিয়ে দাঁড় দু'টিকে ধরে নিয়ে বাজানো যায়। তিন রকম আঘাত করে করতাল বাজানো হয়ে থাকে।

(১) দু'হাতে করতাল দুটির দাঁড় ধরে একটি করতালের পূর্ণ বৃত্তটির উপরে অপর করতালের পূর্ণ বৃত্তটি দিয়ে আঘাত করে ডান হাতের করতালটি বাম হাতের করতালের কিনারায় লাগিয়ে ঘুরিয়ে নিতে হয় তবে শব্দের রেশ থাকে। এতেই ঝন্ ঝন ঝনাৎ ইত্যাদি শব্দ করতালে সৃষ্টি করা যায়। জুয়ানী বাদ্যের সঙ্গে বা মাতনের সময় এমন জোরালো শব্দ করে করতাল বাজানো হয়ে থাকে। করতাল নির্মিত হয় কাঁসা দিয়ে। উৎপাদিত ধ্বনি লৌহজ হলেও সুমিষ্ট এবং ধ্বনির মধ্যে মাঙ্গলিক অনুভূতি পাওয়া যায়।

(২) বাঁ হাতের করতালটি চিৎ করে ধরে রেখে ডান হাতের করতালটির অর্ধাংশ বা তার কম দিয়ে আঘাত করে তাল রক্ষার জন্য শব্দ সৃষ্টি করা হয়ে থাকে। এতে কন্ কন্, চন্ চন্, টন্ টন্ ইত্যাদি ধ্বনি সৃষ্টি হয়। তাল উপস্থাপনে শুধু সশব্দ ক্রিয়াটি উৎপাদনের জন্য এমন শব্দ করা হয়ে থাকে। কীর্তনের আপত্তনের সঙ্গে সোম তালের মতো বড় ঘরের আটমাত্রিক অঙ্গ সমন্বিত তালগুলির মূল অংশ গাইবার সময়, নামকীর্তনের ক্ষেত্রে এবং আরও অনেকক্ষেত্রে গায়ক ও বাদকের রুচি অনুযায়ী করতাল বাজানো হয়।

(৩) বাঁ হাতের করতালটি ধরে ডান হাতের করতাল দিয়ে ঐটির কিনারায় খাড়া করে আঘাত করে নানা ধরনের শব্দ করা যায়। কখনও ডান হাতের করতালটি হাতে আটকে নিয়ে চাপা শব্দ করা যায় আবার কখনও খোলা শব্দ। এ ধরনের আঘাত দ্বারা কট্ কট্, ঠুং ঠুং ইত্যাদি শব্দ সৃষ্টি হয়।

কীর্তন গানের সংগে করতাল বাদনের নানাবিধ কারণ আছে। যেমন,

(১) গানের তালটি রক্ষা করা এবং তালের ঝোঁকটি সর্বজনবোধ্য করে শ্রোতার মধ্যে ঐ ছন্দটি সঞ্চার করা।

(২) জোরালো শব্দ উৎপাদন করে কীর্তনের মাংগলিক ধ্বনিকে অনেক দূর পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা।

(৩) করতাল বাদন সহজ বলে, অনেকের হাতেই একজোড়া করে করতাল থাকে। কীর্তনের সংগে দাঁড়িয়ে ঐ করতাল বাজালে নাচের ভাব দেহের মধ্যে জাগে।

(৪) যে করতালে কীর্তন গানের সংগে ব্যবহার হয় তা তৈরি করেছিলেন শ্রীচৈতন্যদেব, তাই তার-মধ্যে মংগল আরোপিত আছে—এমন ধারণা থাকায় কীর্তনে করতাল প্রয়োগ আবশ্যকীয়।

(৫) কীর্তনের বিলম্বিত তালের মাত্রা দেখানোর জন্য হস্তক্রিয়া আবশ্যকীয়। সশব্দ ক্রিয়া ছাড়া নিঃশব্দ ক্রিয়ার সময়েও করতালটি হাতে নিয়ে কাল, ফাঁক, কোশী ইত্যাদি দেখালে নাচের মুদ্রার মতো কতগুলি মুদ্রা ফুটে ওঠে তাতে সভা সৌন্দর্য বৃদ্ধি হয়।

(৬) খোল বাজনার ছন্দটি রক্ষা করার গুরু দায়িত্ব থাকে করতালের।

শ্রীখোল

কীর্তনে ব্যবহৃত প্রধান 'অবনদ্ধ' বা 'আনদ্ধ' যন্ত্রই হ'ল 'খোল' বা শ্রীখোল। 'খোল' নামটিই আঞ্চলিক নাম হিসাবে অতি প্রচলিত নাম, তবে যেহেতু এ যন্ত্রটিকে একটি বিশেষ মাংগলিক যন্ত্র বলে স্বীকার করা হয় এবং শ্রীচৈতন্যদেব নিজে এই যন্ত্রের রূপকার বলে ধরে নেওয়া হয়, সেহেতু যন্ত্রটির নামের পূর্বে বৈষ্ণবীয় সংস্কার অনুযায়ী 'শ্রী' শব্দটি যুক্ত করে 'খোল'কে 'শ্রীখোল' আখ্যা দেওয়া হয়। তা ছাড়া প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যায় যে ব্রহ্মলোকে দেবতাগণ যেমন শান্তিতে বিরাজ করেন তেমনি 'শ্রীখোলের' অন্তস্থলেও তাঁরা সমান শান্তিতে সর্বদাই বিরাজ করেন।

> "মধ্য দেশে মৃদঙ্গস্য ব্রহ্মা বসতি সর্বদা।
> যথা তিষ্ঠন্তি তল্লোকে দেবা অত্রাপি সংস্থিতাঃ।
> সর্বদেবময়ো যস্মাস্মৃদঙ্গঃ সর্বমঙ্গলঃ॥"
>
> (সঙ্গীত পারিজাত)

ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে আছে :

> "মর্দল আনদ্ধশ্রেষ্ঠ মৃদঙ্গাখ্যা তার।
> কাষ্ঠ-মৃত্তিকা-নির্মিত—এ দ্বয় প্রকার॥
> সর্ববাদ্যোত্তম এ মর্দল-সংযোগেতে :

সর্ববাদ্য শোভা পায়—বিদিত শাস্ত্রেতে ॥
মৃদঙ্গে ব্রহ্মাদি-দেব স্থিতি নিরন্তর।
পরম মঙ্গল ধ্বনি সর্বমনোহর ॥

(৫।৩।১২৩-২৫)

এ ছাড়া 'কাজী উদ্ধার' লীলা প্রসঙ্গে মায়াপুরের কাজী সংকীর্তন দলের খোল ভেঙে রাত্রিতে স্বপ্ন দেখেছিলেন যে ভাঙা খোলের মধ্যভাগ থেকে নৃসিংহ মূর্তি আবির্ভূত হয়ে নখাগ্র দিয়ে কাজীর উদর ভেদ করতে বসেছেন। এর থেকে খোলের মধ্যে দৈব প্রভাবের বিশ্বাস সকলের মনেই দৃঢ় হয়েছিল। অধিকন্তু খোলের থাকে বত্রিশটি টানা। খোল আঘাত করে শব্দোৎপাদন করলে বত্রিশ অক্ষরযুক্ত ষোলটি নাম অর্থাৎ তারকব্রহ্ম নাম উচ্চারণের সমান ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। এসব বিশ্বাস ও ধারণা থেকে স্বভাবতই খোলের প্রতি মানুষের একটি পবিত্র অনুভূতি হয়। সেজন্যই খোলকে 'শ্রীখোল' আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে।

'খোল'—এই নামটি কখন বা কাদের দ্বারা আরোপিত হয়েছিল তা' সুস্পষ্ট নির্ধারণ সম্ভব হয় নাই। কীর্তন সম্প্রদায়ের যেসব প্রাচীন আলেখ্য পাওয়া গেছে সেগুলিতে যে আনদ্ধ যন্ত্রটি ব্যবহার হ'ত আকারগত বিচারে তা প্রায় একই এবং অনেকটা বর্তমান শ্রীখোলের মতোই। উড়িষ্যার রথযাত্রা উৎসব উপলক্ষে যখন শ্রীচৈতন্যদেব সাতটি সম্প্রদায় গঠন করেছিলেন তখন সেই 'সাত সম্প্রদায়ে বাজে চৌদ্দ মাদল'— এমন উল্লেখ আছে শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থে। তাই 'মাদল' নামটি প্রাচীন। পণ্ডিতবর্গ এ যন্ত্রটিকেই আবার 'মৃদঙ্গ' বলে আখ্যা দিতেন। গোবিন্দ যে যন্ত্রটি বাজাতে পারদর্শী ছিলেন তার নাম ছিল 'মৃদঙ্গ'। আবার নরোত্তম দাসের সময় খেতরির মহোৎসবে দেবীদাস যে যন্ত্রটি বাজিয়েছিলেন —সেটির নামও ছিল 'মাদল'। শান্তিপুরের অধিবাস প্রসঙ্গে বংশীদাসের পদে পাওয়া যায় 'আজি খোল মঙ্গলি রাখবে আনন্দ করি'। চতুর্দশ পদাবলীতে পাওয়া যায় 'খেলিবার প্রবন্ধে কৈলেন খোল করতাল।' এছাড়া সমসাময়িক অনেক গ্রন্থেই 'খোল' শব্দটির ব্যবহার আছে। স্পষ্টই বোঝা যায় একই যন্ত্র বিভিন্ন নামে পরিচিত হয়েছে। 'মাদল' নামটি উড়িষ্যা বা তৎসন্নিহিত অঞ্চলে বিশেষ প্রচলিত। মৃদঙ্গ নামটি প্রচলিত ছিল শিক্ষিত সমাজে এবং 'খোল' নামটি প্রচলিত ছিল বঙ্গসমাজের সাধারণ লোকের কাছে। প্রকৃতপক্ষে যন্ত্রটি হ'ল আদি 'মৃদঙ্গ'। ঐটির মূল শরীরটি একটি বিশেষ ধরনের খোল অর্থাৎ অভ্যন্তর শূন্য যবাকৃতি বা পটলাকৃতি দ্বিমুখী আঙ্কিক আনদ্ধযন্ত্র। যেহেতু খোলটিই প্রধান এবং খোলের আকারগত বৈশিষ্ট্যের উপর শব্দগাম্ভীর্য নির্ভর-শীল সেহেতু যথার্থভাবেই ঐ যন্ত্রটিকে 'খোল' নামে আখ্যা দেওয়া হয়েছিল।

আদি মৃদঙ্গের খোলটি ছিল দেড় হাত পরিমাণ লম্বা। "সার্দ্ধহস্ত প্রমাণন্তু দৈর্ঘ্যমস্য বিধীয়তে।" বর্তমানের শ্রীখোলের দৈর্ঘ্যও তার সমান। তবে কোন্

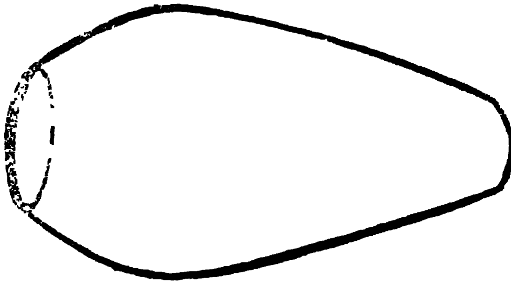
সময়ে এই খোলটির মধ্যভাগ স্ফীত করা হয়েছিল তার সঠিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। মৃদঙ্গের বাঁয়ার মাপ বার কিংবা তের আঙ্গুল, আর ডাইনার মাপ বাঁয়ার থেকে এক দেড় আঙ্গুল কম।—

"ত্রয়োদশাঙ্গুলং বামমথবা দ্বাদশাঙ্গুলম্,
দক্ষিণঞ্চ ভবেৎধীনমেকেনার্ধাঙ্গুলেন বা"।

খোলের বাঁয়া মৃদঙ্গের বাঁয়ার সমান কিন্তু ডাইনা ক্রমশ ছোট, বর্তমানে ছয় কিম্বা সাড়ে ছয় আঙ্গুলে এসে দাঁড়িয়েছে। ডাইনা ছোট করার কারণ সম্ভবত চড়া সুর ধরে রাখার জন্য। মৃদঙ্গের রূপ বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তন হয়ে 'মাদল', 'মুরজ' ইত্যাদি আনদ্ধ যন্ত্রের রূপ নিয়েছে। প্রাচীনকালে এই প্রকরণগুলির 'মাদল' বা 'মর্দল'-এর রূপটি বেশী জনপ্রিয় ছিল। ("আনদ্ধে মার্দল শ্রেয়ান্ ইত্যুক্তং ভরতাদিভিঃ।") "মৃত্তিকা নির্মিতশ্চৈব মৃদঙ্গ পরিকীর্তিত।"— মৃদঙ্গের এই প্রাচীন বৈশিষ্টটি আজ পর্যন্ত খোলের ক্ষেত্রেই বর্তমান। তাই এখনও শ্রীখোলকেই মৃদঙ্গ নামে অভিহিত করা হয়। পাখোয়াজকেও মৃদঙ্গ বলা হয়। তবে এটি হ'ল দারুজ মৃদঙ্গ, মৃত্তিকা নির্মিত নয়। শ্রীখোল হ'ল প্রাচীন মৃদঙ্গেরই অপভ্রংশ এবং মৃদঙ্গের ঘুটি লাগানো, সুরবাঁধা ইত্যাদি অসুবিধা থেকে মুক্ত করে যেখানে যেমন সেখানে তেমন অবস্থায় নগর সংকীর্তনের উপযোগী করে বাজাবার উপযুক্ত করে নির্মিত যন্ত্র।

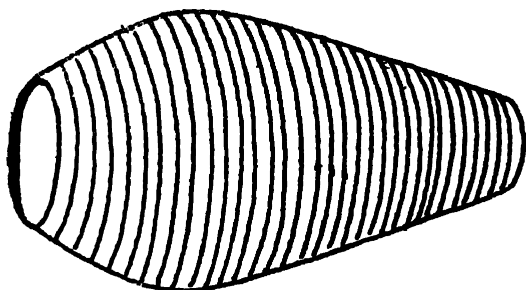
খোলের মাটি

খোলের এই মাটি দেশের বিভিন্ন অংশে তৈরি হয়। আকারেও কিছু তারতম্য হয় এবং মাটি পোড়ার মাত্রানুযায়ী মাটির ওজন, ধ্বনির তারতম্য এবং স্থায়িত্বেরও

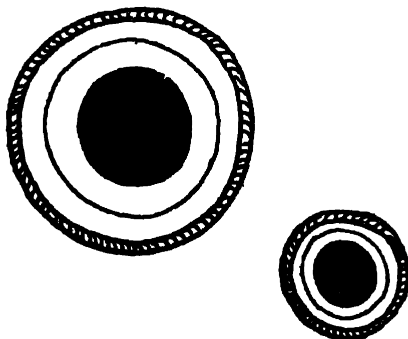


তারতম্য ঘটে। পশ্চিমবঙ্গে এখনও মুর্শিদাবাদ জেলার পাঁচথুপির মাটি সবচেয়ে ভালো বলে গণ্য। তা ছাড়া দেউলটির, জয়নগরের, মান্দারের মাটিও খুব বেশী ব্যবহার হয়। বর্তমানে নবদ্বীপের মাটিও ভালো। এইসব মাটিরই পেট অন্তত আঠার থেকে বিশ আঙ্গুল। এ ছাড়া কিছু পূর্ববঙ্গের মাটি আছে। এগুলির বাঁয়া একটু ছোট, পেটও ছোট এবং একটু লম্বা গড়নের। এগুলির

ডাইনা ততটা খোলা হয় না, বাজাতেও বেশী বলের প্রয়োজন। এদের মধ্যে অবশ্য ঢাকা জেলার বন্দর অঞ্চলে এক ধরনের মাটি আছে যেগুলি লম্বায় একটু ছোট হলেও শব্দের গাম্ভীর্য ও রেশ খুব বেশী। পূর্ববঙ্গের মাটি দিয়ে যে খোলগুলি তৈরি হয় সেগুলি জাত কীর্তনের পক্ষে খুব উপযোগী নয়। নাম কীর্তন, বাউল কীর্তন ইত্যাদির পক্ষে এগুলি উপযোগী। মণিপুরের খোল যার আসল নাম 'পুং' তার আকার অনেকটা বন্দরের মাটির মতো। তবে ডাইনা সাত থেকে আট আঙ্গুল, তাই ঐ খোলের সুর তত চড়া হয় না। তাছাড়া ঐ মাটিগুলির ওজনও খুব বেশী।



খোলের মাটিকে বাঁধন দিয়ে শক্ত রাখার জন্য সমগ্র অংশে পাতলা চামড়ার অত্যন্ত সরু ফিতের মতো কেটে আঠা দিয়ে জড়ানো হয়। এই সরু মোড়কটিকে বলা হয় 'সিক'। অনেকে আবার চামড়ার 'সিক' না দিয়ে সুতোর 'সিক' লাগিয়ে থাকে।

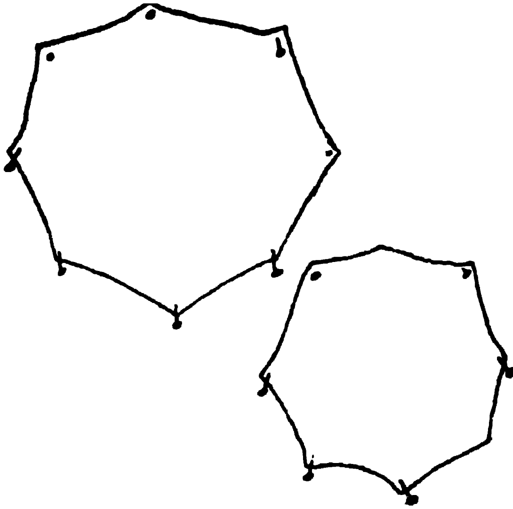


খোলের দুই মুখে দুটি মাপমতো 'চাক' বানানো হয়। মোটা প্রায় সিকি ইঞ্চি মাপের অনেকগুলি চামড়ার কেন্ট মতো তৈরি করে তা বিনুনির মতো বুনিয়ে 'চাক'গুলি তৈরি করা হয়। ছোট 'চাক'টি ছোট মুখে এবং বড়টি বড়

মুখে লাগানো হয়। মাপ যথার্থ মুখের মাপে হওয়া চাই, নচেৎ বসে যাবে। এই 'চাক' বসানোর প্রক্রিয়াকে বলা হয় 'গাথুনি'।

প্রায় এক ইঞ্চি চওড়া মাপের খুব লম্বা একটি চামড়ার ফিতে কাটা হয়। ঐ ফিতেটিকে শুকিয়ে নিয়ে বিভিন্ন মাপের ছিদ্র দিয়ে ঢুকিয়ে ঐ ফিতেটি টেনে ক্রমশ সরু করা হয়। ফিতেটি যখন প্রায় আধ ইঞ্চি পরিমাণ চওড়া হয়, তখন সেটিকে কাজে লাগানো হয়। এই ফিতেটির নাম 'দোয়াল' বা 'কাকড়'। এটিকে ব্যবহার করা হয় দু'টি মুখের টানা রক্ষা করার জন্য। দোয়াল 'সলক' বা গোটা হলেই খোল ভালো হয়। লক্ষ্য করতে হয় যেন চামড়ায় গাঁট না থাকে।

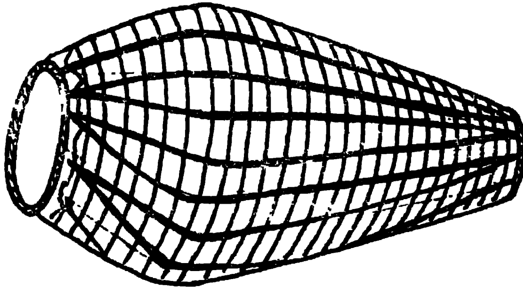
'আনদ্ধ' বাদ্যের মূল বৈশিষ্ট্যই হ'ল এর মাটির মুখ দুটি চামড়া দিয়ে আচ্ছাদিত থাকে। এই চামড়াগুলিকে উপযুক্ত করা বিশেষ খাটুনির কাজ।



বাঁয়ার চামড়া ভালো হয় গরুর পিছনের পায়ের উপরের অংশের এবং ডাইনা ভালো হয় বাছুরের চোয়ালের চামড়া দিয়ে। চামড়াগুলি মুখের মাপের থেকে কিছু বড় করে কেটে বাঁয়ার চামড়া শুধু জলে এবং ডাইনার চামড়া চুনের জলে ভিজিয়ে রাখতে হয়। এর দ্বারা তৈরি করা হয় বাঁয়ার 'আলাতলা' এবং ডাইনার 'চুনাতলা'। নরম হলে ঐগুলিকে জল থেকে তুলে ভালো করে চেঁছে নিতে হয়। বারবার ভিজিয়ে আর চেঁছে ঐ চামড়া দুটিকে রসুনের চামড়ার মতো করে নিতে হয়। চামড়া যত পাতলা হবে খোলের রেশ তত বেশী হবে। ঐ পাতলা ভিজে চামড়া দুটি কাঠের একটি পিঁড়ির উপরে টানা দিয়ে শুকানো হয়। ভালোভাবে শুকিয়ে গেলে তখন 'চাক' দুটির বিনুনির সংগে গেঁথে নেওয়া হয়। গাঁথবার

আগে তলার মূল চামড়া দুটির উপরে আর একটি করে অপেক্ষাকৃত মোটা চামড়া লাগানো হয়। ওটিকে বলে 'পরতলা'। শেষ পর্যন্ত ধার থেকে প্রায় এক ইঞ্চি রেখে এই পরতলার মাঝের অংশটি কেটে ফেলা হয়। অর্থাৎ 'চাকে'র পাশে ধারের দিকের পরিধির সংগে সমান্তরালভাবে কাটা হয় যেন দুটি হয় এককেন্দ্রিক বৃত্ত। 'পরতলা' থাকার দরুনই খোলের সুরটি থাকে নচেৎ ক্যান ক্যান শব্দ হত এবং কানির কোন বাজনা থাকত না। দুই প্রান্তে তলা দুটি লাগিয়ে 'চাকের' গাথুনির ফাঁক দিয়ে দোয়াল ঢুকিয়ে মাটিটির গায়ের উপর দিয়ে এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে ঘুরিয়ে টানা দেওয়া হয়। সাধারণত খোলের এমন টানা থাকে বত্রিশটি।

মৃদঙ্গের প্রাচীনতম প্রকরণের ছাউনি দু'টির মাঝখানে কালো এক ধরনের প্রলেপ দেওয়া হ'ত। পোড়া মাটি গুঁড়ো করে ভেজানো চিঁড়ে দিয়ে পাথর দিয়ে

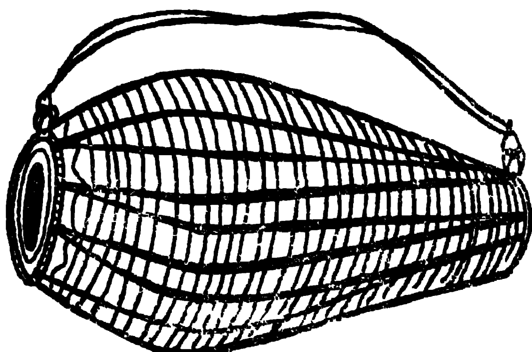


ঘসে এক ধরনের কথা তৈরি করা হ'ত। ছাউনি দুটির গোলাকারে বেশ খানিকটা মেখে দেওয়া হ'ত: এর দ্বারাই মৃদঙ্গের জীবনীশক্তি সংযোজিত হ'ত-বলে সকলের বিশ্বাস।

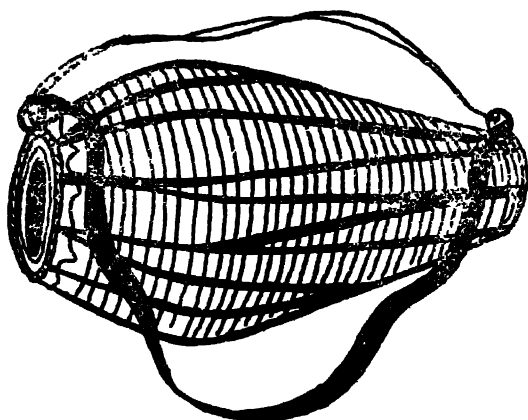
> "বিভূতির্গৈরিকং ভক্তং কেন্দুকেন চ সংযুতম্‌।
> যদ্বাচিপিটকং দেয়ং জীবনীসত্ত্ব মিশ্রিতং॥
> সর্ব্বমেকত্রপিষ্টং তল্লেপক্ষরলিরুচ্যতে।
> বামাশো পুরিতাং কৃত্যালেপং
> দন্দাশ্চদক্ষিণে॥"

এ পদ্ধতিকে বর্তমানে 'গাব' দেওয়া বা 'ধুনা করা' বলা হয়। বেশীর ভাগ আনদ্ধ যন্ত্রেই এই পদ্ধতি বর্তমানে প্রচলিত আছে। পাখোয়াজে অবশ্য বাঁয়াতে ময়দামাখা লাগিয়ে নিতে হয়। শ্রীখোলের উভয় তলাতেই যথারীতি এমনি করে 'ধুনা' করাতে হয়। 'ধুনা' স্তরে স্তরে মাখিয়ে শুকাতে হয়, পরে মসৃণ গোল পাথর দিয়ে ঘসে 'গাবের' উপরটি মসৃণ করতে হয়। এরপর দোয়ালগুলিকে টেনে আবার মাঝে মাঝে চাকের উপর ঠুকে খোলের সুর বাঁধতে হয়। অবশ্য

খোলের ধ্বনির বৈশিষ্ট্য হ'ল—যে-কোন স্কেলে গান করলে তার সঙ্গে খোল বেসুরো শুনায় না। দুই দিকের চাকের সঙ্গে একই লাইন রক্ষা করে দুটি সরু



চামড়ার ফিতা দিয়ে রিং বানাতে হয় আর ওই রিং দুটির মধ্যে দুটি পিতলের বালা লাগাতে হয়। ঐ বালা দুটিতে চওড়া সুতোর ফিতা লম্বা করে লাগাতে হয়। ঐ ফিতাটি কাঁধে লাগিয়ে খোল ঝুলিয়ে বাজাতে হয়। তাছাড়া চামড়া দিয়ে তৈরি থাকে একটি কাঁধ-দোয়াল, ঐটি একটু ছোট।



বাদ্যশিক্ষা

শ্রীখোল বাদ্যের বিভিন্ন পদ্ধতি থাকলেও শিক্ষার পদ্ধতি এক। প্রথমেই খোলের প্রণাম : মন্ত্রটি হ'ল—

"মৃদঙ্গ ব্রহ্মরূপায় লাবণ্যাম রসমাধুরী
সহস্রগুণ সংযুক্তম্ মৃদঙ্গায়ৈ নমো নমঃ।"

বাণী প্রকরণ

খোলে প্রচলিত যেসব বাণী ব্যবহার করা হয় সেগুলি হ'ল—

ক বর্গের—ক, খ, খি, খে, গ, গে, ঘে।

চ বর্গের—জা, ঝা, ঝি, ঝে।

ট বর্গের—টা, টে, ডা, ডে।

ত বর্গের—ত, তা, তি, তে, থি, থু, থে, থো, দা, দি, দে, ধা ধি, ধু, ধে, ধো, ধৌ, ন, না, নি, নু, নে, নিং।

প বর্গের বাণীর কোন প্রয়োগ নেই।

এছাড়া আছে 'র'।

এই বাণীগুলিকে খোলে প্রয়োগ করার জন্য নিম্নরূপে হস্তাঘাত করতে হয়।

ক—বাঁয়ার মাঝখানে সামান্য স্পর্শ।

খ, খি, খে—বাঁয়ার মাঝখানে বাঁ হাতের চার আঙুলে চাপা শব্দ।

গ, গে—বাঁয়ার ধারে চার আঙুলে হাল্কা করে ছাড়া আঘাতের শব্দ।

ঘে—বাঁয়ার ধারে চার আঙুলের আঘাতে জোরালো শব্দ।

জা—বাঁয়ার 'গ' শব্দের সঙ্গে ডাইনার চার আঙুলের ছাড়া আঘাত।

ঝা, ঝি, ঝে—'ঝা' হ'ল খোলের সবচেয়ে জোরালো আঘাত। বাঁয়ার ধারে চার আঙুলের খোলা আঘাতের সঙ্গে ডাইনার খোলা চাপড়ের সংযুক্ত শব্দ।

টা, টে—ডাইনার খোলা শব্দ। চার আঙুলে, বুড়ো আঙুলে বা মধ্যমার আঘাতে বাজাতে হয়।

ডা, ডে—ডাইনার শব্দ 'টা'-এর মতো। পূর্ববর্ণটি যদি 'গে' থাকে তবে আঘাতটিকে বলা হয় 'ডে'।

ত, তা, তি, তে—ডাইনার শব্দ। বড় হাতে চার আঙুলের চাপা আঘাত বা গাবের মাঝখানে মধ্যমার চাপা আঘাত।

থি, থু, থে, থো—বাঁয়ার শব্দ। মাঝখানে করতলের মধ্যভাগ একটু আলগা করে রেখে চার আঙুলে গাবের মাঝখানে আঘাত। 'খে' আর 'থে'-র মধ্যে প্রভেদ হ'ল—'খে'তে শুধু আঙুল চারটি লাগে আর 'থে'তে আঙুল সহ করতলটি লাগে।

দা, দি, দে—বাঁয়ার 'গ' শব্দের সঙ্গে ডাইনায় 'তা' শব্দ যুক্ত হলে হয় 'দা'। আগে বাঁয়া পরে ডাইনা সামান্য আগুপিছু পড়বে।

ধা, ধি, ধু ধে, ধো, ধৌ—বাঁয়ার 'ঘ' শব্দের সঙ্গে ডাইনার 'তা' শব্দের আঘাত সংযুক্ত হয়ে হয় 'ধা' শব্দ। এক্ষেত্রেও আগে বাঁয়া পরে ডাইনা। এটি খোলা এবং জোরালো শব্দ। বাঁয়াতে খোলা আঘাত না করে প্রয়োজনে গুপো দিয়ে ডাইনার এক আঙুলের 'তা' যুক্ত করেও 'ধ'

গোষ্ঠীর বর্ণগুলি তোলা যায়।

ন, না, নি, নু, নে, নিং—ডাইনার শব্দ। বড় হাতে 'তে'র আঘাত থেকে হাল্কা করে চার আঙুলে ডাইনাতে 'না' হয়। আবার মধ্যমা বা তর্জনীর খোলা আঘাত দিয়েও 'ন' গোষ্ঠীর বাদ্য বাজানো হয়।

র—ডাইনার শব্দ। বড় হাতের ক্ষেত্রে গাবের মাঝখানে বুড়ো আঙুলের আঘাত দিয়ে শব্দ উৎপন্ন করতে হয়। অনেকটা 'টে'-এর মতো। তর্জনীর সাহায্যে এক আঙুলে ডাইনার খোলা শব্দেও 'রে' বাজানো হয়।

এগুলি হ'ল বর্ণ-প্রকরণের সাধারণ নিয়ম, তবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বাণী-প্রকরণের এ নিয়ম রক্ষা করা যায় না। বর্ণ একই রেখে সময় সময় হাত পাল্টে যায়। বাদ্য ক্ষেত্রে তা অবিধেয় নয়। এসব আঘাতের ক্ষেত্রেও দু' একজন হয়ত ভিন্নমত পোষণ করতে পারেন। কিন্তু সে তাঁর ব্যক্তিগত কারণে।

খোলে কতগুগি যুগ্ম বাণীপ্রকরণ আছে। বাণীগুলিতে আঘাত বেশী থাকলে বর্ণ কমে যায়, অনেকটা বাংলা ব্যাকরণের অপিনিহিতির মতো। যেমন—

গুরগুর—এই বাণীটিতে মোট ছয়টি আঘাতের সমষ্টি। এগুলি হ'ল—'গি তে টে গি তে টে'। দ্রুত হ'লে এরই নাম হয় 'গুর গুর'।

গেঘের—'গে দা ঘে নে নে রে'—এই ছয়টি আঘাতের দ্রুত চলনের সময় এটির উচ্চারণ হয়—গে ঘেড়।

ঘের ঘেনা—'ঘে নে নে রে ঘে নে না ক'—এই আটটি বর্ণ সংযোগে হয় 'ঘের ঘেনা'।

ত্রেকে—'তে রে খে টা'—এই চার বর্ণের দ্রুত সমন্বয় হয়ে যায় ত্রেকে।

খের—'খে নে নে রে'—এই চারটি আঘাতের সমষ্টি।

ক্রান্—ডাইনার শব্দ। ডান এবং বাঁ—এই দু' হাত দিয়ে ডাইনার গাবের উপর খোলা আঘাত করতে হয়। আগে ডান ও পরে বাঁ হাত সামান্য আগুপিছু পড়ে।

গ্রিধিন্—বাঁয়ার শব্দ। ডান এবং বাঁ দু'হাত দিয়েই বাঁয়ায় বাজাতে হয়। আগে ডান হাত পরে বাঁ হাতের দুটি—সবই খোলা আঘাত, পরপর হলেও অতি দ্রুত গতিতে করতে হয়।

খিট্টর—'খি-তে টে তে টে' একটি দম্ সহ পাঁচটি আঘাতে এই মিশ্র শব্দটি উৎপন্ন হয়।

ঘ্রান্—বাঁয়ার জোরালো শব্দ। দুই হাতে বাঁয়ার খোলা আঘাত করে বাজাতে হয়। আগে বাঁ হাত সামান্য পরে ডান হাত পড়ে।

কোন কোন ক্ষেত্রে দুই, তিন বা চারটি বাণী একত্রিত হয়ে 'দল্' বা

'গুচ্ছ' তৈরি করে এক মাত্রায় ব্যবহৃত হয়। যেমন—

দুই বর্ণের দল্—কতা, খিনি, খেটা, খিটি, গদি, গেডা,
গিডি, গুরর্, ঘেনে, ঘেনা, ঘেরর্,
জাঝি, জাগ, ঝিনি, ঝেটে, তট,
তেটে, তিনি, তাখি, তাক, তাথি,
তেরে, তেনা, থিনি, থেনে,
দেরে, দাধি, দিনি, দেডে,
ধেরে, ধেনে, ধিনি, ধাগে, ধিনা,
ধুমা, নেরে, নেতা, নাক,
নাগ।

তিন বর্ণের দল্—খেটেতা, গদিনে, গেতেরে,
ঘেনেরে, ঘিতেটে, ঘেনেতা,
জাগজা, জাঘেনা, জাগুর্গুর্,
জাঝিনি, ঝাতেটে, ঝিনিতা,
ঝেনেতা, ঝাগুর্গুর্, তাখেটা,
তাথিনি, তাতেটে, তাকতা, তেটিনি,
তাতিনি, তাগুর্গুর্, দিদাদা,
দাধিনি, দেডেদা, দা গুর্গুর্,
ধাতেটে, ধেনেতা, ধাগধি,
ধিনিধা, নাতিনি, নাকতা,
নাথিনি,

চার বর্ণের দল্—খেটাতেরে, খেটাতাক, ঘেনেনেরে,
ঘেনেনাও, জাজাঝিনি, জাঝিনাঝি,
ঝেটেতেটে, ঝিনিতাখি, তেরেখেটা,
তটখিনি, তেটেতাখি, তাখিতেটে, তেটেতাক,
তিনিতাক, দাদাধিনি, দেরেগিডি,
দাঘিনাক, ধিনিতাক, ধেরেতেরে,
ধিনিধানা, ধেরেখেটা, ধাগিতেটে, ধুমাখেটা,
নেরেঘেনা, নাগতেটে, নাগঝিনি,
নিংতাক, নিনিতাক, নিনিতানা।

এই বর্ণসমষ্টিকেই সাধারণত বিভিন্ন বাদ্যাংশ হিসাবে ব্যবহার করে বোল রচনা করা হয়। নান্দনিক বিচারে যে যে বর্ণের সংগে যে যে বর্ণ যোজনা করা হয়েছে প্রাচীনকাল থেকেই সে সে বর্ণ একইভাবে বাদিত হয়ে আসছে। তবে প্রবন্ধ বাদ্যের বর্ণবিন্যাসে কোন স্থির সিদ্ধান্ত নাই। এক্ষেত্রে গুরুপ্রদর্শিত

পদ্ধতিই গৃহীত হয়।

দুই বর্ণের দলের ক্ষেত্রে অনেকসময় প্রথম বর্ণটির স্থায়িত্বকাল বৃদ্ধি করার জন্য দ্বিতীয় বর্ণটিকে জোরালো করতে ঐ দ্বিতীয় বর্ণটিকে যুক্তবর্ণ করা হয়। তখন প্রথম বর্ণ দম্‌যুক্ত হয়ে স্থায়িত্বকাল বৃদ্ধি হয়। যেমন—

খেত্তা, ঘেত্তা, জাজ্‌ঝেই, ঝেন্দা, তাত্তা,
তাথেই, তাক্লান্‌, তাদ্ধেই, তিন্দা, থেন্দা,
দাদ্ধেই, দিন্দা, ধেত্তা, ধেন্না, ধিন্ধিনা,
নাক্তেই ইত্যাদি।

এসব ক্ষেত্রে প্রথম বর্ণটির স্থায়িত্বকাল বেশী। যেমন—'তাদ্ধেই' ক্ষেত্রে 'তা—ধেই', উচ্চারণভঙ্গি হবে 'তাদ্‌ধেই'। দ্বিতীয় বর্ণে প্রস্বন্‌ যুক্ত হয় বাদ্যের গুরুত্ব বাড়ে।

খোলের বাণীগুলিকে আঘাতের জোড় বিচারে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়—(১) গুরু বাণী এবং (২) লঘু বাণী। যে বাণীগুলিতে বাঁয়ায় জোরালো আঘাত প্রযুক্ত হয়ে ডাইনা সংযুক্ত হয়ে বা এককভাবে ঘোষবর্ণ বা মহাপ্রাণ বর্ণের ধ্বনি সৃষ্টি করে সেগুলিকে বলে গুরু বাণী। যেমন—ঘ, ধ, ঝ বা এগুলির সঙ্গে প্রযুক্ত বাদ্যগুচ্ছ। অন্য সব বর্ণগুলিই এককভাবে লঘু, কারণ এগুলিতে প্রস্বন্‌ থাকে না এবং এগুলি অল্পপ্রাণ বর্ণ। এগুলি বাঁয়ায়ও হ'তে পারে, আবার ডাইনাতেও হ'তে পারে। যুক্তবর্ণের লঘু বাণী হ'ল—'দ' এবং 'ড'। বর্ণের এই লঘু গুরু 'দল্‌'-এর ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য। তবে কতকগুলি বাণীর সঙ্গে কতকগুলি বাণীর পারস্পরিক লঘু-গুরু সম্পর্ক নির্দিষ্ট আছে। যেমন—

'ঝাঝিনাঝি নাগঝিনি'—গুরু, এর সঙ্গে লঘু হবে 'তাথিনাথি নাক থিনি'। অনুরূপ,

গুরু='ঝা — — ঝি নাগ ঝিনি,	লঘু='তা — — থি নাক থিনি'
গুরু='ধেরেটি ধেরেটি ধেরে',	লঘু='তেরেটি তেরেটি তেরে'
গুরু='ঝাঘেনা ঝাঘেনা ঘেনা',	লঘু='তাখেনা তাখেনা খেনা',
গুরু='ঝা-দাঘিনেদা গেদা',	লঘু='তা-তাথি নেতা খেটা',

ইত্যাদি।

বাণীর এই গুরু-লঘু ব্যবহার করে কোনও কোনও তালের লওয়াও রচনা করা হয়েছে। যেমন—ছোট দশকোশী, মধ্যম দশকোশী, বড় দশকোশী, তেওট ইত্যাদি তালে। যেমন—মধ্যম দশ কোশী তালের লওয়া—

গুরুভাগ :—

+	o	o	o
ঝিান	দাঘি	নেদা	গেদা

২	০	০	০	৩
ঝিনি	দ্যাঘি	তাকদাধে	ইদাধেই	ঝা
০	৪	০	০	০
গুরুরু	তাতু	তা	খিখি	তাখি

লঘুভাগ :

+	০	০	০
তা-	তাখি	নেতা	খেটা
২	০	০	০
তা	তাখি	তাক দাধে	ইদাধেই
৩	০	৪	০
ঝা-	গুরুরর	তাত	তা
০	০	+	
খিখি	তাখি	(ঝা)	

খোলশিক্ষার নির্দিষ্ট পদ্ধতি আছে যার মূল কথা হ'ল নির্দিষ্ট নিয়মানুসারে অনুশীলন। এই অনুশীলনের কতকগুলি উদ্দেশ্য আছে।

(১) যে-কোন লোক প্রথমে খোল বাজাতে চেষ্টা করলে তাঁর দুটি হাতই একসঙ্গে এসে খোলের দুই মুখে পড়ে। তাই হাত দু'টির এই স্বভাব নষ্ট করে দু'টি হাতকে পৃথক এবং স্বাধীনভাবে ক্রিয়াশীল করতে হয়। এজন্য প্রথম অনুশীলন খুব ধীরে ধীরে শুরু করতে হয়।

(২) খোলের মুখের চাকগুলি একটু উঁচু ও শক্ত থাকে। ঐ চাকের উপর পরে আঙুলের গোড়ার দিকটা, তাতে 'প্রথম' অনুশীলনে হাতে বেশ ব্যথা লাগে। সেইসঙ্গে আঙুলগুলো ছড়িয়ে যায়। তাই আস্তে আস্তে চাপড় ফেলে খোলে হাত পড়া ঠিক করে নিতে হয়। পরে জোরে চাপড় দিয়ে খোলে হাত বসাতে হয়।

(৩) হাতের কব্জি ও কনুইয়ের জোড়া সাধারণত শক্ত থাকে। কনুইকে নমনীয় করা এবং কব্জিকে ইচ্ছামতো ঘুরানোর জন্য উল্টো হাতের বাজনা অনুশীলন করতে হয়।

(৪) খোলের হাত তিন প্রকার—বড় হাত, লণ্টন হাত বা ছোট হাত এবং আঙুল। বড় হাত বাজে ডান হাতের পাঁচ আঙুলে, যাকে চাপড়ের বাজনাও বলা হয়। লণ্টন বা ছোট হাত বাজে ডান হাতের চার আঙুলে অর্থাৎ অঙ্গুষ্ঠ লাগে না। আঙুলের বাজে লাগে ডান হাতের দুটি আঙুল—তর্জনী ও মধ্যমা। এইসবগুলিকে অভ্যস্ত করার জন্য একই বাজনা বিভিন্ন ধরনের হাতে অনুশীলন করাতে হয়।

(৫) মধ্যমা ও তর্জনীকে বিশেষ সংযত রেখে অত্যন্ত দ্রুত ক্রিয়াশীল করে তোলা দরকার। বিশেষ করে পরতলার উপর আঘাত করে কানির যথার্থ শব্দ বের করবার জন্য। এজন্য টুকি সাধন করাতে হয়। এক্ষেত্রেও লক্ষণীয়—খোলের তলা শক্ত বলে আঙ্গুলে খুব ঘা লাগে, তাতে অনেকসময় আঙ্গুল ফেটে রক্তও বেরিয়ে যায়। আঙ্গুলগুলি সচল করবার জন্য সাবধানে টুকিগুলি সাধতে হয়।

(৬) আঘাতজনিত শব্দ ও বাণীর সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন হতে হয়। অনুশীলনের সময় বাণীগুলি যেমন জোরে বাজাতে শিখতে হয় তেমন আবার খুবই আস্তে আস্তে বাজাতে শিখতে হয়।

(৭) মাত্রা সম্পর্কে বোধ জাগিয়ে একই মাত্রা দ্বিগুণ, তিনগুণ বা চারগুণ করে কিভাবে অনায়াসে ব্যবহার করা যায় তার অভ্যাস করতে হয়।

(৮) কীর্তনের গানগুলি সম্পর্কে সচেতন থাকতে হয় এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বড় বড় গানগুলি শিখে রাখতে হয়।

(৯) সঙ্গতের ধারাগুলি সম্পর্কে সচেতন হতে হয় এবং বাদ্য প্রয়োগের স্তরগুলি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয়। সঙ্গতের অভিজ্ঞতার জন্য বেশ কিছুদিন ভালো বাজিয়ের সঙ্গে বাঁয়াটি বাজাতে হয়।

(১০) সর্বোপরি খোলবাদকের রসবোধ সৃষ্টির প্রয়োজন, কারণ বাদ্য অপেক্ষাও গানের রসই হ'ল শ্রোতার আস্বাদ্য। বাদক তাই রসের ব্যাঘাত না করে রসকে পূর্ণরূপ দান করে গানটিকে একটি যৌথ কীর্তি হিসাবে শ্রোতার সমক্ষে উপস্থিত করতে চেষ্টা করে। সেই চেষ্টার জন্য অনুশীলন করতে হয়: এইসব উদ্দেশ্যগুলি সম্মুখে রেখেই খোলের অনুশীলন শুরু করতে হয়।

হাত সাধার জন্য অনুশীলনীর বাদ্যক্রম সাধারণত নিম্নরূপ থাকে।

১। তে রে খে টা (বহুবার)

২। তে রে তে রে তে রে খে টা (বহুবার)

৩। তে রে খে টা খে টা তে রে (বহুবার)

৪। ঝেটে নেটে গিড়ি ঝেটে

নেটে গিড়ি দেরে গিড়ি (বহুবার)

৫। ঝেটে নেটে নেটে গিড়ি ঝেটে নেটে নেটে গিড়ি

ঝেটে নেটে নেটে গিডি দেরে গিডি দেরে গিডি (বহুবার)

৬। ঘি-তেটে ঘেনা ঝা- ঘি-তেটে ঘেনা ঝা-

ঘেনা ঝা (বহুবার)

৭। ঘেনে নেরে নেরে ঘেনা নেরে ঘেনা নেরে ঘেনা

ঘেনে নেরে নেরে ঘেনা নেরে ঘেনা তা-গেদা (বহুবার)

৮। গেদা গেদা ঘিটি নিটি গেদা গেদা ঘিটি নিটি

গেদা ঘিটি নিটি গেদা ঘিটি নিটি ঘিটি নিটি (বহুবার)

৯। ত্রেকের খের ত্রেকের খের ত্রেকের

খের খেখের রেখের (বহুবার)

১০। ঘের গেদা গেগের ঘের

গেঘে রেঘের রেগের ঘের (বহুবার)

১১। ঘেরগে দাঘের ঘেরগে দাঘের

ঘেরগে দাঘের রেঘের ঘের (বহুবার)

১২। ঘেরগে দাঘিন ধেন্দা গেঘের

গেঘের গেঘের রেঘের ঘের (বহুবার)

১৩। ঘেরগে দাগুরর্ ঘেরগে দাগুরর্

ঘেরগে দাগুরর দাগুরর দাগুরর (বহুবার)

১৪। তাক্ খের ত্রেকের খের

ত্রেকের খের খেখের রেখের (বহুবার)

ইত্যাদি।

টুকি বাদ্য অনুশীলনের ক্রম নিম্নরূপ :

১। ঝাতেটে তাতেটে তাতেটে তাতেটে (বহুবার)

২। দেড়েদা দাধিনি দেড়েদা দাধিনি

দেড়েদা দাধিনি দাধিনি দাধিনি

ধিনেতা তাথিনি তেটেতা তাথিনি

তেটেতা তাথিনি তাধিনি তাথিনি (বহুবার)

৩। ধা-ধেনে ধেনে ধেনে ধা-ধেনে ধেনে ধেনে

ধা-ধেনে ধেনে ধেনে দাধেনেদা ধেনে ধেনে

তা-তেনে তেনে তেনে তা-তেনে তেনে তেনে

তা-তেনে তেনে তেনে তাতেনেতা তেনে তেনে

৪। দেড়ে দাদা ধিনি ধিনি দেড়ে দাদা ধিনি ধিনি

দেড়ে দাদা ধিনি ধিনি দাধি নাধি নেদা ধিনি

তেটে তাতা থিনি থিনি তেটে তাতা থিনি থিনি

তেটে তাতা থিনি থিনি তাথি নাথি নেতা থিনি

(বহুবার)

৫। ত্রেকে ধেনে গেদা ধেনে ত্রেকে ত্রেকে গেদা ধেনে

ত্রেকে থেনে কেতা থেনে ত্রেকে ত্রেকে কেতা থেনে

(বহুবার)

৬। ত্রেকেতা দাধিনি ত্রেকেতা দাধিনি

ত্রেকেতা দাধিনি দাধিনি দাধিনি

ত্রেকেতা তাথিনি ত্রেকেতা তাথিনি

ত্রেকেতা তাথিনি তাথিনি তাথিনি

৭। দিগন্নরদিন্দা দিগন্নরদিন্দা দিগন্নরদিন্দা

দিগন্নরদিন্দা ধিগন্নরতিত্তা তিউররতিত্তা

তিউররতিত্তা তিউররতিত্তা (বহুবার)

বড় ও ছোট হাত মেশানো হাত সাধার বোল :

৮। দাধেনধা ত্রেকেধেনে ত্রেকেদাধে এনধাত্রেকে

দাধেনধা ত্রেকেধেনে তেরেখেটে তাকতেরে খেটাতাক তেরেখেটা

(বহুবার)

৯। ধা-দাধিন ত্রেকে ধেনে দাধিনা ধিন্ ত্রেকে ধেনে
দাধিন্ ত্রেকে ধেনে দাধিন্ ত্রেকে ধেনে তাত্তাও
তাত্তাও তেটে তেটে খেটা তাক তেরে খেটা
ত্রেকের খের ত্রেকের খের ত্রেকের খের খে:খরে খের

১০। ধেৎ ধেনে নাগধেৎ ধেনে নাগ ধেনে নাগ
দেত্তা দাঘিত্রেত্রে খের্তাকিত্রেখেটা দেৎতেরে
দেরে ঘেরে দাঘি তেত্রে খের্তাক ত্রেখেটা দেৎতা
দাঘি ত্রেত্রে খের্তাক ত্রেখেটা তেবেখেটা তেরে তেরে
খের্তাক তেরে খেটা (বহুবার)

১১। ধেরেটিধে রেটিধেরে ধেরে তেরে তেরে খের্তাক তেরেখেটা
তেরেটিতে রেটিতেরে তেরে তেবে তেরে খের্তাক তেরে খেটা
ঝা-ত্রে-ত্রে খের্তাক তেরে খেটা দাঘি-ত্রেত্রে খের্তাক তেরেখেটা
দাম্দিন দেরে গেড়া ঝা-দাম্দিন দেরেগেড়া ঝা-
দাম্দিন দেরেগেড়া (বহুবার)

১২। দা৺ন্দিন দেরে গেডা | দা৺ন্দিন দেরে গেডা
দা৺ন্দিন দেরে দেরে | খেটা তাক তেরে খেটা
দেরেগেডা দেরেগেডা | ঝেটেনেটে গিডি ঝেটে
নেটে গিডি ঝা- | ঝেটে নেটে গিডি ঝেটে
নেটে গিডি ঝা- | তিটি নিটি নিটি গিডি
খিটি নিটি নিটি গিডি | দেরে গিডি দেরে গিডি
দা৺ন্দিন দেরে গেডে | ঝা-দা৺ন্দিন | দেরে গেডে ঝা-
দা৺ন্দিন দেরে গেডে (বহুবার)

১৩। ধোখেটা ধেধেখেটা | দাধেইয়া খেটা তিনি
তাখেটা তেরে খেটা | তাতেইয়া খেটা তিনি
তাখেটা তেরেখেটা | তাতেইয়া খেটাতিনি
খেটা তিনি খেটা তিনি | দেরেগেডা খেটা তিনি
দাদা৺ন্ধিনেতাখেটা | তিনি তিনি তিনি তিনি
তাতাত্তি নেতাখেটা | তিনি তিনি তিনি তিনি

তাক তাক গেদাঘিনি ঝা-তাকতাক

গেদাঘিনি ঝা- তাকতাক গেদাঘিনি (বহুবার)

কীর্তনের সঙ্গে খোল সঙ্গতের কতগুলি শৃংখলা মেনে চলতে হয়। প্রথমত, গানের মুখ শুরু হ'লেই বাজাতে হয় 'লওয়া', যার চলতি নাম 'ঠেকা'। এই লওয়ার বোল যদিও বাঁধা থাকে তবু ঐটি দিকদর্শন মাত্র। গানের গতিবিধি, সুর ও রসকে রক্ষা করে মাঝে মাঝে নানা ধরনের আঘাত সংযোজন করতে হয়। আগেকার দিনের লোকেরা বলতেন বায়ান চেনা যায় ঠেকায়। ঠেকার মাঝে মাঝে কোনও কোনও ক্ষেত্রে মান' ব্যবহার করা হয়। যেমন তেওট তালের, ধরা তালের, একতালি তালের এবং দাসপ্যারী তালের কোন কোন গানে। অভিজ্ঞ বাদকগণ গান শুরুর সঙ্গে সঙ্গেই লওয়া জুড়ে দেন, এক্ষেত্রে সাধারণত সম আসার অপেক্ষা থাকে না। ঠেকা করতে হয় সুর পুষিয়ে ; কেবল মাত্রার সমতা দেখলে চলে না। আগেকার দিনে অনেক প্রধান গায়কই ধরা তাল, কাটা দশকুশী তাল, দুঠুকী একতালি ইত্যাদি তালে গান গ ইবার সময় মাত্রার সমতার দিকে বেশী লক্ষ্য করতেন না। সেক্ষেত্রে বাদকগণ সঙ্গে সঙ্গেই চলতেন ব'লে শুনতে কোন অসুবিধা হ'ত না। মধ্যম ঘরের গান হলেই ঝা তাথি নেতা খেটা বোল দিয়ে ঠেকা জোড়েন এবং জোড়ার সময় জোড়া দিয়ে তালটি বুঝে নেন। বড় ঘরের গানেও অনুরূপ--

ঝাখি ঝা ঝা ঝা তাত্ তা খিখি তাখি ইত্যাদি বোল দিয়ে শুরু করেন। সময়মতো জোড়া দিয়ে তালের রূপটি বুঝিয়ে দেন।

সঙ্গতের দ্বিতীয় পর্যায় হ'ল 'লহর'। বিভিন্ন তালের বিভিন্ন ধরনের লহর আছে। মূল গানের পদের সংগে যখন গায়ক আখর সংযোগ করেন, তখন গানের আবর্ত কমে যায়, সেই সংগে লহর জুড়তে হয়। ঠেকার চেয়ে লহরের বাণী থাকে বেশী, তখন গান সমান হয়ে যায় : অর্থাৎ তখন মাত্রাগুলি হয় সমান লয়ের। যেহেতু মূল পদ কাটিয়ে আখরে যাওয়া হয় সেহেতু এই অংশকে 'কাটান'ও বলা হয়। লহর দ্বিগুণ, তিনগুণ, দৌড়, চৌগুণ ইত্যাদি নানা ছন্দের থাকে। এগুলি রুচিমতো পরপর সংযোজিত করতে হয়। লহর সাধারণত নিম্নরূপে শুরু হয়।

ঝিনিদাঘি নাগতেটে নাগতেটে নাগতেটে ইত্যাদি। আবার সমতাল, বড় দশকোশী, যোত সম ইত্যাদি বড় বড় গানে একবারেই বড় হাতের মাতন শুরু হয়ে যায়।

সংগতের তৃতীয় পর্যায় হ'ল 'মাতন'। লহর বাজিয়ে বাদক গায়ককে বশ করে নেন : লহরগুলি বেশীর ভাগই টুকির। আখর দেওয়া শেষ পর্যায়ে পেঁছিলে বাদক তাঁর সুবিধেমতো সময়ে 'মাতন' শুরু করেন। বড় বা মধ্যম ঘরের মাতনগুলি শুরু হয়—জাঝিনাঝি নাগাঝিনি বাজনা দিয়ে। এই মাতনের মধ্যেই বাদকগণ নানা ধরনের নির্দিষ্ট ঘাত বাদ্য বাজিয়ে সভাকে মাতিয়ে তোলেন। এই মাতনের শেষ পর্যায়ে দৌড় ছন্দের বাজনা বাজালে ভালো হয়। যেমন—

· জাজাঘে নাঘেনা জাঘেনা ঘেনাও, ইত্যাদি।

চতুর্থ পর্যায়ে বাজাতে হয় 'মূর্ছ'না'। এই 'মূর্ছ'না' বা মূর্ছ'ন হ'ল সমাপ্তিসূচক বাদ্য। অনেকটা তবলার তেহাইয়ের মতো। বিভিন্ন তালের বিভিন্ন মূর্ছ'ন, এবং এই মূর্ছ'নের শেষে যুক্ত থাকে 'মান'। এই 'মান' বাজাবার পর গান আবার ফিরে ঘরে আসে। আবার মূলগানের দ্বিতীয় কলি শুরু হয়।

এগুলি হলো বড় গান বাজাবার সাধারণ নিয়ম। আর ছোট গানগুলির ক্ষেত্রে তালের ছন্দকে ফুটিয়ে তোলা এবং ছন্দ রক্ষা করে নানাবিধ দ্রুত পরণ বাজাতে হয়। তাতে গানের গতি বোঝা যায় এবং শ্রোতারাও আনন্দ পান।

বাদকগণ অনেক সময় নানা ধরনের বাদ্য প্রবন্ধ খোলে বাজিয়ে থাকেন। এই প্রবন্ধগুলিতে কবিতার ছন্দ পাওয়া যায় এবং এগুলি প্রতি ক্ষেত্রেই বিশেষ অর্থবাহী। যেমন—

১। দুটি দুটি দুটি ভাই চৈতন্য নিতাই
রাধা ধ্যায়াও। রাধা ধ্যায়াও মন
কৃষ্ণ ধ্যায়াও। সীতানাথ অদ্বৈত ধ্যায়াও
তাকে ধ্যায়াও……ইত্যাদি।

২। কৃষ্ণ কৃপয় দেব সদয় নন্দতনয় সৌর
যাদব জয় মাধব জয় কেশব বলবীর।
রাসরসিক ভক্ত ভাবিত নেত্র সুখদ বেশ
চন্দ্র বদন পদ্ম নয়ন চারু চিকুর কেশ ॥
……………… ……………ইত্যাদি।

এছাড়া অনেক সংস্কৃত প্রবন্ধও আছে। যেমন—

৩। অধন্যাহং যা পাদপ্রণত মুপেক্ষিত মতি
গোকুলচন্দ্রং। নিষিদ্ধমানা ললিতাদিভিশ্চ পরেশেন তাসাম্মনুগতেন
মানাক্রান্তাবলোকয়তি দোষম্।
ধিকতাং ধিক ধিকতাং ধিক ধিকতাং
ধিক…………

ধিক ধিক তারে ধিক শতধিক সাধালো কাঁদালো
কৃষ্ণে যে ধনী। মান রতনে ধরিয়া যতনে
কৃষ্ণ রতনে তুচ্ছ গণি। ইত্যাদি।

বিশেষ বিশেষ গানের জন্য বিশেষ বিশেষ নির্দিষ্ট ঠেকা প্রযোজ্য। যেমন 'বর্দাস অষ্টতালের ঠেকা,' 'আঠের কাটানের ঝুমরা', 'একতালির ঝুমরা', 'আরে ধনি প্রবেশিল'—'চারতাল গান', ইত্যাদি।

খোলের পরে খোলের মতো আর কোনও যন্ত্র কীর্তনের সহযোগী হিসাবে আবিষ্কার হয়নি। নামকীর্তনের সংগীত ক্ষেত্রে দাসপ্যারী ঠেকার রকমারিই প্রযোজ্য। বর্তমানে নামকীর্তনে প্রচলিত মূল ঠেকাটির প্রথম রূপকার ছিলেন লেখকের গুরু প্রয়াত ওস্তাদ সনাতন সাহা। আগেকার প্রসিদ্ধ ঠেকাদার বাজিয়েদের মধ্যে ছিলেন—বিপিন দাস, বৈষ্ণবচরণ দত্ত, থিবার বাঁড়ুজ্জে মশাই, ময়নাডালের নিকুঞ্জবিহারী মিত্র ঠাকুর, ভূষণ দাস, যতীন দাস, কিংকর দাস, কৃষ্ণচৈতন্য বাবাজী, বৈঁচীর মদন, ফণি মণ্ডল প্রমুখ ব্যক্তিগণ।

দশম অধ্যায়

লীলাকীর্তনের মুখ্য তত্ত্ব

"আনন্দলীলাময় বিগ্রহায় হেমাভ দিব্যচ্ছবি"—প্রাণের ঠাকুর শ্রীগৌরসুন্দর নিত্য নিয়ত নব নব ভাব সমৃদ্ধ লীলা প্রকট করেছেন নিজের আচরণের সূত্রে। "সে যে লীলাময় হরি, এসেছে নদীয়াপুরী, যাঁহার করুণা লোকে লোকে।" অনন্ত সত্তার মধ্যে যে হরির লীলাময় সত্তাই প্রধান সেই হরিই আমার গৌরহরি। লীলাসত্তায় পরিধি নাই—অসীম অনন্ত এই লীলার মধ্যে যে লীলায় নরবপু ধারণ করে জীবের প্রতি অনুগ্রহ সঙ্কল্প প্রকাশ হয়, সেই লীলার মধ্যে থাকে একদিকে আনন্দসত্তা, প্রেমসত্তা, ভাবসত্তা ও রসসত্তা, অন্যদিকে থাকে উদ্ধার-লীলা, করুণাময় সত্তা, কৃপাদক্ষ সত্তা, শাস্তিময় সত্তা, অভয়প্রদানকারী সত্তা এবং চির-অনর্পিত বস্তু প্রদানকারী দাতাময় সত্তা। এই সমস্ত সত্তা সমাহিত পূর্ণাঙ্গ লীলা প্রকরণই হ'ল "অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিত।" ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ করাই হ'ল ভগবৎলীলার প্রধান বৈশিষ্ট্য।

রাধাকৃষ্ণলীলা

শ্রীভগবান স্বকীয় আবির্ভাবের কারণ সম্পর্কে নিজে যেসব উক্তি করেছেন তার মধ্যে আছে—(১) 'পরিত্রাণায় সাধুনাম,' (২) 'বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্', (৩) 'সংস্থাপনার্থায়—ধর্মম্'। যারা নিরন্তর সাধনায় ব্যস্ত, যাঁরা ত্যাগব্রত গ্রহণ করে জপ, তপ, ধ্যানাদিতে নিয়ত নিবিষ্ট চিত্তে তীর্থাদি পরিভ্রমণ এবং "শয্যা-ভূতল মজিনং বাস" ইত্যাদি শুভকল্পে সঙ্কল্পিত—তাঁরাই সাধু। সাধনার কৃচ্ছ্রতা, কর্মের নিষ্ঠা, জ্ঞানের সিদ্ধ অবস্থা প্রাপ্তজন সাধুস্তরে উন্নীত। এই সাধুগণই তীর্থ পরিক্রমা করতে করতে শ্রীকৃষ্ণের কৃপাবলে অকস্মাৎ নৈমিষারণ্যে উপস্থিত হয়ে ষষ্ঠীসহস্র ঋষিগণের মধ্যে একজন হয়ে শ্রীশুকমুখে শ্রীমদ্ভাগবত কথা প্রসঙ্গ শ্রবণ করে, আস্বাদন করে পরিত্রাণ পান। সাধুদের হিত ভগবান সাধন করেন। আবার যারা নিতান্ত দুরাচারী, দুষ্কৃতকারী তাদের বিনাশ করেন এবং গতি দান করেন। পুতনা যে রাক্ষসী বকী, যার স্তনযুগলে কালকূট বিষ ধারণ করে মাতৃরূপের অভিনয় করে মায়াবিনী হয়ে শিশু সন্তানসমূহের হনন করে তাকেও নিধন করে ধাত্রোচিত গতি প্রদান করেন। সাধুদের পরিত্রাণ করেন আবার দুষ্কৃতকারীদের যথোচিত গতি প্রদান করেন ভগবান তাঁর প্রকটলীলায়, এই হ'ল ভক্তদের বিশ্বাস।

তাছাড়া ভক্তগণের একটি পৃথক চিন্তাধারা আছে। তাঁরা সাধুও নন দুরাচারীও নন। 'নৈবচ সাধু' 'নৈবসুদুরাচারী' তাঁদের একান্ত অনুভূতি হ'ল

কৃষ্ণদাস অভিমান। জাগতিক সম্পর্কের বহুবিধ অভিমান আছে যেমন—রাজা অভিমান, মন্ত্রী অভিমান, বিজ্ঞ অভিমান, ধনী অভিমান, কুল অভিমান, এছাড়া আত্মীয়-স্বজন ইত্যাদির নানাবিধ অভিমান। কিন্তু ভগবৎ সম্পর্ক রক্ষার ক্ষেত্রে ভক্তচিত্তে একটিমাত্র অভিমান সঞ্জাত হয় এবং সেটিই শ্রেষ্ঠ অভিমান, সেটি হ'ল দাসত্ব অভিমান।

"জীবের স্বরূপ হয় নিত্য কৃষ্ণদাস"। এই দাসত্ব অভিমানে অর্থাৎ দাস সম্পর্ক অন্য অর্থে সেব্য-সেবক সম্পর্কই চিরায়ত, অক্ষয় এবং নিত্য। যেহেতু ভগবান নিত্য তাই তাঁর অনুগত দাসও নিত্য। তাই ভক্তগণ এই শ্রেষ্ঠতম সম্পর্কটি অনায়াসে ভগবানের সঙ্গে করে থাকেন। সম্পর্কের মূল বৈশিষ্ট্যই হ'ল—"সর্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন"। অনন্যচিন্তা, অনন্যব্রত, নিবেদিত প্রাণ। সেবা-সিদ্ধ, ভগবৎনাম গুণলীলাদি স্মরণ, কীর্তন, শ্রবণাদিতে নিষ্ঠ, শ্রীপাদ বন্দন, অর্চন ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ে একাগ্রচিত্ত। নিরন্তর চিন্তাসূত্রে ভক্তহৃদয়ে বিশেষ বিশেষ ভাবোদ্দীপনা হয়—এ উদ্দীপনাই হল "ভক্তগণের গূঢ় ধন"। এই গূঢ় ধন ভগবানের নির্দিষ্ট একটি রূপরতন সম্ভারে সজ্জিত হয়ে অবতীর্ণ হন। এই অবতার ভক্তের অন্তস্থিত অবতার, হৃদয়ের অবতার, অনুভবে অবতার, প্রেমের অবতার শ্রীমন্মহাপ্রভুর গৌর অবতার। এমন অবতারের মূল একটি কারণ হ'ল নিত্যলীলা প্রকট করা।

> "যোগমায়া চিচ্ছক্তি বিশুদ্ধ শুদ্ধ পরিণতি
> তাঁর শক্তি লোকে দেখাইতে।
> ভক্তগণার গূঢ় ধন ওই রূপ রতন
> প্রকাশিলা নিত্যলীলা কৈতে॥"

এই নিত্যলীলাদি প্রকটনের সূত্রেই ভক্তগণের প্রতি ভগবান অনুগ্রহ করে থাকেন। সাধারণ জীব এই লীলা স্মরণ মননের সূত্রেই অপ্রাকৃত আনন্দরাজ্যে প্রবেশ করে শ্রীগুরু পাদপদ্মের করুণায়—ভগবৎবিলাসের শ্রীবিগ্রহাদি দর্শন, স্পর্শন এবং শ্রীবিগ্রহ সূত্রজাত গন্ধ, শব্দ ইত্যাদি গ্রহণের সুযোগ লাভ করে থাকে। এই লীলা স্মরণ হয় জীবের অন্তরে ভক্তি অঙ্গ যাজনের ফলশ্রুতি স্বরূপ।

ভগবান লীলাবিলাসী, নিরন্তর লীলা করছেন। এই লীলার শেষ নাই, লীলার আদি নাই অন্ত নাই, খেদ নাই, ক্লান্তি নাই। লীলার বৃদ্ধি আছে, হ্রাস নাই, প্রতি পদে পূর্ণামৃত আস্বাদন জনিত তৃপ্তি আছে কিন্তু অতিতৃপ্তি জনিত অতৃপ্তি নাই। তৃপ্তি প্রতি স্তরেই লোল্যবৃদ্ধি, ক্ষুধাবৃদ্ধি, আকর্ষণবৃদ্ধি করে। এই ভোগ বা আস্বাদনে এবং আস্বাদনোত্তর আস্বাদন পুনরায় আস্বাদনের স্পৃহাবৃদ্ধি অর্থাৎ যত আস্বাদন ততই স্পৃহা এরই নাম অনুগ্রহ।

> "স্বেচ্ছাময় প্রভু ধরে মানুষের দেহ।

কেবল ভকত হেতু অনুগ্রহ সেহ।
ভজত তাদৃশী ক্রীড়া মানুষ যেমন।
যা শুনিয়া সর্ব্বলোক ভজিবে চরণ॥
এই যে কহিল ক্রীড়া এই অনুগ্রহ।
ইহা ছাড়ি কেমনে তার মায়া হয় গ্রহ॥"

মায়াতীত কোন নির্দিষ্ট লোকে এই লীলাসকল নিত্য প্রকটিত হয়ে থাকে সেই লোকটি হ'ল বৈকুণ্ঠলোকের উপরিস্থিত অংশে বিরাজিত কৃষ্ণলোক। এই লোকের তিনটি অংশের নাম দ্বারকা, মথুরা ও গোকুল। এই গোকুলের তিনটি ভাগে আছে—গোলোক, শ্বেতদ্বীপ এবং বৃন্দাবন।

"এই তিন লোকে কৃষ্ণ কেবল লীলাময়।
নিজগণ লৈয়া খেলে অনন্ত সময়॥"

চৈ, চ, ১।৫।২৫

বৈকুণ্ঠলীলার ক্ষেত্রেও সব লীলার পূর্ণ প্রচার নাই, কিছু কিছু গুপ্ত লীলা আছে যা চমৎকার প্রকৃতির হ'লেও অপ্রকাশিত। যে লীলাতে কিছু কিছু অদ্ভুত বিহার আছে যেমন বাৎসল্যরসে বিভোর মাতা যশোদা যথার্থ পুত্রজ্ঞানে গোপালকে দাম বন্ধন করেছিলেন, সখা বুদ্ধিতে শ্রীদাম সুদামাদি সকলে কানাইয়ের স্কন্ধে আরোহণ এবং উচ্ছিষ্ট খাওয়ানো পর্যন্ত করে থাকেন, আবার মানময়ী শ্রীমতী রাধারানী তাঁর প্রাণবধু গোবিন্দের প্রতি রুষ্ট হয়ে ভর্ৎসনাদি করে থাকেন। এইসব লীলাপ্রকরণ বৈকুণ্ঠেও অপ্রচারিত।

"বৈকুণ্ঠাদ্যে যে যে লীলার নাহিক প্রচার।
সে সে লীলা করিব যাতে মোর চমৎকার॥"

১।৪।২৭

তাই বৈকুণ্ঠলীলা অপেক্ষা ব্রজলীলার উৎকর্ষ। এই লীলা শুদ্ধ ভক্তিময় লীলা, প্রেমময়, স্নেহময় লীলা। একই লীলার মধ্যে প্রেমের মাধুর্যময় আবরণের পশ্চাতে সুখ ও দুঃখ সমভাবে এবং বিশেষভাবে আত্মপ্রকাশ করে তাই ব্রজের লীলা নির্মল রাগসমৃদ্ধ লীলা।

"ব্রজের নির্ম্মল রাগ শুনি ভক্তগণ।
রাগমার্গে ভজে যেন ছাড়ি ধর্ম্ম কর্ম্ম॥

১।৪।৩২

ব্রজলীলা মাধুর্যমণ্ডিত লীলা, কৃষ্ণসুখ সম্পাদনের লীলা। এই লীলাটিতে আত্মেন্দ্রিয় সুখের কোন সংকল্পই নেই। গোপীদের প্রতিটি কর্মই কৃষ্ণসুখ উৎপাদনের জন্য। এই সুখ উৎপাদনের সংকল্পই প্রেম আর এই গোপীপ্রেম পরম 'অধিরূঢ় ভাব' সঞ্জাত, তাই নির্মল, পরম নির্মল, বিশুদ্ধ নির্মল—এই নির্মলতার কোন বিশেষণ নাই। লীলা প্রসঙ্গে গোপীদের সম্ভোগাদির কথা

চিন্তা করলে আপাত কামের লক্ষণ পরিদৃষ্ট হ'লেও সেই সম্ভোগ যেহেতু কৃষ্ণসুখ তাৎপর্যবাহী সেহেতু এটিই হ'ল নির্মল প্রেম।

"আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা—তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছা—ধরে প্রেম নাম।"

১।৪।১৬৪

বৃন্দাবনের রসের বিলাসকে পূর্ণায়িত বিলাসের রূপদান কল্পে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ লীলার সহায়ক বহুতর রূপের সৃষ্টি করে থাকেন। এই বিভিন্নরূপের আস্বাদনের তারতম্য অনুযায়ী নানাবিধ ভাবরসের সৃষ্টি হয়ে থাকে এবং সেই মতে লীলারসের আস্বাদন হয়।

"বহু কান্তা বিনা নহে রসের উল্লাস।
লীলার সহায় লাগি বহুত প্রকাশ।
তার মধ্যে ব্রজে নানা ভাব-রস ভেদে।
কৃষ্ণকে করায় রাগাদিক লীলাস্বাদে॥"

১।৪।৭৯-৮০

এই লীলা আস্বাদনের সুযোগের আধিক্য প্রস্ফুটিত হয়েছে বৃন্দাবনে। এই শ্রীধাম বৃন্দাবন পৃথিবীর অন্তর্ভুক্ত বলেই স্বর্গ মর্ত্য ও পাতাল—এই ত্রিভুবনের মধ্যে মর্ত্যলোককেই কৃষ্ণচন্দ্র ধন্য বলে অভিহিত করেছেন।

"ত্রৈলোক্য পৃথিবী ধন্যা যত্র বৃন্দাবনং পুরী।
তত্রাপি গোপিকাঃ পার্থ! যত্র রাধাভিধা মম॥

১।৪।২১৪

এই ব্রজলীলার স্তরে স্তরে জটিলতা, কারণ সম্পর্কের মধ্যে দ্বিবিধত্ব। যেমন প্রেমাসক্ত গোপীগণের স্বকীয় পতি বর্তমান থাকা সত্ত্বেও গোবিন্দকে পতিরূপে গ্রহণের ব্যবস্থা এবং তাঁর সঙ্গে বিলাস অর্থাৎ উপপতির সঙ্গে বিলাস—জাগতিক বা প্রাকৃত দৃষ্টিতে এই লীলাকে অবৈধ বলে মনে হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু কেন এই উপপতি সম্পর্কের এত উৎকর্ষ। স্বাভাবিক প্রশ্নটি হ'ল—

"সৃষ্টি হেতু রমণ দাম্পত্য বেদমত।
উপপত্যে রমণ সে বেদ অসম্মত॥"

এর উত্তরে বলা যায়, সৃষ্টি হয় বীজ থেকে। দাম্পত্য সম্পর্ক যদ্যপি সৃষ্টির কারণসম্পর্ক, তথাপি এটি বীজ অংশ এবং এই অংশ নীরস ও স্বাদহীন কিন্তু আস্বাদ্য রসপূর্ণ ফলটিই সকলের কাম্য। জীবাত্মা বীজস্বরূপে সৃষ্টিকার্যে নিয়োজিত আর পরমাত্মা রস অংশে মধুর সুস্বাদ ফলস্বরূপ আস্বাদ্য তত্ত্ব হিসাবে বর্তমান।

"বীজের সে এক ফল দোহার দুই গুণ।
মধুর সুস্বাদ ফল বীজ রসহীন॥

জীবাত্মা পরমাত্মা প্রকৃতি পুরুষ।
আত্মা অংশে জীব পরমাত্মা অংশে রস॥
বীজ অংশে সৃষ্টি হয় সকল সংসার।
অবৈদিক রস অংশে পরম বেভার॥
দাম্পত্যের সৃষ্টি উপপত্যের বিলাস।
তে কারণে বৃন্দাবনে প্রভু কৈল রাস॥
দাম্পত্যে উপপত্যে কি গুণ কাহার।
বিবরি কহিব কিছু তাহার বিচার॥
দাম্পত্যে ভজে যেই বেদে দেই ভার।
বেদের সম্মত তবে জাতি কুলাচার॥
কৃষ্ণ পতি আমি পত্নী এই সে সম্বন্ধ।
এই ভাবে ভজে গোপী নির্বোধ নির্বন্ধ॥
ওই কৃষ্ণ স্বামী বলি তার ভাব অন্তর।
তিলেক বিচ্ছেদে নাহি করে তার ভর॥
উপপতি যার ভাব গৃহে পতি আছে।
পতিকে অধিক সেই কৃষ্ণ করিয়াছে॥
পর পতি পতি কৃষ্ণ করিয়াছে বুকে।
এখন ছাড়য়ে পাছে এই ভাব থাকে॥"

দুঃ সার।

ব্রজলীলায় যাঁরা গোপী রূপে কৃষ্ণলীলা পার্ষদত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে প্রভেদ আছে। অগ্নির অসংখ্য মুনিপুত্রগণ সকলেই কৃষ্ণরসে মুগ্ধ হয়ে তাঁর পার্ষদত্ব কামনা করেছিলেন। এবং তাঁরা বলেছিলেন—

"তোর রূপে মূচ্ছির্ত কামে অচেতন।
স্ত্রী হৈয়া ভজি তোরে এই লব মন॥
আপন মনের কথা কৈল নিবেদনে।
সঙ্গের গোপী যেন হই তোমা সনে॥"

বৃহদ্বামনপুরাণে উক্ত অগ্নিপুত্রগণের প্রার্থনা—

"তথাতঃ শ্লোকরাসিত্ব কামতত্ত্বেন গোপিকা।
ভজন্তং রমণোন্মত্তা চিকীর্ষাজনিন স্তথা।"

এই বর তাঁরা ভিক্ষা করলেন কারণ মুনিবর্গের স্তবে গোবিন্দ তুষ্ট হয়ে বলেছিলেন—

"তুষ্ট হৈয়া বর দিব কৈল ভগবান।
যে পিপাসা তাহা দিব না করিব আন॥"

এর জন্যই লজ্জা ভয় ইত্যাদি ত্যাগ করে মুনিগণ মনের গহনতম আকাঙ্ক্ষাটি

ব্যক্ত করেছিলেন। এর উত্তরে শ্রীভগবান বললেন—

"আগামিনি বিরিঞ্চিশ যাতে
স্রষ্টুস্ত্বমুদ্যতে।
কল্পসারস্বতং প্রাপ্য ব্রজে গোপী
ভবিষ্যতি॥"

অর্থাৎ,

"দিব বর বলি কৃষ্ণ কৈল তা সবারে।
অবশ্য হইব আর কি কাজ বিচারে॥
পৃথিবীতে জন্ম আমি লভিব যে কালে॥
সারস্বত কল্প পাইয়া আর ব্রহ্মার কালে।
ব্রজগোপী হৈয়া জন্ম লভিব তাহাতে।
তাতে তো সবার পূর্ণ হৈব মনোরথে॥
এতেক শুনিয়া সে সকল শ্রুতিগণ।
আর যত মুনিগণ অগ্নির নন্দন।
সবে আসি গোপী কুলে জন্মে গোপী হৈয়া।
বৃন্দাবনে গোপী হৈয়া রমে কৃষ্ণ লৈয়া॥
এই সব গোপী যত গণনা কে জানে।
কৃষ্ণের পরম প্রিয় নিজ গোপীগণে॥
নিত্য সিদ্ধ বলি তারে কৃষ্ণের প্রেয়সী।
কৃষ্ণের সমান সেই হেন প্রায় বাসি॥
আরও গোপিকা তাহে জাতি যে মানুষী।
কৃষ্ণের ভজনা সুখে তারা সব দাসী॥"

দুঃ সার।

সত্যসংকল্প ভগবান তাই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করলেন দ্বাপরে কৃষ্ণ অবতার হয়ে যখন বৃন্দাবনে অবতীর্ণ হলেন। তাই এই বহু গোপী নিয়ে লীলাবিলাসের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয় সুখ সংকল্প অপেক্ষা ভক্তদের, অনুগতদের বাঞ্ছা পূরণ সংকল্পই ছিল প্রধান। এই লীলাসূত্রে বহুজনার আকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণ করেছেন। এই হ'ল লীলার সার্থকতা, লীলার মাংগলিক বৈশিষ্ট্য।

রাধাকৃষ্ণ লীলা প্রসংগে নায়ক শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র এবং নায়িকা শ্রীমতী রাধারানী দু'টি ভিন্ন সত্ত্বা, ভিন্ন বিগ্রহ বলেই পরিদৃষ্ট। তা ছাড়া ভিন্ন না হ'লে কি করেই বা লীলা প্রকট করা যায়? কিন্তু শাস্ত্রানুযায়ী শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ অভিন্নাত্মা, তাঁদের মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। কেবলমাত্র লীলাবিলাসের তাৎপর্যকে সুস্পষ্ট করে রস প্রকাশ করার জন্য দুই দেহ ধারণ করেছেন।

"রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি।

অন্যোন্যে বিলসে রস আস্বাদন করি ॥"

রাধাতত্ত্ব সম্পর্কে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থের উক্তি—

"দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।
সর্বলক্ষ্মীময়ী সর্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা ॥"

শ্রীরাধা হ'লেন দেবী, কৃষ্ণময়ী, রাধিকা, পরদেবতা, সর্বলক্ষ্মীময়ী, সর্বকান্তি, সম্মোহিনী ও পরা ॥

শ্রীমতীকে বলা হয়েছে 'কৃষ্ণ-ক্রীড়া-পুঞ্জার বসতিনগরী।' কিম্বা প্রেমরসময় কৃষ্ণের স্বরূপ। তাঁর শক্তি—'তাঁর সহ হয় একরূপ।"

আবার বলা হয়েছে—

"কিংবা কান্তি শব্দে কৃষ্ণের সব ইচ্ছা কহে।
কৃষ্ণের সকল বাঞ্ছা রাধাতেই রহে ॥
রাধিকা করেন কৃষ্ণের বাঞ্ছিত পূরণ।
সর্বকান্তি শব্দের এই অর্থ বিবরণ ॥
জগত মোহন কৃষ্ণ তাঁহার মোহিনী।
অতএব সমস্তের পরা ঠাকুরানী ॥
রাধা পূর্ণ শক্তি কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান।
দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্রের প্রমাণ ॥
মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি জ্বালাতে যৈছে কভু নাহি ভেদ ॥
রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ ॥"

১।৪।৯২-৯৭

এই সব তত্ত্বগত জটিলতা সুস্পষ্ট না হ'লে রাধাকৃষ্ণলীলার উপলব্ধি মোটেই সম্ভব নয়।

দুর্লভসার গ্রন্থে উক্ত আছে—

খেলার নিমিত্তে দোঁহে হৈল আবির্ভাব।
আপন স্বভাবে ভুঞ্জে রস অনুরাগ ॥
তাহাতে কাহার কেবা ছাড়িয়াছে লেহ।
ন্যূন অধিক অংশে ধরে দোহে দেহ ॥"

দুঃ সার

বৃন্দাবনের সর্বরূপেই স্বয়ং গোবিন্দ—'যাহা যাহা নেত্র পরে তাহা তাহা কৃষ্ণ স্ফুরে।'—এমন কৃষ্ণময় কৃষ্ণ স্বরূপের সঙ্গে কৃষ্ণরূপের লীলাবিলাস এবং সেই মাধুর্যের আস্বাদন এবং সেই লীলারসের অনুভব মায়ান্ধ জীবের ক্ষেত্রে সহজ সংকল্প নয়।

"অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি নভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥

শ্রীকৃষ্ণ নামগুণ লীলাদি সমস্ত বিষয় প্রাকৃত ইন্দ্রিয় 'সূত্রে' গ্রহণ করা যায় না।

"অতএব কৃষ্ণের নাম, দেহ, বিলাস।
প্রাকৃতেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে, হয় স্বপ্রকাশ॥
কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণগুণ, কৃষ্ণলীলাবৃন্দ।
কৃষ্ণের স্বরূপ সম—সব চিদানন্দ॥

শ্রীকৃষ্ণ লীলাময় পুরুষ—

"কিশোর শেখর ধর্ম্মী ব্রজেন্দ্রনন্দন।
প্রকট লীলা করিবারে যবে করে মন॥
আগে প্রকট করায় মাতাপিতা ভক্তগণে।
পাছে প্রকট হয় জন্মাদিক-লীলাক্রমে॥
পুতনা বধাদি যত লীলা ক্ষণে ক্ষণে।
সব লীলা নিত্য প্রকট করে অনুক্রমে॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তার নাহিক গণন।
কোনো লীলা কোন ব্রহ্মাণ্ডে করে প্রকটন॥
এই মত সব লীলা যেন গঙ্গাধার।
সে সে লীলা প্রকট করে ব্রজেন্দ্র কুমার॥
ক্রমে বাল্য পৌগণ্ড কিশোরতা প্রাপ্তি।
রাস আদি লীলা করে কৈশোরে নিত্য স্থিতি॥
নিত্যলীলা কৃষ্ণের সর্বশাস্ত্রে কয়।
বুঝিতে না পারে লীলা কেমনে নিত্য হয়॥"

চৈ-চ

'বুঝিতে না পারা' বিষয়টি খুবই সত্য। শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রহ্মস্তুতিতে বলা হয়েছে—

"কো বেত্তি ভূমন্ ভগবন্ পরাত্মন্
যোগেশ্বরোতী ভবতস্ত্রি লোক্যাং।
কাহো কথং বা কতি বা কদেতি
বিস্তারয়ণ ক্রীড়াস যোগমায়াং॥"

"হে সর্বৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবান! হে সর্বান্তর্যামী, হে যোগেশ্বর! তুমি তোমার মহা স্বরূপশক্তি যোগমায়াকে বিস্তার পূর্বক ক্রীড়া কর। তোমার লীলা কোথায়, কি প্রকারে, কত প্রকারে কোন্ সময় সংঘটিত হয় তা ত্রিভুবনে কে বুঝতে পারে?" ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলা প্রসঙ্গাদির অন্ত ব্রহ্মাদি দেবতাগণও কেউ পান নাই

এমনকি শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংও পান নাই বলে শ্রুতিচারীগণের বক্তব্য।

"দ্যু পতয় এবতে ন যযুরণন্তমনন্তয়া
ত্বমপি যদন্তরান্ত-নিচয়া ননু সাবরণাঃ।
খ ইব রজাংসি বান্তি বয়সা সহ যৎ শ্রুতয়-
স্ত্বয়ি হি ফলন্ত্যতন্নিরসনেন ভবন্নিধনাঃ॥"

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তোমারই মধ্যে কালচক্রের নিত্য ধূলিকণাসমূহের মতো ঘূর্ণায়মান।

"জানন্ত এব জানন্তু কিং বহূক্ত্যান মে প্রভো।
মনসো বপুতো বাচো বৈভবং তব গোচরঃ॥"

শ্রীমদ্ভাগবত

ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন, "হে প্রভো! আমি আর কি বলব! যারা তোমার মহিমা জানে বলে গর্ব করে তারা জানুক, কিন্তু তোমার লীলা, তোমার মহিমা আমার মন, দেহ এবং বাক্যাদির অগোচর।"

শ্রীকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ পাঠ করা যায়, শ্রবণ করা যায়, কীর্তন করা যায়—এমন কি ক্ষেত্র বিশেষে অর্থবাদও করা যায় কিন্তু এ লীলারহস্য উপলব্ধি বা অন্তরে লীলা স্ফুরণ হয় না। যুক্তিবাদী মানুষ লীলাস্মরণ ক্ষেত্রেও যুক্তি খুঁজে বেড়ায় কিন্তু যুক্তির সীমা যেখানে শেষ হয়ে যায় সেখানে তাঁদের প্রবেশ অধিকার থাকে না। শ্রীকৃষ্ণলীলায় ছয় দিনের শিশু কৃষ্ণ পুতনার মতো দীর্ঘকায় রাক্ষসকে হত্যা করেন, ছয় বৎসরের বালক শ্রীকৃষ্ণ গিরি গোবর্ধনের মতো বৃহৎ পর্বতকে উত্তোলন করে কনিষ্ঠাঙ্গুলিতে ধারণ করেন। কালিয়নাগের মতো বৃহৎ সর্পের মস্তিষ্কের উপর নৃত্য করেন এবং সজোরে আঘাত করে তাঁকে দমন করেন, বাল্য বয়সে বকাসুরকে বধ করেন, শকটাসুরকে বধ করেন। তা ছাড়া ব্রহ্মমোহন লীলা প্রকট করেন, ইন্দ্রাদি দেবগণকে মোহিত করেন—যুক্তিবাদীগণ শ্রীকৃষ্ণেরও এসব লীলাকে ঐশ্বরিক শক্তি বা দৈবশক্তি বলে মেনে নেন। কিন্তু মধুর রসের লীলা প্রসঙ্গে যুক্তিবাদীগণ কেবল হাবুডুবু খান কিন্তু কোন স্পষ্ট সিদ্ধান্ত খুঁজে না পেয়ে হতাশ হয়ে যান। সহস্র গোপিনীর সঙ্গে একা নায়ক শ্রীকৃষ্ণের বিলাস, আয়ান ঘরণী শ্রীমতী রাধারানীর সঙ্গে গোপন লীলাদি প্রকট করা, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান হয়ে বৃন্দাবনের নারীসমাজের কাছে তাঁর বশ্যতা স্বীকার—ইত্যাদি বিষয়গুলি লীলা হলেও বিস্ময়কর এবং যুক্তিতর্ক দ্বারা বা জ্ঞানের অস্ত্র দ্বারা এর বিশ্লেষণ সম্ভব হয় না। তাই এ লীলার অনুভব ধ্যানের যুগে, যজ্ঞের যুগে বা পূজা পরিচর্যাদির যুগে সম্ভব হয়ে ওঠে নাই। একমাত্র ভক্তির যুগ অর্থাৎ কলি যুগে এ লীলা আস্বাদনের সুযোগ আছে। সাধন বিষয়ে কলিযুগ শ্রেষ্ঠ, কারণ পূর্ব পূর্ব যুগের সমস্ত সাধনের ফল একত্র সংযুক্ত করে যে ফল পাওয়া যায় কলিযুগের সাধনে তার চেয়েও অধিক

ফল পাওয়া যায়।

"কৃতে যদ্ধ্যায়তে বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥"

সংকীর্তনরূপ মহাযজ্ঞের সূত্রেই সমস্তবিধ সাধনের ফল লাভ করা যায়। বিশেষ কারণ এই যুগে পতিতপাবন, অধমতারণ গৌরসুন্দর অবতীর্ণ হয়েছেন।

"ধন্য কলিযুগ গোরা অবতার
সুরধুনী ধনি ধানিয়া॥"

গৌরলীলা তত্ত্ব

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি—এই চার যুগে হয় এক দিব্য যুগ; একাত্তর দিব্য যুগে হয় এক মন্বন্তর; এমন চৌদ্দ মন্বন্তরে হয় ব্রহ্মার এক দিবস। ব্রহ্মার একদিনে একবার অবতীর্ণ হন 'পূর্ণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রকুমার'। চৌদ্দটির মধ্যে সপ্তম মন্বন্তরকে বলা হয় বৈবস্বত মন্বন্তর। এই বৈবস্বত মন্বন্তরের পর অষ্টাবিংশ চতুর্যুগের তৃতীয় যুগ দ্বাপরের শেষে সমগ্র বৃন্দাবন সহ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হন। পরবর্তী কলিযুগের প্রথম সন্ধ্যায় অর্থাৎ দৈব পরিমাণের ১২,০০০ বৎসর পর বা মানব পরিমাণের ৪৩,২০,০০০ বৎসর পর অবতীর্ণ হন আপন ভক্তবৃন্দদের নিয়ে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নবদ্বীপে। নবদ্বীপে যতবার অবতীর্ণ হন তার শেষ লীলা হ'ল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রের প্রেমের ঠাকুর শ্রীগৌরসুন্দরের লীলা।

"শেষ লীলায় নাম ধরে 'শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য'।
কৃষ্ণ জানাইয়া সব বিশ্ব কৈল ধন্য।"

১।৩।৩৩

অর্থাৎ ইতঃপূর্বে কৃষ্ণলীলার বৈশিষ্ট্য বা লীলাতাৎপর্য, এবং সে লীলার অন্তর্নিহিত উন্নত উজ্জ্বল রসের সন্ধান কেহ দেন নাই কেহ পান নাই। তা অনাদি অনন্তকাল ধরে অনর্পিত ছিল। একমাত্র পরমকরুণ শ্রীমন্মহাপ্রভু এই বিশেষ কলিযুগে শ্রীধাম নবদ্বীপে অবতীর্ণ হয়ে চির অনর্পিত সেই উন্নত উজ্জ্বল শ্রীরাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলারস জীবজগতের সমক্ষে তুলে ধরলেন। এবার সকলের পক্ষেই শ্রীকৃষ্ণ লীলা প্রসংগ অনুধাবানের সুযোগ হ'ল।

"অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বল রসাং স্বভক্তিশ্রিয়ং।
হরিঃ পুরটসুন্দর-দ্যুতিকদম্ব-সন্দীপিতঃ
সদা হৃদয় কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥"

"যদি গৌর না হইত কেমন হইত

কেমনে ধরিতাম দেহ।
রাধার মহিমা প্রেম রসসীমা॥
জগতে জানাত কে ?"

বৃন্দাবন লীলায় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ও শ্রীমতী রাধিকাসুন্দরী একাত্ম হয়েও ভিন্ন ভিন্ন দেহ ধারণ করেছিলেন। কিন্তু বর্তমান নদীয়ার এই শ্রীচৈতন্য লীলায় সেই দেহভেদ আর নাই, শ্রীমন্মহাপ্রভুর এক দেহের মধ্যেই লীলাময় শ্রীকৃষ্ণ এবং লীলাময়া শ্রীমতী রাধারানী একীভূত হয়েছেন। তাই মহাপ্রভুর আবির্ভাব এবং তাঁর লীলার মর্মবোধ আস্বাদন সার্থক হয়েছে। অন্তরে শ্রীগোবিন্দকে ধারণ করে বাইরে শ্রীমতী রাধার স্বর্ণদ্যুতি নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন স্বয়ং শ্রীগৌরাঙ্গরূপে।

"রাধাকৃষ্ণ-প্রণয় বিকৃতিহ্লাদিনী শক্তিঃ-
রস্মাদেকং কান্তা না বপি ভুবি পুরা
দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ঞ্চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতি সুবলিতং নৌমি
কৃষ্ণস্বরূপম্॥"

তাই এই শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাশক্তির সূত্রেই গৌরভক্তের হৃদয়ে ব্রজলীলা প্রসঙ্গ প্রস্ফুটিত হয়ে উঠে। একমাত্র যেই কলিতে (অর্থাৎ এই কলিতে) শ্রীগৌরসুন্দর অবতীর্ণ—সেই কলিতে জন্মলাভ করে তাঁর পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করে রাগাত্মিকা ভক্তির দ্বারা আপ্লুত নয়ন লাভ করে শ্রীকৃষ্ণলীলাদি দর্শন, স্মরণ, মনন ইত্যাদি করা সম্ভব। তাই গৌরচরণ স্মরণ করাই হ'ল মূল সূত্র।

অবতীর্ণে গৌরচন্দ্রে বিস্তীর্ণে প্রেমসাগরে।
যে ন মজ্জন্তি মজ্জন্তি তে মহানর্থসাগরে॥
অবতীর্ণে গৌরচন্দ্রে বিস্তীর্ণে প্রেমসাগরে।
সুপ্রকাশিত-রত্নৌঘে যো দীনো দীন এব সঃ॥

শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী বহুজন্মার্জিত জ্ঞান মন্থন করে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাসিক্ত অভিজ্ঞতা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে বলেছেন যে, গৌরচন্দ্র হলেন বিস্তীর্ণ প্রেমসমুদ্রস্বরূপ। এই প্রেমসমুদ্রে অবগাহন করতে পারলে অনন্ত রত্নরাজি সে লাভ করতে পারে। আবার এই সাগরকে উপেক্ষা করে অন্যত্র যেখানেই তারা অনুরক্ত হোন না কেন তা হল মহা অনর্থসাগরে নিমজ্জিত হবার মতো এবং এর ফলে যে দীন সে দীন হয়েই থাকে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রেমের সাগর। প্রেমের সূত্র ধরেই প্রেমকে আস্বাদন করবার জন্যই, প্রেমের ধর্মকে নতুনভাবে ধরিয়ে দেবার জন্যই অবতীর্ণ হয়েছেন—প্রেমসিন্ধু গোরা রায়।

"প্রেমভক্তি শিখাইতে আপনে অবতরি।
রাধা-ভাব-কান্তি দুই অঙ্গীকার করি॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে কৈল অবতার।
এই তো পঞ্চম শ্লোকের অর্থ পরচার॥

আদি চৈ-চ : ১।৪।৯৮, ৯৯

শ্রীমন্মহাপ্রভু পূর্ণায়ত একটি লীলাবিগ্রহ ; প্রেমরসময় শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ ও হ্লাদিনী—শক্তিস্বরূপিণী শ্রীমতী রাধিকার মিলিত বিগ্রহ। ক্ষণে কৃষ্ণ, ক্ষণে রাধা। ক্ষণে রাধাকৃষ্ণ সম্মিলিত বিগ্রহ। কখনো দেখা যায় কাঞ্চন পাঞ্চালিকা ভেদ করে যেন উজ্জ্বল নীলমণির জ্যোতি, আবার কখনো দেখা যায় স্নিগ্ধ প্রাবৃটঘনশ্যাম স্বরূপকে আচ্ছন্ন করে আছেন এক তপ্তকাঞ্চন গৌরাঙ্গীর অপূর্ব রূপাধার। কখনো দুই, কখনো এক। কে আধার, কে আধেয়—অচিন্ত্যমানস। মুখ্য গৌণের বিচার নাই। ভাবরূপের বিচার নাই। সম্মিলিত একটি প্রেমলীলা-বৈভবের প্রকাশ মাত্র। শ্রীজীব গোস্বামীপাদ তাঁর তত্ত্বসন্দর্ভে বলেছেন—

"অন্তঃ কৃষ্ণং বহির্গৌরং দর্শিতাঙ্গাদি বৈভবম্।
কলৌ সংকীর্ত্তনাদ্যৈঃ স্ম কৃষ্ণচৈতন্যমাশ্রিতাঃ॥"

'অন্তঃ কৃষ্ণং' আর 'বহি গৌরং'—এই সম্পর্ক থেকেই সুস্পষ্ট চিন্তা করা যায় যে গৌর বহিরাবরণ ভেদ করলে অন্তস্থ কৃষ্ণ প্রসঙ্গে প্রবেশ সম্ভব।

"শ্রদ্ধা করি এই লীলা শুন ভক্তগণ।
ইহার শ্রবণে পাবে চৈতন্য চরণ।
ইহার প্রসাদে পাবে কৃষ্ণ তত্ত্বসার।
সর্বশাস্ত্র সিদ্ধান্তের ইহা পাইবে পার।

চৈ-চ : ২।২৫।২৭০-৭১

শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা প্রসঙ্গ যথার্থভাবে স্মরণ করলে তবেই বৃন্দাবন লীলায় প্রবেশের অধিকার পাওয়া যায়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলাসঙ্গীগণকে নিত্যসিদ্ধ জ্ঞান করতে হ'বে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলাভূমিকে চিন্তামণিস্বরূপ জ্ঞান করতে হবে, নিরবধি শ্রীগৌরাঙ্গের নাম, গুণ এবং লীলা প্রসঙ্গে মত্ত হয়ে গৌরপ্রেম রস সাগরের তরঙ্গে ডুবে থাকতে হ'বে তবেই শ্রীরাধা মদনগোপালদেবের সান্নিধ্য পাওয়া যাবে, বৃন্দাবনে বাস নিশ্চিত হ'বে এবং শ্রীরাধামাধবের অন্তরঙ্গ জনের মধ্যে গণ্য হ'তে পারবে।

১। শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদাশ্রয়ে—ভক্তিরসসার অর্থাৎ উন্নত উজ্জ্বল রস সম্পর্কে জ্ঞান লাভ।

২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা শ্রবণে—হৃদয়ের আবিলতা দূর ও নির্মলতা বৃদ্ধি।

৩। শ্রীমন্মহাপ্রভুর নাম গ্রহণে—হৃদয়ে হয় প্রেমের উৎপত্তি।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর গুণের কথা সর্বদা স্মরণ করলে—শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিত্য-লীলা এবং সেইসঙ্গে শ্রীরাধাগোবিন্দের নিত্যলীলা দর্শন মিলে।

এই দর্শনের সূত্রে আবার কয়েকটি স্তরভেদ হয়—প্রথমত ব্রজেন্দ্রসুত কৃষ্ণচন্দ্রের নৈকট্য লাভ, দ্বিতীয়ত ব্রজবাস নিশ্চিত, তার পরেই তৃতীয় এবং শেষ স্তরে শ্রীরাধামাধবের অন্তরঙ্গত্ব লাভ হয়।

"গৌরাঙ্গের দুটি পদ যার ধন সম্পদ
সে জানে ভকতি রস সার।
গৌরাঙ্গের মধুর লীলা যার কর্ণে প্রবেশিলা
হৃদয় নির্ম্মল ভেল তার॥
যে গৌরাঙ্গের নাম লয় তার হয় প্রেমোদয়
তারে মুঞি যাই বলিহারি।
গৌরাঙ্গ গুণেতে ঝুরে নিত্যলীলা তার স্ফুরে
সে জন ভকতি অধিকারী॥
গৌরাঙ্গের সঙ্গিগণে নিত্যসিদ্ধ করি মানে
সে যায় ব্রজেন্দ্রসুত পাশ।
গৌর মণ্ডল ভূমি যেবা জানে চিন্তামণি
তাঁর হয় ব্রজভূমে বাস॥
গৌরপ্রেম রসার্ণবে সে তরঙ্গে যেবা ডুবে
সে রাধামাধব অন্তরঙ্গ।
গৃহে বা বনেতে থাকে হা গৌরাঙ্গ বলে ডাকে
নরোত্তম মাগে তার সঙ্গ॥"

ঠাকুর মহাশয়ের এই পদটিতে—

'সে জানে ভকতি রসসার,' 'সে জন ভকতি অধিকারী', 'সে যায় ব্রজেন্দ্র-সুত পাশ', 'তার হয় ব্রজভূমে বাস', 'সে রাধামাধব অন্তরঙ্গ,'—ইত্যাদি উক্তির মাধ্যমে যাঁকে নির্দিষ্ট করা হচ্ছে তিনি গৃহে বা বনে যেখানেই থেকে থাকুন তিনি কেবল "হা গৌর, প্রাণ গৌর" বলে সর্বদা গৌরসুন্দরকে ডাকছেন। অন্যদিকে এ ভক্তির মধ্যে একটি দৃঢ়তা সুস্পষ্ট অর্থাৎ 'সে' এবং 'তার' এই শব্দদ্বয়ের সূত্রে বোঝানো হয় কেবল মাত্র 'সে-ই' এবং 'তার-ই' অর্থাৎ যে শ্রীগৌর-সুন্দরের পদারবিন্দ আশ্রয় করে সেই এবং তারই। তৃতীয়ত উভয়লীলা যুগপৎ প্রতিপন্ন হ'লেও একটি কার্যকারণসম্পর্কের সন্ধান পাওয়া অর্থাৎ কৃষ্ণলীলা আস্বাদন যদি কার্য হয়ে থাকে তবে গৌরলীলা আস্বাদনই হ'ল তার কারণ। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে বলা হয়েছে—

"শ্রদ্ধা করি এই লীলা শুন ভক্তগণ।
ইহার শ্রবণে পাবে চৈতন্য চরণ॥

ইহার প্রসাদে পাবে কৃষ্ণ তত্ত্ব সার।
সর্বশাস্ত্র সিদ্ধান্তের ইহা পাইবে পার ॥"

শ্রীচৈতন্যলীলাই হ'ল মূল সূত্র অর্থাৎ লীলাপ্রসঙ্গের অক্ষয় সরোবর। এই সরোবরে এসে মিলেছে শ্রীকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গের অনন্ত অমৃতধারা, আবার এই অক্ষয় সরোবর থেকেই শ্রীকৃষ্ণলীলামৃতের ধারা বিভিন্ন দিকে প্রবাহিত হয়।

"কৃষ্ণলীলামৃত সার তার শত শত ধার,
দশদিক বহে যাহা হৈতে।
সে চৈতন্য লীলা হয় সরোবর অক্ষয়
মনহংস চরাহ তাহাতে ॥"

চৈ-চ : ২।১৫।১৭২

কৃষ্ণলীলাকে কাব্যিক উপকরণ মনে করে পাঠ করা যায়, তাত্ত্বিক বিষয় মনে করে গ্রন্থাদির সূত্র ধরে আনুমানিক সিদ্ধান্ত করা যায়, আবার নান্দনিক উৎকর্ষের বস্তু হিসাবে গণ্য করে নৃত্য, গীত বা সংগীতের মাধ্যমে প্রকাশের চেষ্টাও করা যায়। কিন্তু এমন কোন প্রচেষ্টাই যথার্থ সার্থক হয় না যদি পূর্ব পর্যায়ে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের সংগে এর কোন সম্পর্ক অনুভব না করা হয় অর্থাৎ যদি কৃষ্ণলীলা ও চৈতন্যলীলা যুগপৎ আস্বাদিত না হয়। শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলা রূপ ও ভাবের সমাশ্রিত লীলা, ভক্ত ও ভগবানের বিভিন্ন নিকট সম্পর্ক জনিত লীলা, ভগবানের প্রতিশ্রুতি পালনার্থক লীলা, ধরাভার অপনোদনার্থক লীলা, সর্বোপরি গোপবেশ বেণুকর নবকিশোর নটবরের মাধুর্যঘন লীলা। এই লীলাপ্রসংগ মংগলময়, তাই নিয়ত আস্বাদ্য। সমগ্র কৃষ্ণলীলার বিষয়গুলিকে আরও আস্বাদনময় করে তোলার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে শ্রীচৈতন্যলীলা। কৃষ্ণলীলার সংগে মাধুর্য সংযোজন করে স্বাদময়তা বৃদ্ধি করা হয়েছে, গন্ধাদি সংযোজিত করে কর্পূরিত করা হয়েছে, মাল্যভূষাদি সংযোজিত করে রূপসৌন্দর্য সৃষ্টি করা হয়েছে। তাই শ্রীচৈতন্যলীলা ও শ্রীকৃষ্ণলীলা পরস্পরের পরিপূরক এবং এই পরিপূরক সত্তা সুস্পষ্ট অনুভব হয় সাধুগুরুর কৃপাবলে।

"চৈতন্যলীলামৃতপূরে কৃষ্ণলীলা সুকর্পূর
দোঁহে মিলি হয় যে মাধুর্য্য।
সাধুগুরু প্রসাদে তাহা যেই আস্বাদে
সেই জানে মাধুর্য্য প্রাচুর্য্য ॥"

চৈ-চ : ২।২৫।২৭৮

রূপ গোস্বামী সনাতন গোস্বামী প্রমুখের প্রচেষ্টায় যে শ্রীকৃষ্ণলীলাতত্ত্বাদি সুস্পষ্ট করে তোলা হয়েছিল তা নিতান্তই শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাবলে। এই লীলা-তত্ত্ব প্রচারের অধিকার অর্পণ করেছিলেন শ্রীমন্মহাপ্রভু। তাঁর কৃপানির্দেশ ভিন্ন এই ব্রজলীলার যাথার্থ্য অনুধাবন গোস্বামীবর্গের পক্ষেও সম্ভব হ'ত না।

"কালেন বৃন্দাবন-কেলি-বার্ত্তা
লুপ্তেতি তাং খ্যাপয়িতুং বিশিষ্য।
কৃপামৃতে নাভিষিষেচ দেব
স্তত্রৈব রূপঞ্চ সনাতনাঞ্চ॥"

চৈঃ চন্দ্রোদয় ৯।১০৪

এর মূল তাৎপর্য হ'ল যে কৃষ্ণলীলা আস্বাদনের প্রাক্‌পর্বে চৈতন্যকৃপা লাভের প্রয়োজন।

"লোকভিড় ভয়ে প্রভু দশাশ্বমেধ যাইয়া।
রূপ গোঁসাইকে শিক্ষা করান শক্তি সঞ্চারিয়া॥
কৃষ্ণতত্ত্ব-ভক্তিতত্ত্ব-রসতত্ত্ব প্রান্ত।
সব শিখাইল প্রভু ভাগবত সিদ্ধান্ত॥
... ...
শ্রীরূপ হৃদয়ে প্রভু শক্তি সঞ্চারিলা।
সর্ব্বতত্ত্ব নিরূপণে প্রধান করিলা॥
শিক্ষা দিয়া বৃন্দাবন যাইতে আজ্ঞা দিল।
প্রভু আজ্ঞা-অনুসারে সব আচরিল॥"

তাই বৃন্দাবন লীলা, শ্রীকৃষ্ণ কথা, কৃষ্ণতত্ত্ব বিশ্লেষণ ইত্যাদির প্রারম্ভে অনুরূপ গৌরাঙ্গ প্রসঙ্গ আলোচনা অবশ্যকর্তব্য। এরই সূত্রে যে দীপিকা অন্তরে প্রজ্বলিত হয়ে হৃদয়কে সরস, নির্মল এবং লীলা উপভোগের যোগ্য করে তোলে তা-ই হ'ল গৌরচন্দ্রিকা। এবং এর জন্য নির্দিষ্ট পদাবলী, স্তবাবলী, গীতাবলীকে গৌরচন্দ্রিকা বলে আখ্যা দেওয়া হয়।

"ব্রজলীলা স্মরণের পূর্ব সময়।
গৌরাঙ্গের নিত্যলীলা যেজন স্মরয়॥
রাধামাধবের লীলারসে তার চিত্ত।
তখনই মগন হয় সুদৃঢ় নিশ্চিত॥
অনন্ত অপার ব্রজরস বারিধিতে।
মানস মরাল যদি চাহ চড়াইতে॥
নবদ্বীপ লীলা সুধা মন্দাকিনী দিয়া।
পাঠাও তাহারে তথা সুখে নাচাইয়া॥
গৌরাঙ্গ করুণা বিনা কিছুতেই ভাই।
ব্রজলীলা রাধাপদ সেবালাভ নাই॥"

এই প্রত্যয় দৃঢ়ভাবে স্থাপন করার নিমিত্ত শ্রীনরোত্তমদাস ঠাকুর খেতরী মহোৎসবের সূত্রে গৌরচন্দ্রিকা কীর্তনের বিষয়টিকে স্মরণের অবিচ্ছেদ্য পবিত্র কর্তব্য বলে ঘোষণা করে প্রবর্তন করেছেন। খেতরী মহোৎসবে শ্রীরাধাবিনোদের

প্রাঙ্গণে সকলেই উপস্থিত হয়েছেন। সংকীর্তনের প্রারম্ভেই সব সুসজ্জিত হয়ে বসেছেন—কীর্তনের আসরে মৃদঙ্গ নিয়ে বসেছেন একদিকে শ্যামদাস অন্যদিকে দেবীদাস। মাঝে প্রধান হিসাবে বসেছেন ঠাকুর নরোত্তম এবং গোকুলানন্দ। সংকীর্তন আরম্ভের ক্রমটি নিম্নরূপ—

১। হাতুটি।

> শ্যামদাস দেবীদাস বাজায় মৃদঙ্গ।
> তাহে উপজয় কত রসের তরঙ্গ।
> ভেদয়ে গগন মৃদু মৃদঙ্গের ধ্বনি।
> কেহ থির হইতে নারে তাল পাঠ শুনি॥"

ভঃ রঃ ১৪।১২২-২৩

২। আলাপ আপত্তন।

> গোকুলাদি নানা ছাঁদে রাগ আলাপয়।
> রাগালাপে উৎকট গমক প্রকাশয়॥ ১২৪
> সপ্তস্বর গ্রামাদিক হৈল মূর্তিমান।

৩। গৌরচন্দ্রিকা।

> প্রথমেই করে গৌরচন্দ্র গুণ গান॥
> গান-মন্ত্রে প্রভু গৌরচন্দ্রে আকর্ষিল।
> গণ সহ প্রভু যেন সাক্ষাৎ হইল॥
> শ্রীনরোত্তমের কণ্ঠধ্বনি মনোহর।
> বরিষয়ে কি নব অমিয়া নিরন্তর॥ ১২৫-২৭

এই সূত্র থেকেই বোঝা যায় গৌরচন্দ্রিকা অর্থাৎ গৌরচন্দ্র গুণগান মন্ত্র স্বরূপ প্রথমে করণীয় তারপরে রাধাকৃষ্ণ কথা প্রসঙ্গে প্রবেশ করতে হয়। ঠাকুর নরোত্তম প্রবর্তিত এই রীতি অপরিবর্তিতরূপে অদ্যাবধি প্রচলিত। খেতরীতে সংকীর্তনোৎসবে দেবীদাসের মৃদঙ্গ বাদ্য শুনে বীরচন্দ্রপ্রভু ভাবাপ্লুত হন—

> "শ্রীদেবীদাসের কর লৈয়া ধরে বক্ষে।
> কি অপূর্ব বাদ্য কহি ধারা বহে চক্ষে॥
> গোকুলের বদনে শ্রীহস্ত বুলাইয়া।
> কহিলা কতেক তারে অধৈর্য্য হইয়া॥
> শ্রীগোবিন্দ কবিরাজের দুটি কর ধরি।
> কহে তুয়া কাব্যের বালাই লইয়া মরি॥
> তুমি যে জানহ নিত্যানন্দের মহিমা।
> আচার্য্যের অনুগ্রহ তার এই সীমা॥
> এত কহি গোকুলে কহয়ে বার বার।
> গাও গাও ওহে প্রাণ জুড়াও আমার॥

শুনিয়া গোকুল গায় হৈয়া উল্লাসিত।
কিবা সে কবিরাজ কৃত গীত ॥"

এই প্রসঙ্গে গাওয়া প্রথম যে গীতটির উল্লেখ পাওয়া যায় সেটি হ'ল—

"জয় জগতারণ কারণ ধাম।
আনন্দকন্দ নিত্যানন্দ নাম ॥
ডগমগ লোচন-কমল ঢুলায়ত,
সহজে অধীর গতি জিতি মাতোয়ার।
ভাইয়া অভিরাম বলি ঘন ঘন ফুকরই
গৌর প্রেম ভরে চলই না পার ॥"

এটি প্রসিদ্ধ বড় দশকোশী গান হিসাবে এখনও প্রচলিত। গড়াণহাটি গানের মধ্যে এটি একটি প্রধান গান।

শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলার যতবিধ প্রকরণ আছে প্রায় সব প্রকরণের অনুরূপ লীলা প্রকরণ আছে শ্রীচৈতন্যদেবের ক্রিয়াকলাপে। লীলাসূত্র স্থাপনের ক্ষেত্রে চৈতন্যদেবের এই লীলাগুলিই গৌরচন্দ্রিকা। মান, মাথুর, দান, নৌকাবিলাস, রাস-কুঞ্জভঙ্গ, গোষ্ঠ, উত্তরগোষ্ঠ ইত্যাদি লীলাবিষয় ছাড়াও সূর্যপূজা, পাশাক্রীড়া, জলকেলি, শ্রীকুণ্ডমিলন, হোরী, ঝুলন, বাসন্তীরাস, ফুলদোল ইত্যাদি লীলা-প্রসঙ্গের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে শ্রীচৈতন্যলীলায়। এই সমস্ত লীলাপ্রসঙ্গের মধ্যে যে মাধুর্য নিহিত আছে তার সামগ্রিক অস্তিত্বটিই অক্ষয় সরোবর, এবং সেই সূত্রে হলেন 'প্রেমসিন্ধু গোরা রায়'। লীলাময় শ্রীগৌরসুন্দরের প্রতিটি লীলাপ্রকরণ ভক্তগণের হৃদয়ে নিত্য নব উল্লাসে সৃষ্টি করে থাকে। প্রতিটি লীলাই হ'ল জীব-শিক্ষার বিষয় এবং প্রতিটি ক্রিয়াই হ'ল জীবপ্রেমের নিদর্শন। এই জীবপ্রেমের শিক্ষা সমাজপ্রেমের শিক্ষায় রূপান্তরিত হয় এবং পরিণত পর্যায়ে এই সমাজ-প্রেমের আদর্শই ভগবৎপ্রেমে পর্যবসিত হয়। যে প্রেমের আদর্শ ভারতবর্ষকে পৃথিবীর বুকে মহান করেছে সে পরিমার্জিত প্রেমের বীজ প্রথম রোপণ করেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কীর্তনের মাধ্যমে।

একাদশ অধ্যায়

কতিপয় জাত গানের স্বরলিপি

প্রাচীন গান সংরক্ষণের একমাত্র উপায় হল—স্বরলিপি করে রাখা। রাখাও হয় সেভাবে কিন্তু প্রাচীনকালের গানগুলির এমন কতকগুলি বিন্যাস আছে যা বর্তমান স্বরলিপি পদ্ধতিতে প্রকাশ করা কঠিন। বিশেষ করে কীর্তন গান, নিতান্তই গুরুমুখী। এ গানের বিশেষ পরিবর্তন হয় বলেও মনে হয় না। কারণ গানের বেশীর ভাগ গায়ক গুরুবাদী এবং বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী। তাই গুরু প্রদর্শিত স্বর-প্রয়োগ পদ্ধতিকে তাঁরা নীতিগতভাবে পরিবর্তন করতে চান না। ফলত গানের আদি থেকে যে রূপ ছিল আজও প্রায় তাই-ই আছে। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে গায়কের কণ্ঠের অপারগতা বা বিস্তার বাহুল্যের দরুন সামান্য পরিবর্তন হতে পারে। তবুও মেনে নিতে হয় যে—অন্তত পক্ষে শতাধিক বৎসর পূর্বে প্রাচীন জাত গানের যে রূপ ছিল তা আজও অপরিবর্তিত আছে, এর থেকে দ্বিতীয় প্রত্যয়টি দৃঢ় হয় যে আরও শতাধিক বছর আগে অর্থাৎ আজ থেকে দু-তিনশ বছর আগেও গানের এই সুরই ছিল। প্রধানত মূল গানের প্রথম চরণটির সুর ঠিকই রাখা হয়েছে। সময়ের অভাবে বা শ্রোতাদের ধৈর্য রক্ষার খাতিরে পরবর্তী অংশগুলি অনেকে ইচ্ছামত বিভিন্ন ছোটতালে বিভিন্ন সময় গেয়েছেন। বিশেষ করে মনোহরশাহী ঘরের গানগুলিতে এই প্রভাব বেশী লক্ষ্য করা যায়।

কীর্তন মূলত বাংলায় গ্রামীণ পর্যায়ের গান। এই গানের সুরগুলিতে পরবর্তীকালে সংস্কারপ্রাপ্ত সংগীত ব্যাকরণের প্রভাব বেশী পড়ে না। কীর্তন গানে সুরের "কোনাকুনি" এমনই একটি প্রকাশ যা মীড়ের চিহ্ন দিয়ে যথাযথ বোঝানো যায় না। স্বরপ্রয়োগ ক্ষেত্রেও অনেকসময় এমন জায়গায় দাঁড়াতে হয় যেখানে হারমোনিয়ামের দুই পর্দার পাশাপাশির কোনটিতেই মেশে না। অর্থাৎ স্বরের যে শ্রুতিটি এক্ষেত্রে ব্যবহার হয় তা যান্ত্রিক পদ্ধতিতে খুঁজে পাওয়া কঠিন। শ্রুতির প্রকাশে এমন কোন চিহ্ন প্রচলিত কোন স্বরলিপি পদ্ধতিতে না থাকায় কীর্তনের স্বরলিপি করা অনেকটা দুরূহ। কীর্তন গানে দুই স্বর তিন স্বর ব্যবহার করে অনেক ছোট ছোট গমক আছে স্বরলিপিতে কেবলমাত্র ঐ স্বরগুলিকে উল্লেখ করলে পরবর্তীকালে যাঁরা স্বরলিপি দেখে গান তুলবেন তাঁদের কাছে এই গমকগুলি দানা হয়ে মুড়কির রূপ নেবে। পূর্বেকার কীর্তন স্বরলিপিকার হরিদাস কর মহাশয় নিজেই অনেকক্ষেত্রে এই গানগুলিকে এড়িয়ে গেছেন। যেমন—"অরুনিত চরণে" গানের উত্তরার্ধের শেষে "চলনি রসাল রে" গায়ন ক্ষেত্রে চার মাত্রার যে সুদীর্ঘ গমক ছিল তা ভেঙে ভেঙে তিনি স্বরের মাধ্যমে প্রকাশ করে বিষয়টিকে সরল করেছেন—এমন স্বীকার তিনিই করেছেন। গমকের কোন চিহ্ন না থাকায় কীর্তনের সুস্পষ্ট স্বরলিপি করা সহজ সাধ্য নয়।

তাছাড়া বিলম্বিত মাত্রার গানগুলিতে অনেকসময় একটি মাত্রায় অনেকগুলি কথা সেই সংগে কিছু গমকও থাকে। একমাত্রার মধ্যে ঐ স্বর প্রকরণ লিখে প্রকাশ করা গেলেও তার যথার্থ প্রতিস্থাপন সম্ভব হয় না।

আবার যখন স্বর ধরে রাখতে হয় তখন বিশেষ বিশেষ মাত্রায় পার্শ্ববর্তী কোন স্বরকে স্পর্শস্বর হিসাবে লাগিয়ে প্রস্বন সৃষ্টি করা হয়। এক্ষেত্রে স্পর্শ-স্বরের চিহ্ন ব্যবহার করে স্বরলিপি করা গেলেও প্রস্বনের গভীরতা বোঝাবার নির্ভর যোগ্য কোন চিহ্ন নাই। সর্বোপরি কীর্তন গানের সুরের ভিয়ান এবং গানের দশা স্বরপ্রভাবমুক্ত। এগুলি বাচনিক ভঙ্গী এবং তত্ত্ব উপলব্ধির সাহায্যে পূর্ণরূপ নিয়ে থাকে সুতরাং স্বরলিপির মাধ্যমে এগুলি দেখানো সম্ভব নয়। কিন্তু তবুও যাঁরা এই প্রচেষ্টা করেছেন তাঁরা অনেকটা প্রকৃত গানের অনুকৃত একটি রূপকে তুলে ধরতে পেরেছেন।

আগেকার দিনে কোন ক্ষেত্রেই স্বরলিপির সাহায্যে কীর্তন গান শিক্ষা করা হত না। এক্ষেত্রে অবশ্য মূল অসুবিধা ছিল এই যে শিক্ষক একই গান বিভিন্ন দিনে শিক্ষা দিতে গিয়ে ক্ষেত্র বিশেষে রূপের পরিবর্তন করতেন। শিক্ষার্থী তাই বিপাকে পড়তেন এবং কীর্তন গান শেখা কঠিন বলে বিবেচিত হত। বর্তমানে শিক্ষার্থীদের শ্রবণশক্তি, মেধাশক্তি এবং সাঙ্গীতিক প্রতিভা পর্যাপ্ত থাকায় গুরুমুখে গানের মূল রূপটি শোনার পর বড় গানের মোটামুটি স্বরলিপি কাছে পেলে অনায়াসে গানটি তুলে ফেলতে পারে। এই পরীক্ষিত সত্য ধারণায় ওপর ভিত্তি করে শ্রদ্ধেয় পরেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় শংকর মিত্র বিদ্যালয়ের দ্বারা প্রকাশিত পত্রিকায় কতিপয় গানের স্বরলিপি করতে চেষ্টা করেছেন। তবে সব ক্ষেত্রেই হিন্দুস্থানী স্বরলিপি পদ্ধতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এই গ্রন্থে জাত গানের স্বরলিপির ক্ষেত্রে প্রথম পঙক্তিতে রাখা হয়েছে তাললিপি। এক্ষেত্রে কীর্তনাঙ্গীয় তাললিপি পদ্ধতিই অনুসৃত হয়েছে। সম দেখানো হয়েছে '+' চিহ্নে ফাঁক দেখানো হয়েছে '০' চিহ্নে, কাল দেখানো হয়েছে '·' চিহ্নে, কোন বিভাগ দেখানো হয় নাই। কারণ কীর্তনে বড় তালগুলির ক্ষেত্রে কোন বিভাগ দেখানো হয় না। দ্বিতীয় পংক্তিতে তালাঙ্ক অনুযায়ী গানের কথাগুলি লেখা হয়েছে। এক্ষেত্রে যেখানে সুরটি ধরে রাখা প্রয়োজন সেখানে কেবল স্বরবর্ণ ব্যবহার করা হয়েছে আবার যেখানে গমকের প্রয়োজন সেখানে একই সংগে একাধিক স্বরবর্ণ লিখে দেওয়া হয়েছে। স্বর এবং কথা উভয় ক্ষেত্রে স্থায়িত্ব প্রকাশের জন্য '—' চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে এছাড়া সব ক্ষেত্রেই হিন্দুস্থানী স্বরলিপি পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন—শুদ্ধ স্বরগুলি লেখা হয়েছে সা রে গ ম প ধ নি এই ভাবে। কোমল স্বরগুলি লেখা হয়েছে র্ রে গ্ ধ্ নি্ পদ্ধতিতে। কড়ি মা দেখানো হয়েছে ম´ পদ্ধতিতে। আখর ক্ষেত্রে প্রথম, দ্বিতীয়, এবং তৃতীয় আখরকে বোঝানো হয়েছে "×১", "×২" এবং "×৩" চিহ্ন দিয়ে। গাইবার পদ্ধতিতে মূল গানের

যে মাত্রায় প্রথম আখর সংযোজিত হয় সেখানে "×১", যেখানে দ্বিতীয় আখর যুক্ত হয় সেখানে "×২" এবং তৃতীয় আখরের ক্ষেত্রে "×৩" ব্যবহার করা হয়েছে। গান গাইবার সময় মূল গানের কিছু অংশ রেখে প্রথম আখর সংযোজন করে পুনঃপুনঃ গাইতে হয়। দ্বিতীয় বারে মূল গানের অংশে স্থানে দ্বিতীয় আখরটি প্রয়োগ করা হয় অর্থাৎ তখন তালের আবর্তটিতে শুধু দুটি আখরই থাকে। এই অবস্থায় বার বার আবৃত্তি করার পরে মাতন দিয়ে শেষ করা হয়। যদি তৃতীয় আখর থাকে তবে তা প্রথম আখরের স্থানটি নিয়ে নেয় এবং সেখানে হয় মাতন। এটি হল অগ্রসর হওয়ার পদ্ধতি। আবার মাতনের পর অনুরূপ ভাবেই পশ্চাতে যেতে হয় অর্থাৎ তৃতীয় আখরের পরিবর্তে এসে যায় প্রথম আখর দ্বিতীয় আখরের পরিবর্তে এসে যায় মূল গানের অংশবিশেষ। সেখান থেকেই আবার মূল গানটি গাওয়া হয়। পরবর্তী পর্যায় নির্দিষ্ট স্থান থেকে শুরু করা হয় গানের উত্তরার্ধ।

কয়েকটি জাত গানের প্রথম চরণে প্রথম পঙ্‌ক্তির স্বরলিপি করা হয় কারণ এটি হল গানের ধ্রুবপদ এবং মূল নিদর্শন। পরবর্তী অংশে গায়কগণ অনেকটা ইচ্ছানুরূপ পরিবর্তন করে নিয়েছেন তাই সে বিষয়ে শিক্ষকবর্গের অভিরুচিকেই সম্মান জানান হল। গৌরচন্দ্রিকা ক্ষেত্রে সম তাল যোতসম, এবং বড় দশকোশী এই তিনটি সুরই জাত গানে প্রচলিত। তাই সম তালের "মরমে লেগেছে গোরা", যোতসম তালের "মান বিরহ জ্বরে" মধ্যম দশকোশী তালের "অনুক্ষণ হেরি সখা" গানগুলি ধরা হয়েছে। বড় দশকোশী তালের "দামিনী দাম" গানটিকে ধরা হয়েছে। চব্বিশ চাপড়ের ধরা তালের গানের সুর হিসাবে ধরা হয়েছে "আধল প্রেম" গান। বিভাস তেওটের ক্ষেত্রে ধরা হয়েছে "নিগদ নিজঙ্গদ মূলমু" ময়ূর তেওট ক্ষেত্রে ধরা হয়েছে "শুনইতে কানু" গান। দোঠুকী তালের প্রচলিত সুরের ক্ষেত্রে ধরা হয়েছে দানলীলার "সুন্দরী শুনহ আজুক কথা" গান। এই গানগুলির সুরে বহু গান গাওয়া হয় বলেই এগুলিকে মনোহরশাহী জাত গান হিসাবে গণ্য করে নিম্নরূপ স্বরলিপি করা হল।

১। সোমতাল

২৮ মাত্রা—৮।৮।৪।৮

মরমে লেগেছে গোরা না যায় পাসরা

(১। আমি আর যে পাসরিতে নারি,

২। আহা মরি আহারে।)

•	০	•	+	•
মর	মেএ	লেএ	গেছে	—
রেগ রেসা	রেপ	ধনিধপ	মপ	—

০	•	০	•	০
এএএএ	ও	হেএ	এএ	এএএএএএ
ম-পধসপ	প	ধনিসারে	রে রে	সাগরেগরেসা

•	২	• ×১	০	•
এ এ এ এ এ এ	—	ওলেগেছে	গো	রা
রেগরেগরেসা - -	—	সা প ধ সা	নি নি (সা)	ধ নি

০	•	০	•	৩
রে	এ	এএ	এএএএ	এএএএএএএ
ধপ	প	পম	পধনিসা	নিধপম পধনিধ

•	০	•	৪	•
নাযায়পা	স	অঅ	রা	—
সাসাসারে	মগরে -	রেগমপমগরে -	মরে	—

০	•	০
আ	আ আ আ আ	আ
রে	রেরেগপ রেরেগগ	রেসা

	•	০	•	০	•
×১	আমি	আর	যে	পাস	—
	প	ধ	ধনিসানিধ-	ধধনিধ	ধ

০ · ৩
অ অ অ অ   অ অ অ   —   আরযেপাস
ধনিসারে   সানিধ   —   ধধনিধনিনিধপ

০ · ৪ · ০
রি   তে   না   রি   হে
প   সা   নিনিসাসানিধ   ধ   ধ

·×২ ০
অ   —   (মরমে লেগেছে)
প   মগরে

×২ · ০ · ০ ·
আ হা ম রি   —   মর-   আহা   মরি
ধধধনিধনিধপ   প   ধসা   পধ   পধধানি

+ · ০ · ০ ·
আ   —   আ   আ আ   হা   আ আ আ
সা   —   পসা   সাসারে-   সানি   নিনিসাসানিধ

০ · ২
রে   এএএএ   এএএ-   (আমি আরযে পাসরিতে
ধ   ধনিসারে   সানিধ-   নারি হে আহামরি মর)

এই গানটি শিখেছিলাম প্রয়াত কীর্তনীয়া কানাইলাল গুহের নিকট।

নয়নে অঞ্জন হয়ে লাগিয়াছে পারা।
(লেগে আছে গো নয়নে অঞ্জনের
মতো, ছাড়াইলে না ছাড়া যায়।)
জলের ভিতর যদি ডুবে দেখি গোরা।
ত্রিভুবন ময় গোরাচাঁদ হ'ল পারা॥
(কি বেয়াধি হ'ল গো, সর্বময়
দেখি গোরা, জলে স্থলে অন্তরীক্ষে।)
তেহি বলি গোরা রূপ অমিয় পাথার।

(প্রেমসিন্ধু গোরা রায়, অপূর্ব তরঙ্গ
তায়, করুণা বাতাস ভরা।)
ডুবল তরণী মন না জানি সাঁতার ॥
(ডুবে রইল গো, মন তরণী আমার,
প্রেমের সাগর মাঝে।)
বাসুদেব ঘোষে কহে নব অনুরাগে।
সোনার বরণ গোরাচাঁদ হিয়ার মাঝে জাগে।
(আমার হিয়ায় জাগিছে, কিবা
দিবা কিবা নিশি, সোনার গৌরাঙ্গ রূপ)

'নয়নে অঞ্জন' স্তবকটি মধ্যম দশকোশী তালে গাওয়া হয়। পরের সম্পূর্ণ গানটি যথারীতি গাওয়া হ'লে শেষ চরণ—'সোনার বরণ গোরাচাঁদ'—কাটা সোমতালে গেয়ে মাতন ও মূর্ছন দিতে হয়।

২। যোতসমতাল

২৮ মাত্রা ৮।৮।৪।৮ জোড়ায় শব্দ—

ও আরে মান বিরহ জ্বরে
পহুঁ ভেল ভোর।
(১। কি ভাব পড়িল মনে,
ভাব নিধি শ্রীগৌরাঙ্গের,
২। আহা ওকি আহা মরিরে,
ওকি আহা মরিরে)

·	০	·	০	·	০	·
ও	আ	—	রে	এ	এ	এ
প	গ	গম-প	পধনি	—	নিসানিধ	ধসানিসা

৩	·	০	·	৪	
—	ও	মা ·	আ আ আ	ন	—
নিধপ	—	ধসা	সারেসারেসানিধপ	পধ	—

০	·	০	·	০
অ	অঅঅঅ	ও	মা ×১	ন
নি	মধ পধ পম গ	গমপধনিসানি	ধপ	মপমগ

·	+	·	০	·
বিইইইই	রহ	—	অ	—
গমপগমগারে	রেগম-রেপা	—	গগ	—

	·	০	·	২	·
০	—	অ	বিরহ	জ্ব	—
গগ	—	মপ	রেরেগ	গরে	—

০	·	০	·	০	·
অ	—	রে	এ	এ	এ
গরে	রেগরেগ	রেসা	—	সা	সাগসাগসারেগ

৩ . ০ . ৪ . ০ .
— বিরহ জবরে প অ ইং — উ —
সারে সাগরেসা সা-ধসা — সা সা সা —

০ . ০ . + .
ভে — এ — ন —
সারেগমপ — গপ সপগপ মগ —

০ . ০ . ০ . ২
অ — ভো ওর রে এ এ
গ — রেগমপ মপমপ মগ রেগ রেসা

. ০ . + .
×১ কিভা ব প ড়িল —
সানি —ধপ ধনিসারে সা নিসা

০ . ×২ ০ . ০ .
অ — অ — অ অঅঅঅ
ধসা ধসা — সা সাগরেগ রেসা

২ . ০ .
মনে — ভা আব
রেসা — সা নিসা নিসা

০ . ০ .
নিধি — ই ই
সারেগমগ গ গমপ মগরে

৩	.	০	.	
—ভাব	নি ধি	শ্রী	গৌ	
রগ	মগরে	রে	গরে	

৪	.	০	.	০
রা	আং	গে	এ	এর
সা	সা	সা	সারে	সানি

.	০	.	০	.	২
×২ আ	হা	আ	—	—	—
গ	ম রে	রেগমপ	প	ম গ	রে

.	০	.	০	.
ওকি আহা	ম	রি	রে	এ
রে সারে সানি	নি	সা	রে	সারেগ

০	.	৩	.	০	.
এ	এ	—ওকি	আহা	ম	রি
মগরেগ	রে	গস	গমগর	র	গ র

৪	.	০	.	০
রে	এ	এ	এ	এ
রে	গ	সা	রে	সা

(কি ভাব পড়িল)

শ্রদ্ধেয় গুরু রাধারমণ কর্মকার মহাশয়ের নিকট শিক্ষা।

(মধ্যম দশকোশী)

ও রাংগা নয়নে বহে তপত ছিলোর ॥
(ভাসলরে কনয়া গিরি, শিখর হতে
শত ধারে)
(ছোট একতালি বা ঝাঁতি)
আরে মোর আরে মোর গোঁরাংগ চাঁদ ।
(আমার গোরা রে, গরব
করে বলতে পারি, (এমন) করুণাময়
কেবা আছে ।)
অখিল জীবের মন লোচন ফাঁদ ॥
(একা আমার নয় আমার নয়,
গোঁর আমার বিশ্বময়, তারে যে
ডাকে সে তাঁরই হয় ।)
প্রেম জলে ডুবু ডুবু লোচন তারা ।
(নয়নে জল রে, আমার আমার)
গোরাচাঁদের, ভাবে বিভাবিত অংগ ।)
(তাঁরাও ডুবল রে, (যারা) গোঁর
বলতে আত্মহারা, জানেনা তো
গোঁর ছাড়া ।)
প্রলাপ সন্তাপ আদি ভাব আদি ভোরা ॥
(সাত্বিকে ব্যপল, অশ্রু স্বেদ কম্প
আর, পুলক বৈবর্ণ আদি ।)
কাঁদিয়া কহয়ে পুন ধিক মোর বুদ্ধি ।
অভিমানে হারাইলাম কানু গুণ নিধি ॥
ভাল করি নাই, অভিমান করে কাজ,
কৃষ্ণধনে হারাইলাম ।)
কি কহব মন দুখ কহনে না যায় ।
সোঁয়ারি সে সব বাসুর হিয়া ফাটি যায় ॥

এরপর কাটা সোমতালে—'সোঁয়ারি সে সব যাসুর'—এই চরণটি গাইতে হয় ।

৩। মধ্যম দশকোশী

তাল—১৪ মাত্রা ৪।৪।২।৪

অনন্ক্ষণ হেরি সখা তোহে আনচিত

(১। আজ কেন তুই এমন হলি ভাই,
২। কি হয়েছে বল না কেন রে
আজ কেন তুই এমন হলি ভাই)

গানটি গাইবার সময় মধ্যমকে 'সা' ধরে গাইতে হয় তবে গানটির রূপ ফোটে।

০	০	০	+	০
সখারে	অ নন্	ক্ষণ	হে	—
সারেম-মপমগ	মপমগ	রে সা	গ	গ

০ ০	২	০×১	০	০
এ এ এ	রি	—	এ	এএএএ
রে রেগ রেগ	র্রে সা	সা	নিসা	নিসা নি ধ

৩	০	৪	০	০	০
— সখা	তো ও	হে	—	এ	—
ধসা	রে গ রেগ	রসা	—	সা	—

+	০	০	০	২	০
আ	—	আ	—	ন	—
মপ	প	পধ	পধ	পম	মপ মপ

০	০	৩	০	৪
অঅঅ	তোহেআন	চি	হইইই	ইত
মগ	গগ পপ	ধ প	পধনি	সাঁনিধ

০	০	০	+	০	০
—	অ	—	অ	অ	অ
—	ধ	—	ধনিধপ	পধপম	মপমগ

০	২	০	০	০
অঅ	অ	অ	অ	অঅঅঅ
গধধম	পধনির্সা	র্সা	নির্সানিধ	ধনিধপ

৩	০	৪
অ	অ	অ
পধপম	মপমগ	রেসা

	০	০	০	৩
×১	সখা	আজকে	নেতু	উই
	নিসা	সাগা	রেগ	রেগরেসানিধ

০	৪	০	
এমন	হলি	ভা—ই ×২	(অনুক্ষণ হোরি)
সাম	গপ	মমপমগ	

	০	০	+	০
×২	—কিছ	য়েছে	ব--ল্	না
	গগ	গপ	পধনি	ধপ

০	০	২	০	০
কেন	রে	এএএএ	আজকে	নেতু
পধ	নি	নিসানিধপ	পধনিধ	নিধপধ

০	৩	০	৪	০
উ	উই	এমন	হলি	ভা—ই
ধনিসা	নিসানিধ	প-মপমগ	গপ	ম

শ্রদ্ধেয় গুরু রাধারমণ কর্মকার মহাশয়ের নিকট শিক্ষা।

একতালি

দূরে গেও মুরলীক আলাপন গীত।
(এ কি দেখি ভাই, তোর সোনার
বেণু ধূলায় পড়ে,)
(করে কর করে কর, ভাই বেণুকর
বেণু, তোর কর ভাল দেখায় না ভাই।)

ছোট একতালি

মরম না কহ কাহে পরাণ সাঙ্গাতি।
(খুলে বল খুলে বল, সখারে
তোর মরম কথা, বেদনা বাঁটিয়া লব।)
তুয়া মুখ হেরইতে জ্বলত মঝু ছাতি ॥
(বুক ফেটে যাইছে, তোর মুখ দেখে
বুক, ওরে ওরে ভাইরে কানাই।)
মরকত জিনিয়া যো কলেবর কাঁতি।
সো অব ঝামরু কুবলয় ভাঁতি ॥
(কেনে মলিন হ'ল ভাই, নীল
নলিনী কেনে, কোন সে বিরহ তাপে।)
হেরইতে নিরমল লোচন জোর।
কো জানে কৈছে করত হিয়া মোর ॥
শুনইতে ঐছন সহচর বাণী।
ছোড়ি নিশ্বাস উলটায়ল পানি ॥
দূর অবগাহ মরম অভিলাষ।
সমুঝিয়া কহে 'ঘনশ্যামর দাস ॥

৪। বড় দশকোশী তাল

২৮ মাত্রা। ৮।৮।৪।৮
দামিনী দাম দমন রুচি দরশনে
(১। দামিনী দাম, রূপের কিসে বা
তুলনা দিব
২। আহা ওকি আহা মরি রে
ওকি আহা মরিরে)

	০	.	০	.
* দামিনীইই	দা	আ	আ	আ
পপপমগ	নি	সা	রে	রেগারেগ

২	.	০	.	০	.
ম—	—	অ	—	অ	অ
রে সা	—	ধসা	—	নি	সা

০	.		৩	.	০
অ	অ	—		ওদ	ম
রে	সাগপগরেসা		—	প	পধনি—

.	৪	.	০	.	০
অ	ন	—	অ	—	—ওদ
ধ	নিপ	—	প	মপধপমগ	পধনি

.	০	.	+	.
মন	রু	চি	দর	—
ধপ	মপমগ	গমপগমগর	সারেগমগরেগ	—

---

* গানের শুরুতে চার মাত্রা এভাবে গাওয়া হয়। গান যখন ঘুরতে থাকে তখন এ অংশ থাকে না।

০ . ০ . ০
অ — অ — অ
রেগমগ — রেগমগ — রেগমগ

। ২ . ০ ।
— শ — অ —
— গরে — গরে রেগ

০ . ০ . ৩
নে এ এ এ —
রেসা গ রে সা —
. ০ . ৪ .
ওই দা মি নী —
প পধনি-ধপ পধনিসানিসা ধপ —

০ . ০ . ×১ ০
ই — ই — ই
মপ — মপ — মপ

. + . ০ . ০
— দা — আ — আ
— নি — নি — সা

. ০ . ২
আ আ আ ম—
রে— রেগ রেগরেগ রেসা

. ০ . + .
×১ দা মি নী দাম —
সানি ধপ ধনিসারে নিসা .

×২

০ · ০ · ০

অ — অ — অ

নিসা — নিসা — নিসা

· ২ · ০ ·

— — রূপের কি সে

— — সাসানিধ ধ নি

০ · ০ · · ৩

বাতু উ উ উউউউ —

সারে — রে রেগসাগসাগরেসা —

· ০ · ৪ ·

কিসেবাতু ল না দি ই

নিনিনিরে রেগমগ রে রে রেগরেসা

০ · ০

র অ —

সা সা —

· ০ · ০ ·

×২ আ হা — আ আআআ

গা রে রেগমপ মগরে

২ · ০ · ০ ·

—ওকি আহা ম রি রে এ

রে সারেসানি নি সা রে রেগম

০	·	৩	·	০	·
এ	এ	—	ওকিআহা	ম	রি
রেগ	গম	গরে	রেগমগ	রে	রে

৪	·	০	·	০
রে	এ	এ	এ	এ (দামিনীদাম)
রে	গ	সা	রে	সা

প্রয়াত শ্রদ্ধেয় কানাইলাল গুহের নিকট শিক্ষা।

ছোট দশকোশী

দামিনী দাম দমন রুচি দরশনে
দূরে গেও দরপকি দাপ।
শোন কুসুম তাহে কোন গণিয়ারে
প্রাতর অরুণ সন্তাপ॥
(কিসে বা গণিরে, প্রাতর অরুণ আমি,
গোরা রূপের আগে।)
গোরা রূপের যাই বলিহারি।
হেরি সুধাকর মুরছি চরণতলে
পড়ু দশনখ রূপ ধরি।
(গগনের চাঁদ ভূমে নেমেছে, দশনখে
দশখণ্ড হয়ে, আমার আমার গোরাচাঁদের।)

ঝাঁপি

সুবরণ বরণ হেরি নিজ কুবরণ
মানি আপন মনস্তাপে।
নিজ তনু জারি ভসম সম করইতে
পৈঠল অনল সন্তাপে॥
(আগুনে জারল, গৌরবরণ দেখে
সোনা, নিজের গরব পোড়াইতে।)
যো সম বিধিক অধিক নাহি অনুভবি
তুলনা দিবার নাহি ওর—,
জগদানন্দ কহু পহুঁক তুলনা পহু
নিরুপম গোর কিশোর॥

৫। ধরাতাল (২৪ চাপড়)

১৬ মাত্রা—৪।৪।৪।৪

আধল প্রেম পহিলে নাহি হেরনু…

(১। ওকি আরে সখীরে, আরে ও আধল প্রেম ;
২। প্রেমের এমন কুটিল গতি এমন বাঁকা গতি, তা তো আগে জানি না গো ;
৩। একবার ফিরে চাইতে দিলে না গো ,
৪। প্রেমে আমায় আঁধুয়া কৈলে।)

০	·	১	·	০	·	২	·
ও	ও	আ	—	আ	—	ধ	—
সা	সারে	গারে	—	রেগ-ম	রেগ	প	—

০	·	৩	·	০	·	+
অ	—	ল	—	অ	—	প্রে
		নি		প	ম	ধ
পধ	ধ	ধ	—	ধ	প	প
·	০	·	১	·	০	·
—	এ	—	এ	—	এ	—
	|		|		|	
—	মপ	—	মপ	—	মপ	—

২	·	০	·	৩	·	০
এ	—	এএ	এ	এএ	এ	এ
পসা	—	ধনি	সা	ধনি	সা	ধ
·	+	·	০	·	১	·
এ	মপ	—	অ	—	অ	—
	ধ		|		|	
নি	প	—	মপধ	মপ	মপ	—

০	·	২	·	০	·
অ	—	অ	—	অ অ	অ অ
|					
ম	—	পগ	—	গম	পধ

৩ . ০ . + .
অ অ অ অ অ অ — হিলে —
ধনিধনি ধপ ধনিধনি ধপ ধপ —

০ . ১ . ০. . ২ .
এ — এ — এ — এ। —
। প ।
গপ — গপ — ম — গ মগরে—

০ . ৩ . ০ .
আঁধল প্রেম — পহিলে না হি
—নিসাসা গগ — সাসারে— গ গম

+ . ০ . ১ .
হে — এ — এ —
গ — রেগমগ — রেগমগ —

০ . ২ . ০ .
এ — এ এ এএ এ
।
রে — রেপ — গম প

৩ . ০ . + .
এএ এ এ এ রণ —
গম প গ ম গরে —

০ . ১ . ০ .
উ — উ — উ —
রে — রে — সা —
২ . ০ . ৩ ০
উ — উ উউ উউ উউ
সা — গর —সা সাগরেগ রেসা

০ . + .
উউ উউ আরে —
সাগরেগ রসা রেসা —

মুখ ফেরাবার সময় গাইতে হয়—

০	.	১	.	০	.
ওওওও	ওওওও	আ রে	—	—	—
প-ধ-নিসারে-	রেগরেগ	সা	—	সা	সারে

২	.	০	.	৩	.
ধ	—	অ	—	ল	—
সা নি	—	নি	নিসা	ধ	—

০	.	+	.	
অ	—	প্রে	—	×১
ধধ	ধনি	প	—	

সম্পূর্ণ লাইনটি আবার পড়তে হবে :

	০	.	১	.	০	.
×১	ওকি	আরে	স	—	খী	—
	গপ	পধ	ধ	—	ধনি	সানি

২	.	০	.	৩	.
রে	—	এ	—	এ	এএ
ধ	—	ধ	—	ধ	পধ

০	.	+	.	০	.
এএ	এএ	এ	আরে	ও	ওওও
পধ	ধনি	ধ প	পপ	প	পধনি—

১	.	০	.	২	০
আ	—	আ	—	ধ	—
নি ধ	—	ধ	ধনি	ধ প	—

০	.	৩	.	০	.
অ	—	ল	—	অ	—
		প			
পধ	পধ	ম	—	গম	গমপ—

+	.			
প্রে	—	×২		১৬
ধ				
প	—			

	০	.	১	.	০	.
×২	প্রেমের	এমন	ক্	উ	টি	ইল্
	মগ	রেসারে—	গ	গ	গপ	পধপধ - - পম

২	. ×৩	০	.	৩	.
গতি	এমন	বাঁকাগতি	—	ই	—
মপ	সা	সারেগপ	—	প	গপ

০	.	+	.	০	.
ইই	ইই	ই	—	তাতো	আগে
		ম			
মপ	মপ	গ	—	গ	গমগম

১	.	০	.	২	
জা	—	নি	ইই	না	—
ম	—	পধ	নিধ	প	—

০	.	৩	.	০	.
আ	—	গো	—	ওও	ওও
পধ	পম	ম	মপ	মপ	মগ

+	.	
ও	—	(প্রেমের এমন……)
গ		
সা	—	

	.	০	.	৩	.
×৩	একবার	ফি	রে	চা	আই
	মধনিসা	সা	নি	ধ	ধা-নিধ

×৪

০	.	+	.	০	.
তে	এ	দিলে	—	এ	—
পগ	প	নিধ	—	পধ	—

১	.	০	.	২	.
এ	—	দিলে	না	গো	—
পপ	—	গপ	প	মপ	প

০	.	৩	.	০	.
ওও	—	ওও	—	ওও	ওও
মপ	প	মপ	মগ	গম	গপ

+	.	
ও	—	(প্রেমের এমন কুটিল গতি)
ম গ	গ	

	০	.	১	.
×৪	প্রেমে	আ	ধুয়া	কৈলে
	ধধ	ধ	নিসা	নিসা

০	.	২	
এএ	এএ	এএ	(একবার ফিরে চাইতে দিলে)
রেগরে—	রেগরেসা	নিধপ	

(এই গানটি প্রয়াত গুরু রাধারমণ কর্মকার মহাশয়ের নিকট থেকে শেখা)।

মধ্যম দশকোশী

সো বহু বল্লভ কান।
(১। সখীরে আমি এতদিন জানতাম
সে শুধু আমার একার বল্লভ,
এখন দেখি তা নয় তা নয়, তাকে
যে ডাকে যে ভজে গোবিন্দ আমার
তাঁরই হয় মানে জানাইলে।
২। সখীরে সে বহুজনার আদরের

ধন, সবার কাছে আদরে আদরে
ফিরে, আমার মতো অভাগিনী
রাধার কাছে এত অনাদরে, থাকবে কেন।
৩। আদরে আদরে ফিরে গো
এত অনাদরে থাকবে কেন।)

ছোট দশকোশী

আদর সাধে বাদ কৈনু তারই সনে
অহর্নিশি জ্বলত পরাণ ॥
(পরাণ আমার জ্বলে গেল গো,
কিবা দিবা কিবা নিশি, গেল
অন্তর জ্বলে।)
তোরে কহি মরম কি দাহ।
(আমার নিকটে আয় গো, আয় আয়,
ওগো আমার মরম সখী।)

লোফা

কানুক দোখে যো ধনি রোখই
সেই তাপিনী জগমাহ ॥
(সেই তাপিনী, জগমাঝে, কৃষ্ণ
দোষে যে জন রোষে, সে সদাই
নয়ন জলে ভাসে।)

মায়ুর তেওট

যো হাম মান বহুত করি মানলু
কানুক মিনতি উপেখি।
(মানকে বড় মেনেছিলাম গো,
আমার কি কুমতি হল।)

লোফা

সো অব মনসিজ সরে ভেল জর জর
তা কর দরশ না পেখি ॥
ধৈরজ লাজ মান সনে ভাগল
জীবন রহত সন্দেহা ।
গোবিন্দদাস কহয়ে সতী ভামিনী
কানুক ঐছন লেহা ।
(কৃষ্ণ প্রেমের এইত রীতি, কখন
হাসায় কখন কাঁদায়, গোবিন্দ
গোবিন্দ বলে ।)

৬। তেওট (মায়ুর)

১৪ মাত্রা ২।২।২।২।২।২।২, + ০০২০৩০

শুনইতে কানু মুরলী রব মাধুরী—
(রাধে তখন মানা শুনিসনি রাই, কত নিষেধ করেছিলাম,
বাঁশী শুনিসনে শুনিসনে বলে)

০ . ৩ . ০ . + .
শু ন ই — তে এ কা —
ধ
সারে নি গ — ম প প —
×১

০ . ০ . ২ . ০
নুউ উউ উউ উউউউ — মু র
মপ ধনি নি ধনিধনিধপ — ম গগরে

. ৩ . ০ . + . ০
— লী — র ব মা — আ
ম ধ
গ ম — ম প প — প

. ০ . ২ . ০ .
— আ — আ আ আ আ
— সপ ধনিধপ — প ধ ম প

৩ . ০ . + .
ধুরী — মা ধুরী রেএ এএ
মগরেসা — সা রে সারে গপ

০ . ০ . ২ .
এএ এএ এএ এএএএএএ — ও
সারে গপ গপ গপ মপগপমগ — রেসা

×১ . ০ . ৩ . ০
রাধে ত খন মা — না
পধনিসা নি সা নি ধনি ধপ

. +	॰	০	.	০	॰
আ শ্	—	নি	—	ই	ইস্
					ধ
পা গরে	গ	ম	—	পধনি	প

×২

২	.	০	.	৩	.	০
নে	এ	এ	এ	রা	—	আ
প	ধ	ম	প	প	—	প

.	+	.	০	.	০	.
—	আ	—	আ	—	আআ	আআ
—	ধপা	প	ধনি	সারে	সানি	ধপ

(শ্নইতে কান্…)

২	.
আ আ	আ আই
ম গ	রে সা

	.	০	.	+	.
×২	কত	নি	ষেধ	ক	রে
	নি	ধ	পধ	ম	প

×৩

০	.	০	.	২	॰
ছি	লাম	গো	—	—	ও
প	ধ	নি	—	সা	পা

(তখন মানা শ্নিস্নি রাই)

	.	২	.	০	॰	৩
×৩	বাঁশী	শ্নি	ইস্	নে	শ্	নিস্
	পধ	সা	—	—	রে	সারে

.	০	.
নে	বলে	নিষেধ
সা	নি	ধপ

(করেছিলাম গো)

×৩ আখরের ঠিক বিপরীত দিকে পিছিয়ে গিয়ে ×২ আখর এবং ×১ আখর হয়ে আবার মূলগানে ফিরতে হবে। এরপর I চিহ্নের স্থান থেকে উত্তরার্ধ ধরতে হবে।

শ্রবণে নিবারল্ তোয়

(এখন আমরা কিবা করিগো, তখন কথা শুনলিনে, যা হবার তা হয়ে গেছে)

0	.	৩	.	0 ×১	.
শ্র	ব	নে	—	নি	—
ধ	র্সা	র্সা	—	র্সা	নি

+	.	0	.	0	.
বা	—	আ	আ	আ	আ
রে	—	রে	—	সারে	সানি

২	.	0	.	৩	0
আ	—	আ	—	—	নিবা ×১
নি	র্সার্রে	র্সার্রে	র্সার্রে সানি	—	র্সা নি

0	.	+	.	0	.	0
র	ল্	তো	—	ও	—	ও
ধ	পম	মপ	প	মপ	প	মপ

.	২	.
—	য়	—
মপ	মগ	—

×১

.	0	.	+	.
এখন	আম	রা	কি	বা
নি	নি	পধপ	ম	প

0	.	0	.	২	
ক	রি	গো	—	ও	×২
প	ধ	নি	—	র্সার্রে	

(শ্রবনে)

×২	.	o	.	৩	.
	তখন	—ক	থা	—	শুনলি
	সাসা	নি	রে	—	নিসানি—

o	.	
নে	মোরা	(কিবা করি গো) ×৩
ধনিধ-	পধ	

	.	o	.	৩	.
×৩	যাহ	বায়	তা	হ	য়ে
	গম	ম	ম	ম	ধ

o	.	
গেছে	মোরা	(কিবা করি গো)
মপ	মগ	

এইভাবে নানা ভাষায় পরপর আখর দেওয়া যেতে পারে। একবার নিচের সুরে আবার চড়া সুরে।

ছোট দশকোশী

হেরইতে রূপ নয়নযুগ ঝাপলু
তব মোহে রোখলি ভোর ॥
(দেখিস্ নে রাই, বলেছিলাম রূপ,
তখন কথা শুনলি নে।)

লোফা

সুন্দরী তৈখনে কহলাম তোয়।
(তখন তোরে বলেছিলাম, রূপে
নয়ন দিস না সখি, শুনিস্ নে ঐ
বাঁশীর ধ্বনি।)
ভরম হি তা সঞে লেহ বাঢ়ায়লি
জনম্ গোঙায়বি রোয় ॥

(সারা জনম কাঁদতে হবে, ভুল
করে তুই প্রেম করেছিস্, ঐ নিঠুর
কালিয়ার সনে।)
বিনি গুণ পরখি পরক রূপ লালসে
কাহে সোঁপলি নিজ দেহা।
দিনে দিনে খোয়বি ইহ রূপ লাবনী
জীবনে ভেল সন্দেহা॥
(প্রাণে বাঁচা হবে গো দায়,
গুমরি গুমরি প্রাণ যায়, বঁধুর
কথা মনে করে।)
যো তুঁহু হৃদয়ে প্রেম তরু রোপলি
শ্যাম জলদ রস আসে।
সো অব নয়ন নীর ঘন সিঞ্চহ
কহতহি গোবিন্দ দাসে॥
(তোদের প্রেমের নাই তুলনা,
কাঁদবি তবু প্রেম করিবি, মোদের
কথা শুনবি না সই।)

৭। বিভাস তেওট

তেওট তাল—১৪ মাত্রা ২।২।২।২।২।২।২। +০০২০৩০

পূর্বার্ধ

রাধে নিগদ নিজংগদ মং্লম্ ।

(আমাদের বলগো কি তোর ব্যাধি হলো রাই,
কেন বা তুই এমন হলি, বল কিসের লাগি,
গোপন করিস্‌না)

উত্তরার্দ্ধ—

উদয়তি তন্‌্মন্‌্ কিমিতি তাপকুল
মন্‌্কৃত বিকট কুক্‌্লম্ ॥

(তোমার সারা অঙ্গে কিসের সন্তাপ রাই,
এমন সোনার অঙ্গ জারল,
তুষানলের মত অংগ জারল···)

০ . ৩ . ০ . + .
নি গ দ — নি — জ —
সা ধ সা রে সারে সারে গধ —নি
. ×২ ×১

০ . ০ . ২ . ০ .
অ — অ — অ — অ অঅঅঅ
প — প — — ধ মপ ধপমগ

৩ . ০ . + . ০ .
অ নিজ ংগ দ ম্ — উ —
গ গম মগ রেগসারে গ — সা রে

০ ০ ২ .
উ — ল অম্
গম রেগ রেসা —

০ . ৩ . ০ .
×১ নি জ অং গ দ —
প গ গ প ধনি ধসা

+	.	০	.	০	.	২	.
ম্‌	—	উ	—	উ	—	ল	অম্‌
.		.			. .	.	
সা	—	সানি	ধ	ধনি	সারে	সা	—

০	.	৩	.	০	.
নি	জ	অং	গ	দ	অঅঅঅ
.	.	.	. . . .		. . . .
সা	রে	রে	সারেগম	গ	মগরেসা

+	.	০	.	০	.	২	.
ম্‌	—	উ		উ	—	লং	অম্‌
.	.	.		.		.	
রে	গা	সা	—	সা	—	সানি	ধনি

০	.	৩	.	০	.
নি	জ	অং	গ	দ	অঅঅঅ
			.		.
প	ধ	ধ	পধনিসা	নি	সানিধপ

+	.	০	.	০	.	২
ম্‌	—	ল	অম্‌	—	রা	ধে
ধ	ধনি	প	প	—	গম	রে

.	০	.	৩	.	০	০
—	এ	—	—	নিগ	দ	নি
গ	ম	প	—	গর	গস	রে

×২

+	.	০	.	০	.	২	.
জ	—	অ	—	অ	—	অ	—
গধ	ধনি	প	—	প	—	প	ধ

	০	.	২	.	০
×২	আমা	দে	—	র	ধন
	গগ	গ	গম	গরে	রেরে

.	৩	.	০	.	+	.
গো	—	কি	তো	ওর	ব্যা	—
গ	—	মপ	গম	গর	রে	—

০	.	০	.	২	.	০
ধি	—	ই	ইইইই	হ	—	লো
গ	—	মপ	ধপমগ	গ	—	রেগ

.	৩	.	×৩	০	.
ওওওও	রাই	নিগ		দ	নি
সাগরেগ	সাসা	সাধ		সা	রে

+	.	০	.
জ	—	অ	—
গধ	ধনি	প	—

	.		০	.	+	.
×৩	—	কেন	বা	তুই	এ	মন
	প-পপ		মপ	গমগর	গপ	পধপ

০	.	
হলি	—	×৪
মপ	—	(আমাদের বলগো কি তোর ব্যাধি হলো রাই)

	০	.	২	.	০	.
	—	বল	কিসে	—	—	এর
×৪	প	প	পধ	—	—	ধা

৩	.	০	×৫	.	+	.	০	.
লা	গি	কেন		বাতুই	এ	মন	হলি	—
পধ	প	মধ		পমগ	গপ	পধপ	মপ	—

	০	.	+	.	০	.
×৫	গো	পন	ক	রিস	না	—
	মপ	গম	ম	পপ	প	—

০
— (বল কিসের লাগি)

সবগুলি কাটান গেয়ে মূল গানে ফিরে গিয়ে এক আবর্ত গানের পর উত্তরার্ধ গান শুরু করতে হয়।

০	.	৩	.	০	.
উ	দ	য়	—	তি	—
প	গ	প	—	ধনি	ধসা

+	.	০	.	০	.
ও	—	নূ	—	উ	—
র্সা	—	সা	—	সারে	—

২	.	০	.	৩	.
মনূ	—	কি	মি	তি	—
নিসা	—	সা	রে	স	ম

০	.	+	.	০	.
তা	আআআআ	প	—	অ	—
গ	মগরেসা	রে	গ	সা	—

০	.	২	.	০
কূ	উউ	ল	অমৃ	অ
নি	নিসানিধ	ধনি	সনিধপ	প

.	৩	.	০	.	+	.
নূ	কু	—	ও	অঅ	রি	—
ধ	প	সা	নি	সানিধপ	ধ	—

০	·	০×১ .	·	২	·
ক	—	অ	—	অ	—
নিপ	—	প	—	প	ধ

০	·	৩	·	০	·
অ	অঅ	ট	—	ক্	উউউউ
মপ	ধপমগ	গ	ম	রেগ	মগরেসা

+	·	০	·	০	·
ক্	—	উ	—	উ	উ
সা	গ	সা	রে	গম	রেগ

২	·
ল	অম্
রেসা	সা

	০	·	২	·	০	·
×১	তোমা	আআ	আর	—	সা	রা
	পপ	ধপমপ	রেরে	—	রে	গরে

৩	·	০	·	+	·
—	অং	গে	—	কি	—
গ	মপমগ	গম	গরে	রে	—

০	·	০	·	২	·
সে	—	এএ	এএর	স	অন্
গ	—	গমপ—	ধপমগ	গ	মগ

০	·	৩	· ×২	০	·
তা	—প	রাই	অন্	ক্	তঅ
রেগ	মপ	প	পধ	পসা	নিসানিধ

+	·	০	·
বি	—	ক	—
পধ	—	নিপ	—

×২

•	০	•	+	•
এমন	সোনা-র	অঙ্গঅঅ	জা	আআ
পপ	মম-ধ	পমধপমগ	গপ	—ধপ

০	•	×৩
রল	—	(তোমার সারা অঙ্গে
মপ	—	কিসের সন্তাপ রাই)

×৩

০	•	২	•	০	•
—	তুষা	নলে	—	এ	এর
প	পপ	পধ	পধ	—	ধনি

৩	•	০	•	+	•
ম	৩	অং	গ	জা	—
পধ	প	মপ	মগ	গপ	পধ

০	•
রল	—
মপ	—

এই গানটি শ্রদ্ধেয় গুরু অধ্যাপক পরেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের নিকট শিক্ষা।

প্রচুর পুরন্দর গোপ বিনিন্দক
কান্তি পটল মনুকুলম্ ।
ক্ষিপসি বিদূরে মৃদুলং মুহুরপি
সংভৃত মুরসি দুকুলম্ ॥
(কেন দূরে ফেলিছ রাই, রাঙা ওড়নী
তোমার, ইন্দ্রগোপের বরণ জিনি।)
অভিনন্দসি নহি চন্দ্ররজোভর
বাসিতমপি তাম্বুলম্ ।
(কেন মুখে দাও না, সুবাসিত তাম্বুল,
তাহে আর রুচি নাই।)
ইদমপি বিকিরসি বরচম্পক কৃত
মনুপমদাম সচুলম্ ॥
(কেন দূরে ফেলিছ রাই চম্পকের
মালাখানি, আগে সাধে পরতে কত।)

ভজদনবাঞ্ছিতমখিল পদে সখি
সপদি বিরম্বিত তুলম্ ।
(কেন অস্থির হলে রাই, খাইতে শুইতে,
আর মন লাগে না ।)
কলিত সনাতন কৌতুকমপি তব
হৃদয়ং স্ফুরতি সশূলম্ ॥
(আজ কুতুহল জাগিছে, হেরবে বলে
মনে, শ্রীরাধা গোবিন্দ মিলন ।)

৮। বড় দোঠুকী

তাল=১৪ মাত্রা ৩।২।২।৩।২।২

সুন্দরী শুনহ আজুক কথা

(শুভ বার্তা দিতে এলাম, সবারই আনন্দ হবে, মুখের কথা শুনলে

তাপ দূরে গেল সব ভাল হইল

এই উপজিল হেথা

(সবার জ্বালা জুড়াইবে, মনোবাঞ্ছা পুরাইবে, যজ্ঞে আহুতি দিলে)

+	০	০	২	.	০	.
শু	—	—	ন	—	হ	—
রে	ম	মপ	প	—	ধ	—

০	.	.	০	.	০	.
আ	—	—	জু	—	ক	—
ধ	নি	সা নি	ধ নি	ধ	প	—

+	.	.	২	.	০	.
ক	—	—	থা	—	—	—
পধ	মপ	ধনিধ	প।	গম পধ	নিসানি	ধপ -

০	.	.	০	.	০	.
সু	—	উন্	দ	—	রি	—
		গ		গা	রে	
পধ	প ম	রে	রে গ	রে গ	সা	সা

	+	.	.	২	.	০	.
×১	শু	ভ	—	বা	আর	তা	—
.	ম	প	সা	সা	রেসা	নি	ধপ

	০	.	.	০	.	০	.
	দি	তে	—	এ	—	লা	আম
					সা		
	পধ	পম	গরে	রেগ	রেগ	সা	—

(শুনহ আজুক)

	+	.	.	২	.	০	.
×২	স	বা	—	রি	—	আ	—
	প	ধনি	সানি	ধ	—	ধ	—

০	.	.	০	.	০	.
ন	ন্দ	—	হ	—	বে	—
ধ	নি	সানি	ধ	নি	প	ধ

(শুভ বার্তা দিতে এলাম)

	+	.	.	২	.	০	.
×৩	আ	মা	আর	মুখ	—	থে	এর
	ম	প	প	প	—	প	—

০	.	.	০	.	.	
ক	থা	—	শুন্	—	লে	—
ধনি	সারে	সা	নি	সা	ধনি	পধ

(সবারই আনন্দ হবে)

দ্বিতীয় চরন—

+	.	.	২	.	০	.
তা	—	—	প	—	দু	—
গা	—	—	রেগ	মপ	মপ	মগরে

০	.	.	০	.	০	.
রে	—	—	গে	—	ল	—
রেগ	সারে	গম	রে	গ	রে	—

+	.	.	২	.	০	.
স	—	—	ব	—	ভা	—
সারে	গম	প	প	ধপ	ম	গরে

	০	·	·	০	·	০	·
	ল	—	—	হুই	—	ল	·
	রে	গ	—	গ	ম	রেমগম	গরেস
	+	·	·	২	·	০	·
	এ	—	—	হ	—	উ	—
	সা	রে	গ	রে	—	সা	—
	০	·	·	০	·	·	
	প	—	—	জি	—	ল	—
	সা	ধ	সা	সা	সারে	সানি	ধপ
	+	·	·	২	·	০	·
	ত	—	—	অ	—	অ	—
	পধ	পধ	—	প	ধ	ধানি	—
	০	·	·	০	·	০	·
	থা	সন্দ্‌	—	দ	—	রী	—
	ধ প	—	—	—	—	সা	—
	+	·	·	২	·	০	·
×১	স	বা	র	জবা	—	লা	—
	সা	প	—	প	—	ধ	নিধ
	০	·	·	০	·	০	·
	জড়	ড়া	—	ই	—	বে	—
	পসা	সা	—	নি	সানি	ধানি	পধ,

(এই উপাজিল)

	+	·	·	২	·	০	·
×২	ম	ন	—	বা	আন্‌	ছা	—
	ধ	ধ	সা	সা	—	ধানি	সারে

	o	.	.	o	.	o	.
	পু	রা	—	ই	—	বে	—
	রেগ	সা	—	নি	সানি	ধ	নিধ

(সবার জ্বালা জুড়াইবে)

	+	.	.	২	.	o	.
×	য	—	অগু	গে	—	আ	—
	সা	রে	—	সা	রে	গ	মগ

o	.	.	o	.	.	.
হু	তি	—	দি	—	লে	—
রেগ	সা	—	নি	ধ	প	ধ

(মনোবাঞ্ছা পুরাইবে)

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ দে মহাশয় নিকটে শিক্ষা।

ছোট দুঠুকী

অরুণ উদয় ব্রাহ্মণ তনয়
আইলা গোকুল মাঝ।
গোবর্ধন তটে আমরা হরিষে
করিব যজ্ঞের কাজ॥
আজি ব্রজপুরে আনন্দ না ধরে
নাচে গায় অবিরাম।
যে গোপ যুবতী ঘৃত দিবে তথি
সিদ্ধ হবে মনস্কাম॥
একথা শুনিয়া জটিলা আসিয়া
যতন করিয়া বৈল।
বধূরে সাজাঞা গব্য ঘৃত দিয়া
ত্বরিতাহি তথি চৈল॥

—

গ্রন্থপঞ্জী

অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদ—সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, ১৩৫৭।
উজ্জ্বলনীলমণি—শ্রীরূপ গোস্বামী : ভারতী প্রকাশন, ১৩৭২।
কবি জয়দেব ও গীতগোবিন্দ—হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ১৩৬২।
কীর্তন গীতি প্রবেশিকা—খগেন্দ্রনাথ মিত্র : ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড্ পাবলিশিং, ১৩৫৩।
কীর্তন—খগেন্দ্রনাথ মিত্র :—বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ।
কীর্তন স্বরলিপি—হরিদাস কর, ১৯৫৫।
কীর্তন গীতি সংগ্রহ—(১ম-৩য়) : দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, ১৩৩৪।
কীর্তন মহাসম্মেলন পত্রিকা—১৩৫৯।
কীর্তন পদাবলী—সুধীরচন্দ্র রায় ও অপর্ণা দেবী : রঞ্জন পাবলিশিং, ১৩৪৫।
কর্তাভজা ধর্মের আদিবৃত্তান্ত ও সহজতত্ত্ব প্রকাশ : মনুলাল মিশ্র, ১৩৩২।
গীতগোবিন্দম্—কবি জয়দেব : নূতন সাহিত্য ভবন, ১৩৭১।
গৌড়ীয় বৈষ্ণব ইতিহাস—মধুসূদন তর্কবাচস্পতি, ১৩৩৩।
গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনা—হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ১৩৭৭।
গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম ও চৈতন্যদেব—হেমচন্দ্র সরকার, ১৯২৭।
গৌরাঙ্গদেব ও কাঞ্চনপল্লী—সতীশচন্দ্র দে, ১৯৩৩।
গৌরাঙ্গ লীলা রহস্য—ভুবনেশ্বর মিত্র, ১৩৩২।
গৌড়ীয় দর্শনের ইতিহাস ও বৈশিষ্ট্য—সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, ১৩৬০।
গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ—বিমানবিহারী মজুমদার, ১৯৬১।
চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি—শঙ্করীপ্রসাদ বসু, ১৩৬৭।
চণ্ডীদাসের পদাবলী—নীলরতন মুখোপাধ্যায়, ১৩২১।
চৈতন্যদেবের প্রাত্যাহিক লীলা প্রসংগ—মৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্তী, ১৪০০।
জয়দেব চরিত—রজনীকান্ত গুপ্ত, ১২৯৬।
জীবের স্বরূপ ও স্বধর্ম—কানুপ্রিয় গোস্বামী, ১৩৪০।
তাল তত্ত্বের ক্রমবিকাশ—মৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্তী : ফার্মা কে এল এম।
দানকেলি চিন্তামণি—রঘুনাথ দাস গোস্বামী, ১৯৩৭।
দানকেলি কৌমুদী—রূপ গোস্বামী : হরিদাস দাস, ১৯৩৫।
পদামৃত সমুদ্র—রাধামোহন ঠাকুর, সংকলিত : উমা রায়।
পদাবলী কীর্তনের ইতিহাস—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, ১৯৭০।
পদাবলী পরিচয়—হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ১৩৫৯।
বলরাম দাসের পদাবলী—অমরচৈতন্য ব্রহ্মচারী, ১৩৭৯।

বাসুদেব ঘোষের পদাবলী—মালবিকা চাকী, ১৩৬৮।
বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস ও অন্যান্য মহাজন গীতিকা—চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
বৈষ্ণব তত্ত্ব দীপিকা—মধুসূদন দাস অধিকারী, ১৩২১।
বঙ্গীয় লোকসঙ্গীত রত্নাকর—আশুতোষ ভট্টাচার্য।
বাংলার কীর্তন ও কীর্তনীয়া—হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ১৯৭১।
বৈষ্ণব রস প্রকাশ—ডঃ ক্ষুদিরাম দাস, ১৩৭৯।
বৈষ্ণব রস সাহিত্য—খগেন্দ্রনাথ মিত্র, ১৩৫৩।
বৈষ্ণবীয় প্রবন্ধ—সুকুমার সেন, ১৩৭৭।
বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত মালা—ললিতাপ্রসাদ, ১৩৪০।
বাংলার বৈষ্ণব সমাজ ও সঙ্গীত সাহিত্য—বাসন্তী চৌধুরী, ১৯৬৮।
বাংলার বৈষ্ণব ধর্ম ও বৈষ্ণব পদাবলী—জানবল্লভ চৌধুরী।
বৈষ্ণব ধর্ম প্রকাশিকা—কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন, ১৩০০।
বৈষ্ণব সিদ্ধান্তে শ্রীগুরু স্বরূপ—সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, ১৩৭১।
বৈষ্ণব ধর্মের সূক্ষ্মতত্ত্ব—প্রিয়নাথ নন্দী, ১৩১৮।
বৈষ্ণব সাহিত্যে সমাজতত্ত্ব—ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, ১৯৪৫।
ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, ১৯৫৩।
ভারতীয় সঙ্গীতে তাল ও ছন্দ—সুবোধ নন্দী, ১৩৭৭।
ভারতীয় সঙ্গীতের কথা—প্রভাত গোস্বামী, ১৯৭৫।
রায়রামানন্দের পদাবলী—প্রিয়রঞ্জন সেন, ১৩৫২।
রাগ ও রূপ—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, ১৯৬১।
রস রহস্য কল্লোলিনী—বসন্তকুমার সেনগুপ্ত, ১৩৬৮।
রাগাত্মিকা পদ—মণীন্দ্রমোহন বসু, ১৯৩২।
রাগ নির্ণয়—রবীন্দ্রলাল রায়, ১৩৫৭।
রায়শেখরের পদাবলী—রায়শেখর, ১৯৫৫।
রাধিকা—ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়, ১৩০৮।
শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত—বৃন্দাবনদাস ঠাকুর : গৌড়ীয় মঠ, ১৩৬৮।
শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত—কৃষ্ণদাস কবিরাজ : সাধনা প্রকাশনী।
শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী—রঘুনাথ ভাগবতাচার্য : গৌড়ীয় মঠ, ১৯৬৬।
শ্রীশ্রীস্তবমালা—রূপ গোস্বামী : অপর্ণাদেবী, ১৯৮০।
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত—প্রবোধানন্দ সরস্বতী : গৌড়ীয় মঠ।
শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত—সনাতন গোস্বামী : জয়গোবিন্দদাস, ১৩১০।
শ্রীশ্রীভক্তি রত্নাকর—নরহরি চক্রবর্তী : গৌড়ীয় মিশন, ১৯৪০।
শ্রীশ্রীগীতচন্দ্রোদয়—নরহরি চক্রবর্তী : নবদ্বীপ, ৪৬২ গৌরাব্দ।
শ্রীশ্রীহরিকথামৃত—পুরীদাস গোস্বামী : শ্রীগোস্বামী প্রেস, কটক।

শ্রীলনরোত্তম ঠাকুরের প্রার্থনা—অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, ১৩১৯।
শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব জীবন—হরিদাস দাস : ৪৬৫ গৌরাব্দ।
শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্য—নরেন্দ্রনাথ লাহা, ১৯৪৭।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু—অনিরুদ্ধ ব্রহ্মচারী, ১৩৮৮।
শ্রীচৈতন্যদেব—রমেশচন্দ্রকিশোর বিদ্যাবিনোদ, ১৯৫০।
শ্রীশ্রীরামলীলা—শ্রীজিতেন্দ্রনাথ গোস্বামী, ১৩৬২।
শ্রীশ্রীরাধাতত্ত্ব—কৃষ্ণদাস দে, ১৩৫২।
শ্রীমদ্ভাগবত—গৌড়ীয় মঠ।
শ্রীমদ্ভাগবত মাহাত্ম্য—চারুচন্দ্র পাকড়াশী, ১৩৮৬।
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—রামশাস্ত্রী সম্পাদিত, ১৩৭২।
শ্রীশ্রীরাসলীলা ও বেণুগীত—ব্রজভূষণ চক্রবর্তী, ১৩৮০।
শ্রীচৈতন্যদেব—সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, ১৯৫০।
ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য—বিমানবিহারী মজুমদার, ১৩৬৮।
সংগীতরত্নাকর—শার্ঙ্গদেব : সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অনূদিত।
সংক্ষিপ্ত বৈষ্ণব অভিধান—কুমুদরঞ্জন ভট্টাচার্য, ১৯৭৮।
সংগীত দর্শিকা—ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৩৭৪।
সংগীত সমীক্ষা—রাজ্যেশ্বর মিত্র, ১৩৬৬।
সহজিয়া গৌড়ীয় ধর্ম—পরিতোষ দাস, ১৯৭৮।
ক্ষণদা গীত চিন্তামণি—বিশ্বনাথ চক্রবর্তী।